শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অষ্টম সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
শুভদা		১
পণ্ডিত মশাই		১৪৩
মেজদিদি		২৩৩
পথ-নির্দ্দেশ		২৬৩
আঁধারে আলো		২৯৯
কোরেল		৩১৯
বিবিধ রচনাবলী		৩৫১
(ক) ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য	৩৫৩	
(খ) সাহিত্য ও নীতি	৩৫৪	
(গ) সাহিত্যে আর্ট ও তুর্নীতি	৩৬০	
(ঘ) আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ	৩৬৭	
(ঙ) সাহিত্যের রীতি ও নীতি	৩৭৩	
অপ্রকাশিত রচনাবলী		৩৮৫
(ক) সাহিত্যের মাত্রা	৩৮৭	
(খ) ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়	৩৯০	
(গ) বাংলা বইয়ের তুঃখ	৩৯২	
(ঘ) সাহিত্যের আর একটা দিক	৩৯৫	
(ঙ) বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা	৩৯৭	
গ্রন্থ-পরিচয়		৪০৩

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮ম

শুভদা
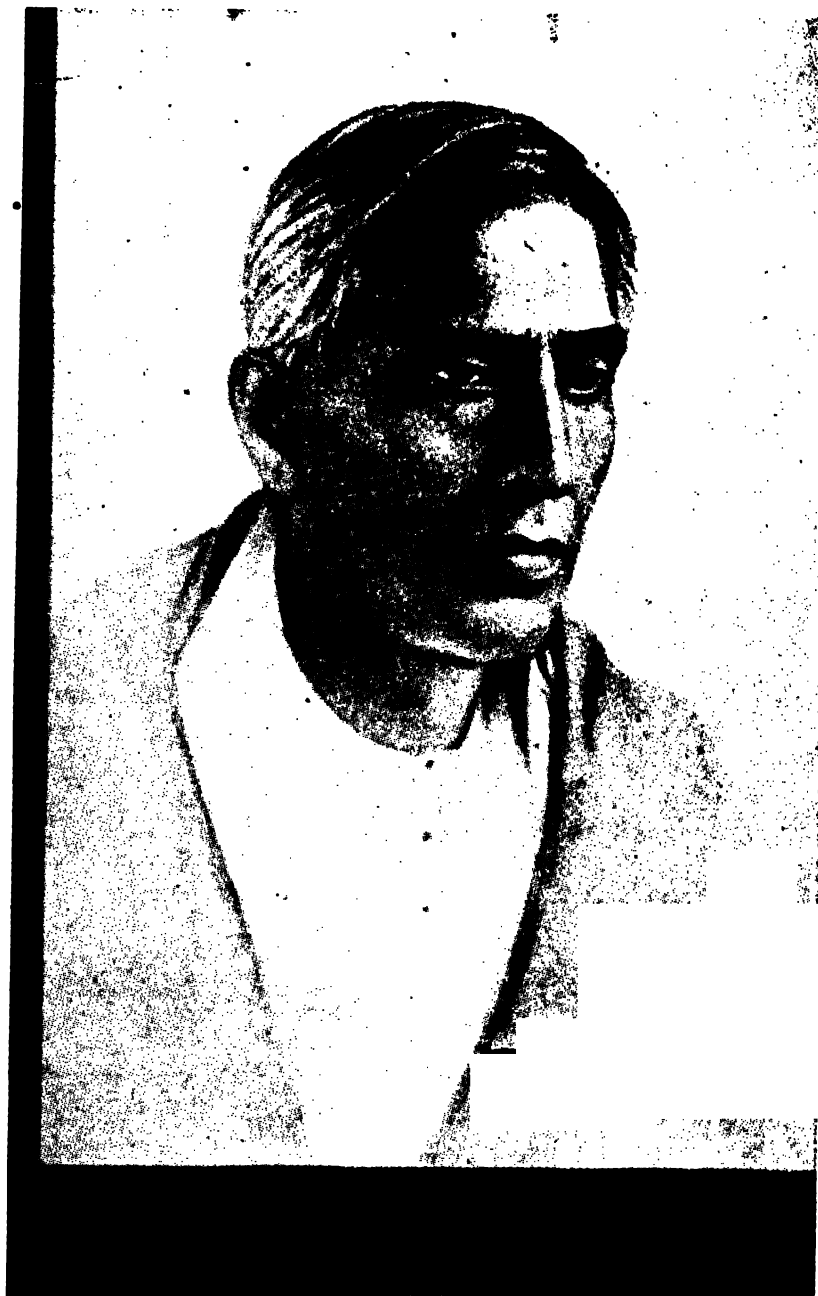
শুভদা

১

গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল-কলসীতে জলপূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

ঘাটে আরো তিন-চারিজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক হইয়া ঠাকুরাণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। পাড়াকুঁদুলি কৃষ্ণঠাকুরুণকে সাহস করিয়া কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, কিংবা কোনরূপ প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহারা সকলেই তাহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা।

তাই বলচি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহার নাম বিন্দুবাসিনী। বি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল।

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকেই বলা হইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পিসিমা?

এই হারাণ মুখুয্যের কপালটা পুড়ল! ভগবান যেন ওদের মাথায় পা দিয়া ডুবুচ্চেন।

বিন্দুবাসিনী বুঝিল হারাণ মুখুযোদের দুরদৃষ্টের কথা হইতেছে। সেও দুঃখিতা হইল। প্রায় একমাস হইল হারাণের পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই কথা মনে করিয়া বলিল, ভগবান কেড়ে নিলে মানুষের হাত কি? আর জন্ম-মৃত্যু কার ঘরে নেই বল!

প্রথমে কথাটার অর্থ কৃষ্ণঠাকুরাণী ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, আহা মাসখানেক হ'ল ছেলে মারা গেছে বটে! সে কথা নয় বিন্দু, সে কথা নয়; মরা-বাঁচা ভগবানের হাতই বটে, কিন্তু এটা—তুই বুঝি কিছু শুনিসনি মা?

বিন্দুবাসিনী কিছু বলিল না, কেবল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া পুনশ্চ বলিলেন, হারাণ মুখুয্যের কথা বুঝি কিছু শুনিস্ নি?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করল, তাঁর আবার কিসের কথা ?

আহা ! তাই ত বলছিলাম মা, ভগবান যখন মারেন তখন এমনি করেই মারেন। কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্যে ত কষ্ট হয় না, কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার কথা মনে হ'লে। হতভাগী ড্যাক্‌রার হাতে পড়ে ত একদিনের তরেও সুখী হ'ল না।

বিন্দু যেমন মুখপানে চাহিয়াছিল তেমনি রহিল, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ঠাকুরাণীরও এত কথা নিরর্থক বলা হয় নাই ; যেজন্য তিনি মূল কথাটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ডালপালা ছড়াইতেছিলেন তাহা সমাধা হইল। ঘাটে যতগুলি শ্রোতা ছিল কাহারও বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রহিল না। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিল, হারাণ মুখুয্যের এমন কি কথা হইতে পারে যাহা তাহারা জানে না, অথচ গ্রামের সকলেই জানে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিন্দু কহিল, পিসিমা, কথাটা কি শুনতে পাইনে ?

কেন পাবে না মা ? কিন্তু এ ত আর সুখের কথা নয়—তাই বলতে ইচ্ছে করে না, যখনই মনে পড়ে তখনি যেন বুকের মাঝখানটা টনটন করে ওঠে। ভগবান অমন মেয়ের কপালেও এত কষ্ট লিখেছেন !

কিসের কষ্ট ?

কষ্ট কি এক রকমের ? কত-রকমের কত কষ্ট কত যাতনা তা তোদের কি আর বলব ?

তবু শুনিই না পিসিমা ?

না এখন থাক্। কিছুই চাপা থাকবে না, সকলেই শুনতে পাবে—পেয়েচেও। কিছু আগে আর কিছু পরে—তোরাও সব শুনতে পাবি।

তুমিই বল না !

না না, আর বলব না। পরের কথাতে আর থাকব না মনে করেচি।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, পিসিমা, আমরা কি তোমার পর ? আমি জানি তুমি আমাকে বলবেই।

বিন্দু, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কি তবে মিথ্যা কথা বলব ?

কিসের মিথ্যে কথা ? মিথ্যে কথা কি তোমাকে বলতে বলেচি ?

তবে কেমন করে বলা হয় ? এই যে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললাম, পরের কথায় আর থাকব না।

কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরাণী চলিয়া গেলে সকলেই সকলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কেহ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, বিশেষ ঠাকুরাণীকে এ পর্য্যন্ত কেহ কখনো কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া যাইতে দেখে নাই। স্নান সমাপ্ত হইলে সকলেই আপন আপন

বাটীতে প্রস্থান করিল? বিন্দু বাটীতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মাতার নিকট আসিয়া বসিল।

তিনি বলিলেন, বিন্দু, এতক্ষণ ধরে কি জলে পড়ে থাকে মা, অসুখ হ'ল কি হবে বল দেখি?

কি আর হবে—দু'দিন ভুগব।

বিন্দুর মাতা হাসিয়া বলিলেন, সোজা কথা, এর জন্যে আর ভাবনা কি!

বিন্দু বলল, মা, হারাণ মুখুয্যেদের আবার কি হয়েছে?

কি আর হবে?

আজ ঘাটে কৃষ্ণ পিসিমার কথার ভাবে বোধ হয় তাদের নূতন কিছু একটা ঘটেচে। তুমি কিছু শোন নি?

কিছুই না। কি বললে?

বললে যে, হারাণ মুখুয্যেদের ভগবান মাথায় পা দিয়ে ডুবুচ্চেন, কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্যে ত কষ্ট হয় না—কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার জন্যে। এইটুকু বলে, আর কিছু বললে না। বলে, পরের কথায় আর থাকব না।

ঠাকরুণের এতদিনের পর ধর্ম্মজ্ঞান জন্মেচে!

মা, সত্যি তুমি কিছু জান না?

কিছু না।

তবে আজ আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে যাব।

কেন? কি দুর্ঘটনা ঘটেচে জানবার জন্যে?

হাঁ—

তুই কি পাগল হয়েছিস্? যে কথায় উনি থাকতে চাইলেন না, সে কথাটা তুই জিজ্ঞাসা করতে যাবি?

উনি কে?

বিন্দুর মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, এই কৃষ্ণঠাকরুণ।

কৃষ্ণঠাকরুণ কি আদর্শ যে, উনি যা না করবেন তা আর কাউকে করতে নেই?

এসব বিষয়ে তা একরকম আদর্শ বই কি।

তা হোক, আমি যাব।

পরের কথায় না হয় নাই থাকলে?

আচ্ছা মা, একজন যদি ডুবতে থাকে, 'পরের কথায় কাজ নেই' ব'লে তাকে আর তুলতে নেই?

তুই তো আর তুলতে যাচ্চিস্‌নে বিন্দু?

কে ডুবচে জানলে যাব বই কি!

বিন্দুর জননী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, তোমার ওদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। হারাণ মুখুয্যে লোক ভাল নয়, তোমার বাপের সঙ্গে ওর শত্রুতা আছে; তোমার কি ওদের বাড়ি যাওয়া ভাল দেখায়?

হারাণ মুখুয্যে লোক ভাল নয় তা আমি জানি, কিন্তু আমি ত আর তার কাছে যাচ্চি নে। তার স্ত্রীর কাছে যেতে দোষ কি? বেশ বুঝতে পাচ্চি ওদের কিছু একটা হয়েছে; আমরা পাড়া-প্রতিবেশী হয়ে যদি এ সময় চোখ বুজে থাকি তা হ'লে শ্বশুর-বাড়িতে আমার আর কেউ মুখ দেখবে না?

অঘোরনাথ কি তোকে পাড়ায় পাড়ায় কার কি হ'ল না হ'ল দেখে বেড়াতে বলেচে যে, তুই ওদের বাড়ির সন্ধান না নিলে উনি আর তোর মুখ দেখবেন না? আর আমি তোর মা হয়ে যা বারণ করছি সেটা কি শোনবার যোগ্য নয়?

মা, আমাকে যেতেই হবে।

গিয়ে কি শুনবে? হারাণ-মুখুয্যের কি হয়েচে তা বাড়ির কেউ জানে না।

তুমি কি ক'রে জানলে?

তোমার বাপের কাছে শুনেচি।

তবে কি হয়েছ, বল।

নন্দীদের তহবিল ভেঙ্গেচে বলে তারা হাজতে দিয়েচে।

নন্দীরা কারা?

বামুনপাড়ার জমিদার। তাদের কাছারিতে হারাণ মুখুয্যে চাকরি করত।

কত টাকা চুরি করেচে?

প্রায় দু'শ টাকা।

কেউ জামিন হয় নি?

কে আর হবে বল? গাঁয়ে তোমার বাবাকেই সকলে জানে এবং তিনিই কেবল জামিন হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁকে ত সে পোড়া মিন্‌সে শত্রু করে রেখেচে। এঁকে একবার জামিন হ'তে বলেছিল, কিন্তু স্বীকার হয় নি।

বিন্দু অনেকক্ষণ মৌন হইয়া কি চিন্তা করিল, পরে বলিল, দুপুরবেলা একবার ওদের বাড়ি যাব। এসে পর্য্যন্ত বউকে একদিনও দেখিনি।

বিন্দুর মাতা বিস্মিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া বলিলেন, এত কথা শুনেও যাবি।

বিন্দু যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল, তাহাতে গৃহিণীর আর কথা কহা হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিন্দু পুনরায় কহিল, আমি ওদের বাড়ি গেলে কারও কোন ক্ষতি নাই। আমি এই বলি মা, পুরুষমানুষদের ঝগড়া মেয়ে-মহল পর্য্যন্ত না পৌঁছুলেই ভাল।

বেলা হইতেছে দেখিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিলেন, ইনি শুনলে বড় রাগ করবেন।

যাতে না শুনতে পান এমনি ক'রে যাব।

নিশ্চয় শুনতে পাবেন।

তুমি শোনালেই পাবেন।

কিন্তু শুনলে বড় রাগ করবেন।

বিন্দু অন্যমনস্কভাবে কহিল, বাপ-মা সন্তানের উপর রাগ করেন, আবার ভুলে যান, সেজন্য তুমি ভেবো না মা।

২

এ-স্থানটার নাম হলুদপুর। গ্রামটি যে জেলায় তাহা আর বলিয়া কাহাকেও ক্লেশ দিতে চাহি না, কারণ এস্থানে কাহাকেও কখন যাইতে হইবে না। এখানে দেখিবারও কিছু নাই, শুনিবারও কিছু নাই, তবে যদি নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া থাকেন ত আমার বিবরণ পড়িয়া যতটা পারেন উপলব্ধি করিয়া লউন।

শুনিয়াছি এ-গ্রামে পূর্ব্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির নিবাস ছিল এবং তাহা সম্ভবও, কারণ একে ত ইহা গঙ্গার উপরে স্থাপিত, তাহার উপর বহুকালের দুই-চারিটা জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দির বেতবন ও শ্যাকুল ঝোপের মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িতভাবে মৌন-ব্রতধারী যোগী মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-একটা ঘাট-বাঁধা পুষ্করিণীর মধ্যে গরু-বাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও চোখে পড়ে। এই সকল দেখিয়া গ্রামের চিরদিন যে এমনি অবস্থায় কাটে নাই তাহা অনুমান হয়, কিন্তু এখন কেবল দশ-বিশ ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাটী, আর পঞ্চাশ-ষাট ঘর চাষা-ভূষার কুটীর আর জঙ্গল, এবং তাহারই মধ্যে দিয়া কদাচিৎ দুই-এক ব্যক্তির যাতায়াতের পায়ে-হাঁটা পথ।

এই গ্রামেই শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। বাটীটি দ্বিতল—পুরাতন ইষ্টক-নির্ম্মিত। উপর তলায় দুটি এবং নিম্নে চারি-পাঁচটি ঘর। চতুর্দ্দিকে একরাশ বাঁশ-ঝাড়, দুই-চারিটা কদলি-বৃক্ষের ঝাড়, গোটা-দুই বেলগাছ, গোটা-দুই আমগাছ, একটা কতবেল গাছ—ইহাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটা ও পার্থিব সম্পত্তি।

হলুদপুরের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বামুনপাড়ার জমিদার নন্দীদের জমিদারী সরকারে মুখুয্যে মহাশয় চাকুরি করিতেন। কুড়িটি টাকা মাহিনা পাইতেন, কিন্তু ইহাতেই

তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিত, এখন কিন্তু আর তাহাতে কুলায় না—সর্ব্বদা অনটন, সর্ব্বদা অভাব।

বাটীতে তাঁহার পোষ্যবর্গও অনেকগুলি; স্ত্রী, দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা, এক বিধবা বড় ভগিনী অর্থাৎ বাঙ্গালীর ঘরে সচরাচর যাহা থাকে তাঁহারও ছিল। যখন তিনি মাসে কুড়িটি মুদ্রা স্ত্রীর হাতে দিতেন, তখন তাঁহার সংসারে আজ-কালকার মত নিত্য দৈন্য নিত্য অভাব কেই টের পায় নাই। স্ত্রী এবং বড়ভগিনী উভয়ে মিলিয়া সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইয়া যাইতেন, এখন তাহা করেনও না, সংসারের নিত্য অনটনও কিছুতেই ঘুচে না! আজ চাউল নাই, আজ ডাইল নাই, আজ কাষ্ঠ অভাবে রন্ধন হইতেছে না, নিত্য এ নাই, ও নাই, তা নাই-এ পড়িয়া মুখুয্যে মহাশয় অসৎ উপায় উদ্ভাবন করিলেন অর্থাৎ সরকারি তহবিলের কিছু অংশ আপনার ব্যয়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী হারাণবাবুকে প্রথমে কেহ সন্দেহ পর্য্যন্ত করিল না, কিন্তু এ উপায় অধিক দিন চলে না; ক্রমশঃ জমিদারের সন্দেহ হইতে লাগিল; সন্দেহ যখন গাঢ়তর হইয়া উঠিল তখন তিনি একদিন সমস্ত খাতাপত্র দেখিতে চাহিলেন; খাতায় অনেক ভুল, অনেক গোলমাল প্রকাশ পাইল ও সঙ্গে সঙ্গে চুরিও ধরা পড়িল। হারাণবাবু এযাবৎ বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; জমিদার শ্রীভগবান নন্দী দয়ালু এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হারাণবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, কত টাকা চুরি করেছ?

তা জানি না।

জান না? খাতাপত্র দেখে বোধ হয় তিন হাজারের উপরও চুরি করেছ—এত টাকা কি করলে?

খরচ করেছি।

খরচ ত করেছ, কিন্তু চুরি করলে কেন?

কুড়ি টাকায় আমার চলে না, কাজেই চুরি করতে হয়।

কুড়ি টাকায় তোমার এতদিন চলেছে, এখন না চলবার কোন কারণ আমি বুঝে উঠতে পারি না; যা হোক, তাই বা আমাকে বল নাই কেন যে, তোমার কুড়ি টাকায় সংসার চলে না।

বললে কি আমাকে বেশি টাকা দিতেন?

হয়ত দিতাম, কিন্তু সে-কথা যাক; যা নিয়েছ তার অর্দ্ধেক আমাকে ফিরিয়ে দিলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কেমন করে দেব, আমার কিছুই নেই।

তোমার কোন জমিজিরাত থাকে ত বিক্রয় করে দাও।

জমিজিরাতের মধ্যে আমার একমাত্র ভদ্রাসন আছে, তাই বিক্রি করে নিন।

তোমার স্ত্রী-পুত্র থাকবে কোথায় ?

গাছতলায়।

ভগবানবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া হারাণ মুখুয্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার চোখ অত রাঙা কেন ?

কেমন করে জানব ?

তখন হারাণ মুখুয্যেকে বিদায় দিয়া অন্য একজন আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, হারাণ মুখুয্যের বাটীর সংবাদ নিতে পার ?

কি সংবাদ নিব ?

এইরকম যে, ওদের সাংসারিক অবস্থা কেমন, কেমন সম্পত্তি আছে, কোনরূপ দেনাকর্জ্জ আছে কি না—এই সব।

এই লোকটি হারাণবাবুর অনেক কথা জানিত। সে বলিল, আমি যতদূর জানি মুখুয্যেমশায়ের সংসারের অবস্থা ভাল নয়, সম্পত্তিও বোধ হয় কিছুই নাই—তবে দেনাকর্জ্জ আছে কিনা বলতে পারি না।

ভাল করে সংবাদ নিয়ে আমাকে জানিও।

দুইদিন পরে সে বাবুকে জানাইল যে, সাংসারিক অবস্থা যতদূর মন্দ হওয়া সম্ভব মুখুয্যে মশায়ের তাহা হইয়াছে, অন্যান্য সংবাদ পুর্ব্বে যাহা বিদিত করিয়াছিল সমস্তই সত্য।

ভগবানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মুখুয্যে কোনরূপ নেশাটেশা করে কি ?

আজ্ঞে হাঁ, গাঁজা খান।

তাই সেদিন চোখ অত রক্তবর্ণ দেখেছিলাম, আনুষঙ্গিক আর কোন দোষ আছে কি ?

আমলা নতমুখে বলিল, শুনতে পাই আছে।

তবে এক কাজ কর—কাল কোর্টে গিয়ে চুরির অপরাধে মুখুয্যের নামে নালিশ করে দিও—পুলিশকেও সংবাদ পাঠিয়ে দাও।

পরিশেষে ফল এই দাঁড়াইল যে, মুখুয্যেমহাশয়কে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে যাইতে হইল।

নিকট হইলেও হলুদপুরে এ-কথা প্রায় কেহই জানিতে পারিল না, তবে বিন্দুর পিতা ভবতারণ গাঙ্গুলী এ-কথা জানিলেন। বোধ হয় নন্দীরাই তাঁহাকে এ-ঘটনা জানাইয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু লোক, ইচ্ছা করিলে হারাণ মুখুয্যেকে অনায়াসে হাজত-মুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুই করিলেন না। সহায়-সম্বলহীন মুখুয্যেমহাশয় হাজত-গৃহেই পচিতে লাগিলেন। আর এক কথা—কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরাণী এ ঘটনা যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিল, তাহা শুধু তিনিই বলিতে পারেন।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর কালমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এইসময় হারাণবাবুর বাটীর রন্ধন-শালার বারান্দায় তাঁহার স্ত্রী ও বড় কন্যা ললনা মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দু'জনেরই মুখ শুষ্ক, আজ একাদশী—ললনা বালবিধবা; আর তাহার জননী—তিনিও এখন পর্য্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই।

ললনা বলিল, মা, আজো বোধ হয় বাবা আসবেন না! মেঘ করে আসছে, যদি জল হয় তা হলে রান্নাঘরে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। তুমি কেন একটু কিছু খেয়ে নাও না।

ললনার জননী বলিল, আরও একটু দেখি, তিনদিন আসেননি—আজ যদি আসেন?

মা, বাবা এমনতর ত কখন করেন নি; তিনদিন আসেন নি—আজ যদি না আসেন?

কি করব বল, ভগবান আছেন।

একাদশীর দিন রাসমণি (হারানবাবুর বড় ভগিনী) বেলা করিয়া স্নান পূজা করিতেন; এখন নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, বৌ, এখন পর্য্যন্ত খাস নি?

বৌ বিমর্ষভাবে কহিল, আরও একটু দেখচি।

আমার পিণ্ডি—আরও একটু দেখে কি হবে? ড্যাক্‌রা আজ এত বেলায় কি আর আসবে? দেখ্‌গে যা—গাঁজা খেয়ে ভোঁ হয়ে কোন মাগীর বাড়ি পড়ে আছে। উপবাস করিয়া রাসমণির মেজাজটা একটু খিটখিটে রকমের হইয়া পড়িত, কেহ কোন কথা কহিল না দেখিয়া আরো একটু কুপিত হইয়া বলিলেন, মুখপোড়া কবে মরবে যে আমাদের হাড় জুড়োবে।

এবার ললনার আর সহিল না। দুঃখিতভাবে বলিল, পিসিমা, একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন?

একাদশীর দিন গাল দিচ্চ কেন? কথাটা রাসমণির ভিতরে গিয়া পৌঁছিল। অন্তরে ব্যথা পাইলেন এবং রীতিমত লজ্জিত হইলেন; কিন্তু ছোট্ট ললনা যে এ-কথা বলিয়াছে ইহাতেই দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেলেন। তুই সেদিনকার মেয়ে, বুড়ো মাগীকে একাদশী-দ্বাদশী শেখাতে আসিস্‌নে। তোরই বাপ হয়, আমার কি কেউ হয় না? বলিতে বলিতে রাসমণির নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল—বাছা আমার তিনদিন বাড়ি আসেনি—বুকের ভিতর যে কি করচে তা ইষ্টদেবতাই জানতে পাচ্চেন। অঞ্চল দিয়া একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া, আমি বুড়োমানুষ, যদি একটা কথা বলি তা হলে তোরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিস্।—কাজ নেই মা,

আমি তোমার কোন কথায় আর থাকব না। তবে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বৌটা মরে যায়, তাই দু'কথা বলতে হয়।

ললনা অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহার একটা কথায় এত গভীর অর্থ এবং আনুষঙ্গিক ক্রন্দনাদির কারণ ঘটিতে পারে সে নিজেই জানিত না।—পিসিমা, আমার ঘাট হয়েচে, এমন কথা আমি আর বলব না। বাস্তবিক কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। তাহার জননীও বলিলেন, মা বড় হয়েছ, সব কথা বুঝে বলতে পার না?

তাহার পর সকলের পীড়াপীড়িতে ললনার জননী কিঞ্চিৎ আহার করিলে, বিন্দুবাসিনী আপনার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া হারাণবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই রাসমণি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, বিন্দু এদিকে আর আসে না।

বিন্দু অপ্রতিভ হইবার লোক নহে; সেও সহাস্যে বলিল, তুমিই কোন আমাদের ওদিকে যাও দিদি?

যাবার কি আর জো আছে বোন, ছোট ছেলেটার ব্যারাম নিয়ে এক পাও কোথাও নড়বার সাধ্যি নাই।

কি হয়েছে তার?

জ্বর, পিলে, পেটের অসুখ—কিছুই আর বাকী নাই।

বৌ কোথায়?

এই এতক্ষণে মুখে দুটো ভাত দিয়ে ও-ঘরে ছেলেটার কাছে গিয়ে বসেচে।

এত বেলা হ'ল কেন?

হারাণের পথ চেয়ে, সে ত তিনদিন থেকে আর বাড়ি আসে নি। যদি আসে, আরো একটু দেখি—এই রকম করে এতটা বেলা হয়ে গেল।

বিন্দু সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া যে ঘরে বৌ তাহার পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্র মাধবের শিয়রে বসিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতেছিল সেইখানে প্রবেশ করিল। মাধব হারাণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, সে আজ এক বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহায় পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী পড়িয়া আছে। পীড়া তাহার এমন কিছু কঠিন নহে; রীতিমত চিকিৎসা হইতে পাইলে এতদিন আরোগ্য হইয়া যাইত, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুতেই সুচিকিৎসা হইতে পাইতেছে না। সামান্য টোটকা ঔষধ, পাচন ও কুইনাইনের উপর ভর করিয়া সে কিছুতেই বসিতে পারিতেছে না। শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু দুটি জননীর মুখের পানে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, মা, বাবা আজ তিন-চারদিন আমাকে দেখতে আসেননি কেন?

তিনি এখানে নেই।

কোথায় গিয়েছেন মা।

জননী অল্প ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, তোমার ওষুধ আনতে গেছেন।

বালক প্রফুল্ল হইয়া বলিল, মিষ্টি ওষুধ যেন আনেন, তেতো ওষুধ আমি আর খেতে পারিনে। দেখ মা, ভাল হয়ে আমার আগেকার মত আবার বেড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আগ্রহে আবার বলিয়া উঠিল, মা, আমি ভাল হব ত?

জননীর চক্ষে জল আসিতেছিল, তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, জগদীশ্বরের মনে কি আছে তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিন্দু তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কহিল, কেন ভাল হবে না বাবা? আমি কাছে থেকে তোমাকে সারিয়ে দোব।

মাধব কিংবা তাহার জননী কেহই এ-পর্য্যন্ত বিন্দুর আগমন লক্ষ্য করে নাই, সহসা দুজনেই চমকাইয়া উঠিলেন।

বিন্দু শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল, শুভদা, খেয়েচিস্ ত?

হারাণবাবুর স্ত্রীর নাম শুভদা, বিন্দু তাঁহা অপেক্ষা ছোট হইলেও সম্মুখে নাম ধরিয়াই ডাকিত। শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তোর বড় মেয়ে কোথা?

বোধ হয় ওপরে আছে।

তবে একবার ডাক, বলিয়া নিজেই ডাকিল, ললনা—ও ললনা!

ললনা উপর হইতে বলিল, কেন?

একবার নেমে আয় ত মা?

ললনা আসিলে তাহার হাতে কন্যাকে দিয়া বলিল, প্রমীলাকে নিয়ে একবার ছোট ভাইটির কাছে ব'স ত মা, অনেকদিন পরে দেখা হ'ল; তোর মার সঙ্গে ও-ঘর থেকে দুটো কথা কয়ে আসি।

প্রমীলাকে ললনার হাতে দিয়া শুভদার হাত ধরিয়া বিন্দু একেবারে উপরে আসিয়া বসিল। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল. বৌ, হারাণদাদা আজ কদিন বাড়ি আসেননি?

তিন দিন।

কেন আসেননি কিছু জানিস্ কি?

না, কিছু না।

বিন্দুবাসিনীর কথার ভাবে তাহার ভয় করিতেছিল, পাছে সে কিছু একটা বলিয়া ফেলে। বিন্দুবাসিনী মৌন রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, শুভদাও ততক্ষণ ক্রমাগত ঘামিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর বিন্দু বলিল, শুভদা; ইচ্ছে থাকলেও এমন অনেক কথা আছে যা মিষ্টি করে বলা যায় না—জানিস্ ত?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, জানি—কেন ?

হারাণদাদা আজ তিন-চারদিন বাড়ি আসেননি ; —মনে কর্ যদি তাঁর সম্বন্ধেই কোন অশুভ কথা বলতে হয়।

শুভদার সমস্ত শরীর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল ;—তিনি বুঝি বেঁচে নাই ?

ওকি, কাঁপচিস্ কেন ? কে বললে তিনি বেঁচে নেই ?

বেঁচে আছেন ?

বালাই, বেঁচে কেন থাকবেন না ? বেঁচে আছেন, সুস্থ শরীরে আছেন।

সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে শুনিতে পাইল, তথাপি শুভদা কথা কহিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ?

সেই কথাই বলতে এসেছি, কিন্তু তুই অমন করলে কেমন ক'রে বলি ?

শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অমন আর করব না। কি হয়েচে, বল।

চুরি করেচেন বলে নন্দীরা হাজতে দিয়েচে।

হাজতে দিয়েচে ? শুভদার সমস্ত মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—তবে কি হবে ?

বিন্দুবাসিনী স্বাভাবিক স্বরে বলিল, কি আর হবে ? খালাস ক'রে আনতে হবে।

তা কি হয় ?

হয় না ত কি হাজতে গেলেই লোকে জেলে যায় ?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুভদা বলিল, বিন্দু, তোমার বাপের কাছে একবার যাব।

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। সে জানিত শুভদার মুখ দেখিলে পাষাণ গলিবে, কিন্তু ভবতারণ গাঙ্গুলী গলিবে না। তাই অমত করিয়া বলিল, গিয়ে কি হবে ?

আমাদের কেউ নেই ; তিনি যদি দয়া করে কোন উপায় ক'রে দেন !

যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। হারাণদাদাতে বাবাতে চিরকাল শত্রুতা, তাই বাবার কাছে গেলে কোন ফল হবে না।

তবে উপায় ?

উপায় আমি করে দোব। না হলে কি শুধু এই খবরটাই দিতে এসেচি ? কিন্তু আমি যা বলব করতে পারবে ?

পারব।

যতই শক্ত হোক ?

শুভদা দৃঢ়স্বরে বলিল, হাঁ।

তবে শোন, দু'শ না তিনশ টাকা চুরি করেচেন বলে নন্দীরা তাঁর নামে নালিশ করেচে।

দু'শ-তিনশ টাকা! শুভদার ভ্রম হইল, এত টাকা কি একসঙ্গে মানুষে চুরি করিতে পারে? আর চুরি করিলেই বা রাখিবে কোথায়?

এত টাকা বিন্দু, তিনি কখন চুরি করেন নি।

না ক'রে থাকেন ভালই, কিন্তু সে-কথায় আমাদের কাজ নেই। এই টাকাটা নন্দীদের দিয়ে খুব অনুনয়-বিনয় করলে বোধ হয় ছেড়ে দিতে পারে।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? এত টাকা আমি পাব কোথায়?

সে-কথা আমি বলচি। বৌ, এখন লজ্জার সময় নয়; তুমি আমার এই বালা দু'গাছা নিয়ে আজ রাত্রে নিজেই ভগবানবাবুর কাছে যাও; তার পর যা ভাল বোঝ ক'রো।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমার বালা দু'গাছা?

হাঁ, আমার বালা দু'গাছা। এর দাম তিন-চারশ টাকা হবে; এই দিয়ে সাধ্যি-সাধনা করলে দয়া করে ছেড়ে দিতেও পারেন।

কিন্তু বিন্দু—

কিন্তু আবার কি? আগে স্বামীকে বাঁচাও, তার পর কিন্তু ক'রো। এখন কি সঙ্কোচ করবার সময় বৌ? আর টাকা শোধ দেবারই-বা ভাবনা কি, তোর ছেলে বড় হয়ে শোধ দেবে।

আজই যাব?

হাঁ—আজই।

কার সঙ্গে যাব?

তেমন কেউ বিশ্বাসী লোক আছে কি?

কেউ না।

তবে একলাই যাও। বরং একলা যাওয়াই ভাল; কেন না পাঁচজনে শুনলে পাঁচটা কথা বলতে পারে।

তবে আজ যাই!

হাঁ—আজই যাও। সন্ধ্যার পর একটা ময়লা কাপড় পরে মুখ ঢেকে যেয়ো। কাল এমনি সময় আর একবার আসবো।

যাইবার সময় শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিন্দু সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, ঈশ্বর করুন, সব যেন মঙ্গল হয়। তা না হলে অন্য উপায়ও আছে—তুই কিছু ভাবিস নে।

তাহার পর অঞ্চল খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া শুভদার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, বৌ আমি তোর মার পেটের বোন। আমাকে কোন লজ্জা নেই, আপাততঃ এই টাকা নে—ছেলেটাকে কিছু কিনে দিস্।

নীচে আসিয়া বিন্দু কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, বেলা গেল—চল মা, বাড়ি যাই। তাহার পর বিধবা ললনার উপর একটি সস্নেহ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

৩

তখন দ্বিপ্রহরের সময়, যে-সব মেঘ বাতাসের দৌরাত্ম্যে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার পরেই একটির পর একটি করিয়া মহাসমারোহে বাজনা-বাদ্য বাজাইয়া আবার আকাশের গায়ে জোট বাঁধিতে লাগিল। সকলেই স্থির করিল আজ রাত্রে বৃষ্টি না হইয়া যায় না। গরম কমিবে—প্রাণ বাঁচিবে। এ বৃষ্টি সকলের মঙ্গলের জন্য, শুধু শুভদা মনে করিল তাহারই কপাল-দোষে আজ এই দুর্য্যোগের সূত্রপাত হইয়া আসিল। একে ত হলুদপুরের পথঘাট বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া, তাহাতে আবার গাঢ় মেঘ করিয়াছে, তথাপি শুভদা বালা দু'গাছি অঞ্চলে বাঁধিয়া, কাপড়খানি বেশ করিয়া গুছাইয়া পরিয়া একটা বিছানার চাদরে সমস্ত অঙ্গ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে পূর্ব্বে আর কখন বামুনপাড়ায় যায় নাই, শুধু শুনিয়াছিল মাত্র যে, উত্তর-মুখ ধরিয়া চলিলে আধ ক্রোশ দূরে পাকা রাস্তা পাওয়া যায় এবং আর একটু অগ্রসর হইলেই বামুনপাড়া। সেখানে পৌঁছতে পারিলে জমিদার-বাড়ি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। কারণ নন্দীদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সে শুনিয়াছিল। হলুদপুরের অন্ধকার পথ ছাড়াইয়া পাকা রাস্তা পাওয়াই তাহার বিপদের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া এক ফোঁটা দুই ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল; এক ফোঁটা দুই ফোঁটা পরিশেষে মুষলধারায় পরিণত হইল দেখিয়া শুভদা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পথ চলা আর অসম্ভব; অন্ধকারে একহস্ত দূরের পদার্থও আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রবল বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের শব্দে শুভদার ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল, চতুর্দ্দিক হইতে বন্য জীবজন্তু ছুটিয়া আসিয়া সেই বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে, আবার তৎক্ষণাৎ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে। শুভদার সহসা মনে হইল, যদি চোর ডাকাইত কেহ আশ্রয় লইতে এখানেই আসিয়া পড়ে? তাহা হইলে? তাহার প্রাণের ভয় হইল না, কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান বালা দু'খানির জন্য ভয় হইল। স্বামীর নিষ্কৃতির কারণ, নিজের আশা-ভরসা সমস্তই এই বালা দু'গাছি। সত্রাসে শুভদা বৃক্ষতল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সমস্ত শরীর কর্দ্দমসিক্ত হইয়াছে, গাছপালার আঁচড়ে ও

কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তথাপি শুভদা পথ বহিয়া চলিতে লাগিল। এক নিমিষের তরে বৃষ্টির উপশম নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্য মেঘের শব্দের বিরাম নাই, কোন্ মুখে কোথায় চলিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি বনবাদাড় সরাইতে সরাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হইল যেন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথ সম্মুখে দেখা যাইতেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটিয়া আসিয়া শুভদা দেখিল যথার্থই পাকা পথ পাইয়াছে। এখন কিন্তু অন্য কথা। যখন পথ পায় নাই তখন কেবল পথের ভাবনাই ভাবিয়াছিল, এখন কাজের কথা মনে হইতে লাগিল। এত রাত্রে কি করিয়া দেখা হইবে, দেখা হইলেই কি কার্য্যসিদ্ধি হইবে? সিদ্ধ হউক আর না হউক, এ দুর্য্যোগে বাটীই বা কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে? ক্রমে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল; কিছুদূর আসিয়াই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও চতুর্দ্দিক-সংলগ্ন রেলিং দেওয়া বাগান দেখিয়া বুঝিতে পারিল ইহাই নন্দীদের বাটী; কিন্তু কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? আর প্রবেশ করিলেই বা তাঁহার সহিত এত রাত্রে কি করিয়া সাক্ষাৎ করিবে। শুভদার কান্না আসিল; এখন কি হইবে? কি করিয়া বাড়ি যাইবে? পরিশ্রমে, অনাহারে, দুর্ভাবনায় সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, নন্দীদের বাটীর সম্মুখে যে শিবমন্দির ছিল তাহারই বারান্দার উপর আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই, তবে কমিয়া আসিয়াছিল। বৈশাখের মেঘ যেমন একমুহূর্ত্তে গগন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তেমনিই একমুহূর্ত্তে গগন ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। এ-মেঘও দেখিতে দেখিতে আকাশের প্রান্তদেশে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, আবার চাঁদের আলোকে জগৎ অনেক শুভশ্রী ধারণ করিল। শুভদা মনে করিল এইবার ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়াছে। সিক্তবস্ত্র একটু গুটাইয়া লইবার সময় দেখিতে পাইল একজন বৃদ্ধ ভৃত্য হস্তে দীপ লইয়া জমিদার-বাটীর ফটক খুলিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার নিকট যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় এইরূপ একটা ক্ষীণ আশায় ভর করিয়া প্রস্থান না করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিল একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোন কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বহুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ প্রথমে অবগুণ্ঠন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল, কোন ভদ্রঘরের স্ত্রী জলের ভয়ে সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল, এইবার চলিয়া যাইবে, কিন্তু এখনো সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা?

স্ত্রীলোকটি কোন কথা কহিল না।

কোথায় যাবে বাছা?

শুভদার কথা বলিতে লজ্জা করিতেছিল ; কিন্তু এখন মৃদুকণ্ঠে কহিল, জমিদার বাবুদের বাড়িতে।

জমিদারদের বাড়ি ত এই সামনেই ; তবে সেখানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

শুভদা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারদের বাড়িতে কার কাছে যাবে ?

বাবুর কাছে।

কোন বাবুর কাছে ?

ভগবানবাবুর কাছে।

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া বলিল, ভগবানবাবুর কাছে ?

হাঁ।

তবে আমার সঙ্গে এস। বৃদ্ধ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। শুভদা জ্যোৎস্নালোকে বৃদ্ধের পলিতকেশ সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া অসঙ্কোচে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। ক্রমে ফটক পার হইয়া, বাগান পার হইয়া, একটা কক্ষের দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধ ডাকিল, এই ঘরে এস।

শুভদা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চমৎকার সুসজ্জিত কক্ষ, সমস্ত মেঝের উপর মূল্যবান কার্পেট বিছানো ; সম্মুখে মসলন্দ পাতা তাকিয়া দেওয়া বসিবার স্থান। বৃদ্ধ তাহার উপর উপবেশন করিয়া শুভদার আপাদমস্তক দীপালোকে, অবগুণ্ঠনের ঈষৎ ফাঁক দিয়া যতদূর দেখা যায় নিরীক্ষণ করিল। শুভদা সময়ে রূপবতী ছিল। বয়সে ও দুঃখ-কষ্টে পূর্ব্বের সে জ্যোতি এখন আর নাই, তথাপি হীনপ্রভ লাবণ্যের যতটুকু অবশিষ্ট আছে, বৃদ্ধ তাহাতেই মোহিত হইল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কহিল, বাছা, তোমার ভুল হয়েচে, বিনোদবাবুর সঙ্গে বোধ হয় তুমি দেখা করতে চাও।

বিনোদবাবু কে ?

বিনোদবাবু ভাগবানবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শুভদা কহিল, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

তবে কি ভগবানবাবুর নিকট প্রয়োজন আছে ?

হাঁ।

ভগবান নন্দী আমারই নাম ; কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখেচি বলে ত মনে হয় না।

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে আমার নিকট কি প্রয়োজন থাকতে পারে ?

শুভদা কথা কহিল না।

ভগবানবাবু আবার বলিলেন, আমি ভেবেছিলাম রাত্রে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বিনোদের নিকট থাকতে পারে; এত রাত্রে আমার নিকট যে তোমার কি প্রয়োজন আছে আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

তথাপি শুভদা কোনও উত্তর দিল না।

তোমার বাড়ি কোথায়?

হলুদপুরে।

হলুদপুরে? আমার নিকট প্রয়োজন? তুমি কি হারাণের স্ত্রী?

শুভদা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তবে বল কি প্রয়োজন?

শুভদা অঞ্চল হইতে বালা দু'গাছি খুলিয়া ধীরে ধীরে ভগবানবাবুর পায়ের নিকট রাখিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, তাঁকে ছেড়ে দিন।

বৃদ্ধ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। বালা দু'গাছি হাতে লইয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন, তবুও সুখী হলাম যে সে তোমাকে এটাও দিয়েছিল। তাহার পর বালা দুটি নীচে রাখিয়া বলিলেন, তুমি এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ের হাতের বালা নিতে চাই না। ছেড়ে দিতে হয় অমনই দেব; বিশেষ সে আমার যা নিয়েছে তাতে এ অলঙ্কার নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও যা, না নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও তা।

শুভদা চক্ষু মুছিয়া বলিল, তাঁকে ছেড়ে দেবেন ত?

ইচ্ছা ছিল না! সে যে-রকম দুশ্চরিত্র তাতে তার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল, তবুও তোমার জন্য ছেড়ে দেব।

শুভদার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। পলিতকেশ বৃদ্ধকে সে ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও মুখ ফুটিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে সাহস করিল না; মনে মনে তাহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বরের চরণে তাঁহার সহস্র মঙ্গল কামনা করিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগবানবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, আজই বাড়ি যাবে?

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আজই যাইবে।

তোমার সঙ্গে আর কেউ লোক আছে?

কেউ না।

কেউ না? তবে এত রাত্রে একা যেও না। একজন লোক সঙ্গে নিয়ে যাও।

শুভদা তাহাও অস্বীকার করিয়া একাকী সেই বনের ভিতর দিয়া বাটী ফিরিল।

যখন বাটীতে প্রবেশ করিল তখন ভোর হইয়াছে। ললনা ইতিপূর্ব্বে উঠিয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সিক্তবস্ত্রে জননীকে দেখিয়া কহিল, মা, এত ভোরে স্নান করে এলে?

হাঁ।

৪

রামমণি ও দুর্গামণি নাম না রাখিয়া যে শুভদা কন্যা দুইটির নাম ললনা ও ছলনা রাখিয়াছিল, তাহাতে ঠাকুরঝি রাসমণির আর মনস্তাপের অবধি ছিল না।

বাজারের তাহাদের মত ললনা ছলনা নাম দুইটা অষ্টপ্রহর তাঁহার কর্ণে বিঁধিতে থাকিত। ললনা নামটা তবু কতক মাফিক-সই; কিন্তু ছিঃ—ছলনা আবার কি নাম! ছলনাকে না দেখিতে পাবার কারণ অর্দ্ধেক তাহার ঐ নামটা। লোকে ঠাকুরদের নামে ছেলেমেয়েদের নাম রাখে; কেন না তাহাদের ডাকিতেও ভগবানের নাম করা হয়, কিন্তু এ দুইটা মেয়েকে ডাকিলে যেন পাপের ভার একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে মনে হয়।

ললনাময়ী, ছলনাময়ী হারাণবাবুর দুই কন্যা। একজন বড়, একজন ছোট; একজন সপ্তদশবর্ষীয়া, একজন একাদশ বর্ষীয়া; একজন বিধবা, একজন অনূঢ়া।

এই ত গেল পরিচয়ের কথা। এখন রূপ-গুণের কথা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। তবে গঙ্গার ঘাটে ললনা স্নান করিতে যাইলে বর্ষীয়সীরা বলাবলি করিতেন, 'ঠাকুর বিধবা করবেন বলেই ছুঁড়ির এত রূপ দিয়েছেন!' ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ডুব দিতে থাকিত। সমবয়স্করা কানাকানি করিত। কি বলিত তাহারাই জানে, তবে ভাবে বোধ হয়, বিশেষ প্রশংসা করিত না। ললনার তাহাতে কিছু আসে যায় না। সে বেশি কথাও কহিত না; বেশি কথায় থাকিতও না—দুই চারিটি কথা কহিত, স্নান করিত, জল লইত, উঠিয়া বাটী চলিয়া আসিত। কিন্তু ছলনার স্বতন্ত্র কথা। সে অধিক কথা কহিতে ভালবাসিত, অধিক কথায় থাকিতে ভালবাসিত, আটটার সময় স্নান করিতে গিয়া এগারটার কম বাটী ফিরিয়া আসিত না, গায়ে গহনা নাই বলিয়া মুখ ভারি করিত, মোটা চালের ভাত খাওয়া যায় না বলিয়া কলহ করিত, পাতে মাছ নাই কেন বলিয়া থালাসুদ্ধ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত; এইরূপে দিনের মধ্যে শত সহস্র কাজ করিত। তাহারও শরীরে রূপ ধরে না। তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ, গোলাপপুষ্পের মত মুখখানি। তাহাতে ভ্রূদুটি যেন তুলি দিয়া চিত্রিত করা, পাতলা দু'খানি ঠোঁট পান খাইয়া লাল করিয়া দর্পণ লইয়া নির্জ্জনে ছলনাময়ী আপনার রূপ দেখিয়া আপনি গৌরবে ভরিয়া উঠিত। মনে মনে বলিত, এই বয়সে এত রূপ, না জানি বয়সকালে কি হইবে! সমস্ত অঙ্গে কত গহনা থাকিবে; এইখানে বালা, এইখানে অনন্ত, এইখানে বাজু, এইখানে হার, চিক, কণ্ঠমালা, সাতনরি, দশনরি, বিশনরি, আরও কত কি—উঃ, তখন কি হইবে! এ আনন্দ ছলনা একা বহিতে পারিত না, ছুটিয়া দিদির কাছে আসিয়া বসিত।

ললনা জিজ্ঞাসা করিত, কি লা? ছুটচিস্ কেন?

দিদি, আমার রংটা কি আগেকার চেয়ে কালো হয়ে গেছে?

কালো হবে কেন?

হয়নি? আচ্ছা দিদি, আমাদের গাঁয় কেউ গুনতে জানে কি?

কেন?

আমি হাত দেখাব।

কেন?

তারা গুনে বলে দেবে, বড় হলে আমার গয়না হবে কি না।

ললনার চক্ষে জল আসিত—হবে দিদি হবে, তুই রাজরাণী হবি।

ছলনার লজ্জা করিত। মুখখানি লাল করিয়া ছুটিয়া অন্যত্র পলাইয়া যাইত। গহনা হইবে কি না তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রাজরাণীর কথা কে বলিয়াছে?

কখন আসিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিত, দিদি, আমাদের কিছু নেই কেন।

ললনা বলিত, আমরা দুঃখী তাই।

কেন দুঃখী দিদি? গাঁয়ে কে আমাদের মত এমন করে থাকে, এমনতর কষ্ট পায়?

ঈশ্বর যাকে যেমন করেছেন তাকে তেমনি করেই থাকতে হয়।

ঈশ্বর কাউকে এমন করলেন না, কেবল আমাদেরই এমন করলেন?

আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপ।

কি পাপ দিদি?

পাপ কি একরকম আছে বোন? হয়ত কত অকর্ম্ম করেছি! বাপ-মাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিনি, লোকের মনে অযথা ক্লেশ দিয়েছি—আরো কত কি হয়ত করেছি।

ছলনার মুখ ম্লান হইল। বলিল, এমনি করেই তবে কি চিরকাল কাটবে? কখন কি সুখ হবে না?

তা কেন ভাই, দুর্দ্দিন কেটে গিয়ে আবার সুদিন হবে। তাহার পর ছলনার হাত দুটি সস্নেহে আপনার হাতে লইয়া বলিত, দেখিস্ দেখি—তোর কত সুখ হবে; কত ঐশ্বর্য্য, কত গহনা, কত দাস-দাসী—তুই রাজরাণী হবি।

ললনা একথাটা যখন তখন বলিত। ছলনা না ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কথা বলিয়া ফেলিল, দিদি তুই?

সে জানিত তাহার দিদি বিধবা, তথাপি বালিকাসুলভ চপলতায় একটা কথা আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাই ছলনা অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, আমিও সুখে থাকব বোন—ঐ আমাকে মা ডাক্‌ছেন।

ললনা চলিয়া গেল। যথার্থ-ই মা তখন ডাকিতেছিলেন। কাছে আসিয়া বলিল, কেন মা?

তোমার বাবা এসেচেন, ঐ ঘরে—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ললনা চলিয়া গিয়াছে।

আহার করিতে বসিলে রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

মুখে গ্রাস তুলিয়া হারাণচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, সে অনেক কথা।

রাসমণি মুখব্যাদান করিলেন, অনেক কথা কি রে?

সে-গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া হারাণবাবু পূর্ব্বমত গম্ভীরমুখেই বলিলেন, অনেক কথা এই যে, মাথার উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় বয়ে গিয়েছে।

রাসমণির বিস্ময়ের সীমা নাই, ভাবনার সীমা নাই; প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, খুলেই বল্ হারাণ।

হারাণচন্দ্র গম্ভীরমুখে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, নষ্টচন্দ্রের কলঙ্কের কথা জান? আমার তাই হয়েছিল। চুরি করেছি বলে নন্দীরা আমাকে,—না, আমার নামে নালিশ করেছিল।

নালিশ করেছিল?

হাঁ, নালিশ করেছিল, কিন্তু মিছে কথা কতক্ষণ থাকে? কিছুই প্রমাণ হ'ল না—আজ মোকদ্দমা জিতে তাই বাড়ি আসছি।

ঘোমটার অন্তরালে শুভদা চক্ষু মুছিল। রাসমণি নন্দীদের বহু মঙ্গল কামনা করিলেন, তাহাদিগকে সগোষ্ঠী মুক্তি দিবার জন্য দুর্গার চরণে অনুযোগ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, কিন্তু ওরা চাকরিতে তোকে আর রাখবে কি?

হারাণচন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন—চাকরিতে রাখবে? আমি করলে তবে ত রাখবে? হারামজাদা ভগবান নন্দীর এ-জন্মে আমি আর মুখ দেখব? যদি বেঁচে থাকি তো প্রতিশোধ নেব—আমাকে যেমন অপমান করেচে, তার শোধ তুলব!

রাসমণি কিছুক্ষণ ভয়-বিস্মিত চক্ষে বীর ভ্রাতার পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, তা হলে কিন্তু খরচ-পত্রের—

সে ভাবনা ভেবনা দিদি—বেটাছেলে, আমার ভাবনা কি? কালই আর এক জায়গায় চাকরি জুটিয়ে নেব।

হারাণচন্দ্রের কথা যে রাসমণি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, তাহা নহে, তথাপি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া এ দারুণ দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে এ-সময়ে সকলেরই ইচ্ছা হয়। রাসমণিও

তাহাই করিলেন। মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়ত সে যাহা বলিতেছে তাহাই করিবে; এ বিপদের সময়ও অন্ততঃ চক্ষু ফুটিবে। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, যা ভাল হয় তাই করিস্—না হলে, অসুখ-বিসুখ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

একটা লম্বা-চওড়া উত্তর দিয়া হারাণচন্দ্র আহার শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

এইবার মাধবের সহিত সাক্ষাত হইল। সে শুনিয়াছিল পিতা আসিয়াছেন, তাই এতক্ষণ উন্মুখ হইয়া শয্যার উপর বসিয়াছিল। হারাণচন্দ্র নিকটে আসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কেমন আছ মাধব?

আজ ভাল আছি বাবা; তুমি এতদিন আসনি কেন?

হারাণচন্দ্র একটা মনোমত উত্তর খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু মাধব সেজন্য অপেক্ষা করিল না। আবার বলিল, তুমি আমার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিলে, না? ওষুধ এনেচ?

হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বলিলেন, এনেচি।

ভাল ওষুধ? খেলেই ভাল হব?

হবে বৈকি।

বালক প্রফুল্ল হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, দাও।

হারাণচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এখন নয়, রাত্রে খেয়ো।

বালক তাহাতেও সন্তুষ্ট। মৃদু হাসিয়া বলিল, বাবা, আমাকে একটা ডালিম কিনে দিও – দেবে?

হারাণচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, দেব।

তাহার পর শুভদা আসিলে তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে আনা-দুই পয়সা দিতে পারো?

কেন?

আমার দরকার আছে—একজনের ধার আছে, সে চাইতে এসেছে!

শুভদা বাক্স খুলিয়া দুই আনা পয়সা বাহির করিল। হারাণচন্দ্র উঁকি দিয়া দেখিলেন বাক্সে অনেকগুলি পয়সা আছে। হাত পাতিয়া দুই আনা লইয়া বলিলেন, থাকে ত আরো আনা-চারেক পয়সা দাও—মাধবকে একটা বেদানা কিনে দেব।

শুভদা কাতরভাবে স্বামীর মুখপানে একবার চাহিল। এতগুলি পয়সা একসঙ্গে বাহির করিয়া দিতে বোধ হয় তাহার ক্লেশ হইতেছিল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল।

পয়সাগুলি হাতে বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া হারাণচন্দ্র একটু জোর হাসিয়া বলিলেন, কালই আমি এসব শোধ করে দেব।

শুভদা অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িল। সে বিলক্ষণ জানিত, তাহার স্বামীর অর্দ্ধেক কথার কোন অর্থই থাকে না। এখন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া শুভদা বলিল, এখন কোথাও যেয়ো না—একটু শুয়ে থাক।

হারাণচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন—তা কি হয়? ঘরে বসে থাকলে কি আমার চলে? রাজ্যের কাজ আমার মাথার উপর পড়ে আছে।

তবে যাও—

তিনি চলিয়া গেলে শুভদা বাক্স খুলিল। আর একটি টাকা মাত্র আছে। বিন্দুবাসিনী সেদিন যাহা দিয়া গিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই একটি টাকা মাত্র তাহাদের সম্বল। শুভদা বাক্সের একটি নিভৃত কোনে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া মাধবের কাছে আসিয়া বসিল।

মা, কখন বাবা বেদানা আনবেন?

সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল—তথাপি হারাণচন্দ্রের দেখা নাই। মাধব অনেকবার খোঁজ লইল, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার পর কাঁদিতে লাগিল।

শুভদা কাছে আসিয়া বসিল। ললনা অনেক করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল; প্রথমে সে কিছুতেই ভুলিতে চাহে না, অবশেষে শ্রান্ত-মনে অবসন্ন শরীরে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি ভোর না হইতেই সে আবার উঠিয়া বসিল—মা, আমার ডালিম এনেছে।

শুভদা চক্ষের জল চাপিয়া বলিল, ডালিম তোমাকে খেতে নাই।

কেন?

খেলে অসুখ হবে।

সে উঠিয়া বসিয়াছিল, আবার শুইয়া পড়িল।

পরদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলে হারাণচন্দ্র বাটী আসিলেন। রাসমণি রাগ করিয়া একটা কথাও কহিলেন না। ললনা পা ধুইবার জল আনিয়া দিল, স্নান করিবার উপকরণ, হুঁকাতে জল ভরিয়া তামাক সাজিয়া দিল। হারাণচন্দ্র স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া আহার করিলে, শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, মাধবের বেদানা এনেচ?

ঐ যা—আহা-হা—পকেটে পয়সাগুলো রেখেছিলাম, ছেঁড়া পকেটে সমস্ত পয়সা

কোথায় পড়ে গেছে। থাকে ত আজ গণ্ডা-চারেক পয়সা ধার দিও, সন্ধ্যার সময় তোমাকে সমস্ত ফিরিয়ে দেব।

শুভদা ম্লানমুখে বলিল, আর কিছু নেই।

হারাণচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, তা কি হয়? তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কখনই ফুরোয় না।

শুভদা মনে মনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা স্মরণ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, সত্যি কিছু নেই।

কেন থাকবে না? কাল যে দেখলাম অনেকগুলো পয়সা আর একটা টাকা আছে।

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণচন্দ্র আবার বলিলেন, ছিঃ! আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে তোমার বিশ্বাস হয় না? সমস্ত টাকাটা দিয়ে না-হয় বিশ্বাস না হয়, আনা-চারেক পয়সারও বিশ্বাস রাখতে হয়।

আর আপত্তি করিল না, শুভদা হাত ধুইয়া প্রার্থিত অর্থ বাহির করিয়া দিল।

৫

অর্থের সদ্ব্যবহার বটে। হারাণচন্দ্র হলুদপুর গ্রাম পার হইয়া বামুনপাড়ায় আসিলেন। তাহার পর একটা গলিপথ ধরিয়া একটা দরমা-ঘেরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এখানে অনেকগুলি প্রাণী জড় হইয়া এককোণে বসিয়াছিল। হারাণচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহারা আহ্লাদে মহা-কলরব করিয়া উঠিল। অনেক প্রীতি-সম্ভাষণ হইল; কেহ বাবা বলিয়া ডাকিল, কেহ দাদা বলিয়া ডাকিল, কেহ খুড়ো, কেহ মামা, কেহ মেসো ইত্যাদি বহুসম্ভাষিত হইয়া মুরুব্বির মত হারাণচন্দ্র তন্মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন।

অনেক কথা চলিতে লাগিল। অনেক রাজা-উজিরেয়ে মুণ্ডপাত করা হইল, অনেক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হইল। এটা গুলির দোকান। সংসারের একপ্রান্তে শ্মশান, আর অপরপ্রান্তে গুলির দোকান। শ্মশানে মহারাজাও ভিক্ষুকের সমান হইয়া যান, এখানে ভিক্ষুক মহারাজের সমান হইয়া দাঁড়ান। টানে টানে অহিফেন মগজে যত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতে লাগিল, হৃদয়ের মহত্ত্ব, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি একে একে তেমনি ফাঁপিয়া ফুলিয়া প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইতে

লাগিল। কত দান, কত প্রতিদান! মণি, মুক্তা, হীরক, কাঞ্চন, কত রাজা, কত রাজকন্যা, টানে টানে অবাধে ভাসিয়া চলিতে লাগিল। একধারের এত রত্ন, জগতের তাবৎ বাঞ্ছিত বস্তু, অর্দ্ধ আলোকে, অর্দ্ধ আঁধারে, দরমার ঘরে, ভূতলে সে ইন্দ্রসভা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনেকগুলি কালিদাস, অনেকগুলি দিল্লীর বাদশাহ, অনেকগুলি নবাব সিরাজদ্দৌলা, অনেকগুলি মিঞা তানসেন একে একে ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন। জগতের নীচ লোকের সহিত তাঁহারা মিশিতে পারেন না, কথাবার্ত্তা আলাপ-পরিচয় করা শোভা পায় না, কাজেই তাঁহারা রাস্তার একপাশ ধরিয়া নিঃশব্দে স্ব স্ব প্রাসাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হারাণচন্দ্রও তাঁহাদের মত বাহিরে আসিলেন; কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাঁহার একটু বিভ্রাট ঘটিল। কোথা হইতে সেই হতভাগ্য পীড়িত মাধবের মুখখানা মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেদানার কথাটাও স্মরণ হইল। অপর সকলের মত তিনিও অবশ্য কোন একটা বিশেষ উচ্চপদ লাভ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মুখপোড়া ছোঁড়ার মুখখানা সে-রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিল। দিল্লীর বাদশা পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন রাজকোষ প্রায় শূন্য। অতবড় সম্রাটের চারিটি পয়সা ও একটি গাঁজার কলিকা ভিন্ন আর কিছুই নাই। বহুৎ আচ্ছা! তাহাই সহায় করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটা গঞ্জিকার দোকানে প্রবেশ করিলেন।

অধিকারীকে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, খুড়ো, চার পয়সার তামাক দাও ত।

অধিকারী সে আজ্ঞা সত্বর সম্পাদন করিল।

হারাণচন্দ্র তখন মনোমত এটা বৃক্ষতল অন্বেষণ করিয়া লইয়া গঞ্জিকা-সাহায্যে বিশৃঙ্খল রাজত্ব পুনরায় শৃঙ্খলিত করিয়া লইলেন। সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে রাত্রি অনেক হইতেছে দেখিয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অনেকদূর গিয়া একটা খোড়ো বাড়ির সম্মুখের দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, কাত্যায়নী!

কেহ উত্তর দিল না।

আবার ডাকিলেন, বলি কাতু বাড়ি আছ কি?

তথাপি উত্তর নাই।

বিরক্ত হইয়া হারাণচন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, বলি বাড়ি থাক ত দরজাটা একবার খুলে দিয়ে যাও না!

এবার অতি ক্ষীণকণ্ঠে জবাব আসিল, কে?

আমি—আমি।

আমার বড় শরীর খারাপ—উঠতে পারব না।

তা হবে না। উঠে খুলে দাও।

এবার একজন পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়া কাল-কাল মোটা-সোটা সর্ব্বাঙ্গে উল্কি-পরা মানানসই যুবতী যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতে করিতে আসিয়া খট্ করিয়া দ্বার মোচন করিল।

উঃ মরি—যে পেটে ব্যথা! অত ষাঁড়-চেঁচাচ্চ কেন?

চেঁচাই কি সাধে? দোর না খুললেই চেঁচামেচি করতে হয়।

যুবতী বিরক্ত হইল—না বাবু, অত আমার সইবে না! আসতে হয় একটু সকাল সকাল এসো। রাত্তির নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন যে অমনি করে চেঁচাবে তা হবে না, অত গোলমাল আমার ভাল লাগে না!

হারাণচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিলেন। তাহার পর কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আহা! পেটে ব্যথা হয়েছে, তা ত আমি জানিনে।

তুমি কেমন করে জানবে? জানে পাড়ার পাঁচজন। কাল থেকে এখন পর্য্যন্ত পেটে একবিন্দু জল যায়নি! তা এত রাত্তিরে কেন?

একটু কাজ আছে।

কাজ আবার কি?

বলছি। তামাক সাজ দেখি।

রমণী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া হাত দিয়া ঘরের একটি কোণ দেখাইয়া বলিল, ঐ কোণে সব আছে। তামাক খেতে হয় নিজে সেজে খাও না, আমাকে আর জ্বালাতন ক'রো না—আমি একটু শুই।

হারাণচন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিল, না তোমাকে বলিনি—আমার মনে ছিল না, তুমি শুয়ে থাক, আমিই সেজে নিচ্চি।

তখন তামাক সাজিয়া হুঁকা হস্তে হারাণচন্দ্র কাত্যায়নীর পার্শ্বে শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ তামাক সেবন করিবার পর ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, বড় মৃদু—পাছে গলার স্বর কর্কশ শুনায়, কহিলেন, কাতু, আজ আমাকে গোটা-দুই টাকা দিতে হবে।

কাত্যায়নী কথা কহিল না।

বলি শুনলে? ঘুমুলে কি? আজ আমাকে দুটো টাকা দিতেই হবে।

কাত্যায়নী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, কিন্তু কথা কহিল না।

হারাণচন্দ্র একটু সাহস পাইলেন। হুঁকাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, দেবে ত?

কাত্যায়নী কথা কহিল, মিছে ভ্যান্ ভ্যান্ করচ কেন? কোথা থেকে দেব?

কেন, তোমার নেই কি?

না।

আছে বৈ কি! বড় দরকার, আজ এ দয়া আমাকে করতেই হবে।

থাকলে ত দয়া করব।

দুটো টাকা তোমার আছেই। আমি জানি আছে। টাকার অভাবে বাড়িতে আমার খেতে পাচ্ছে না, আমার রোগা ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েছি; লজ্জায় ঘৃণায় আমার বুক ফেটে যাচ্চে, কাতু আজ আমাকে বাঁচাও—

থাকলে ত বাঁচাব? আমার একটি পয়সাও নেই।

এইবার হারাণচন্দ্রের ক্রোধ হইল; বলিলেন, কেন থাকবে না? এত টাকা দিলাম, আর আমার অসময়ে দুটো টাকাও বেরোয় না? চাবিটা দাও দেখি, সিন্দুক খুলে দেখি টাকা আছে কি না।

কাত্যায়নীর আঁতে ঘা লাগিল। একটা অবাচ্য অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিল। ক্রোধদৃপ্ত-লোচনে হারাণের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, কেন, তুমি কে যে তোমাকে সিন্দুকের চাবি দেব? সে ছোটলোকের মেয়ে, নীচ কথা তাহার মুখে বাধে না। অনায়াসে চীৎকার করিয়া বলিল, যখন রেখেছিলে তখন টাকা দিয়েছিলে, তা বলে তোমার দুঃসময়ে কি সে টাকা ফিরিয়ে দেব?

হারাণচন্দ্র একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন। কাত্যায়নীর মুখের সম্মুখে তিনি কখনই দাঁড়াইতে পারেন না, আজও পারিলেন না। নিতান্ত নরম হইয়া বলিলেন, তবু ভালবেসেও ত একটু উপকার করতে হয়?

ছাই ভালবাসা। মুখে আগুন অমন ভালবাসার। আজ তিনমাস থেকে একটি পয়সা দিয়েচ কি যে ভালবাসব।

ছিঃ! অমন কথা বোলো না কাতু, ভালবাসা কি নেই?

এক তিলও না। আমাদের যেখানে পেট ভরে সেইখানে ভালবাসা। এ কি তোমার ঘরের স্ত্রী যে গলায় ছুরি দিলেও ভালবাসতে হবে? তোমা ছাড়া কি আমার গতি নেই? যেখানে টাকা সেইখানেই আমার যত্ন, সেইখানে আমার ভালবাসা। যাও, বাড়ি যাও—এত রাত্তিরে বিরক্ত ক'রো না।

কাতু, সব কি ফুরোলো?

অনেকদিন ফুরিয়েচে। এতদিন চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিনি। আজ যখন কথা পাড়লে তখন সমস্ত স্পষ্ট করেই বলি; তোমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ—আমার এখানে আর এসো না। বাবুদের টাকা চুরি করে জেলে যাচ্ছিলে—চাকরি-বাকরি নেই, কোন্‌দিন আমার কি সর্ব্বনাশ করে ফেলবে, তার চেয়ে আগে-ভাগে পথ দেখাই ভাল। এখানে আর ঢুকো না।

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ সেইখানে সেই অবস্থায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার

পর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তাই হবে। এখানে আর আসব না। তোমার জন্যে আমার সব হ'ল ; তোমার জন্যে আমি চোর, তোমার জন্যে আমি লম্পট, তোমার জন্যে আমি স্ত্রী-পুত্র দেখি না, শেষে তুমিই—

হারাণচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, আজ আমার চোখ ফুটলো—

এবার কাত্যায়নীও নরম হইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, ঠাকুর করুন তোমার যেন চোখ ফোটে। আমরা ছোটলোকের মেয়ে, ছোটলোক—কিন্তু এটা বুঝি যে, আগে স্ত্রী-পুত্র বাড়ি-ঘর, তার পর আমরা : আগে পেটের ভাত, পরবার কাপড়, তার পর সখ, নেশা-ভাঙ। তোমার আমি অহিত চাইনে, ভালর জন্যই বলি—এখানে আর এসো না, গুলির দোকানে আর ঢুকো না—বাড়ি যাও ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র দেখ গে, একটা চাকরী কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটা অন্ন দাও, তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে এসো।

কাত্যায়নী শয্যা হইতে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া হারাণচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, এই নিয়ে যাও—

হারাণচন্দ্র বহুক্ষন অধোবদনে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমার দরকার নেই।

কাত্যায়নী অল্প হাসিল ; হাত দিয়া হারাণের মুখখানা তুলিয়া বলিল, যে কিছু জানে না তার কাছে অভিমান ক'রো —এ না নিয়ে গেলে কাল তোমাদের সবাইকে উপুস করতে হবে তা জান ?

কেন ?

তোমাদের যে কিছু নেই।

কেমন করে জানলে ?

এইমাত্র তুমি যে নিজেই বললে—ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েচ।

ওঃ—

শুধু তাই নয়! তুমি এত কথা না বললেও আমি আগে থেকেই সমস্ত জানি। নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে সব দেখে এসেচি।

কেন ?

প্রথমতঃ মেয়েমানুষের এসব আপনিই দেখতে ইচ্ছা হয়, তার পর সব দেখে-শুনে আট-ঘাট না বেঁধে চললে আমাদের চলে না। তোমরা যত বোকা, মেয়েমানুষ হলেও আমরা তত বোকা নই। তোমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, একবার ঠকলে আর একবার উঠতে পার, কিন্তু আমাদের কেউ নেই—একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারব না, আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কারো দয়া হবে না। লোকে বলে, 'যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন',

আমাদের সে ভরসাও নেই। তাই সমস্ত জিনিস খুব সাবধানে নিজে না দেখে-শুনে চললে কি আমাদের চলে? বুঝেচ?

কাত্যায়নীরও বোধ হয় ক্লেশ হইতেছিল; এসব কথা কহিতে কহিতে সে-মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে একটু ব্যথা অনুভব করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত ঢাকা দিয়া ফেলিল। হারাণচন্দ্রের মুখখানা একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, যা বললাম সব বুঝেচ? এই টাকাগুলো তোমার স্ত্রীর হাতে দিও—তবুও দু'দিন স্বচ্ছন্দে চলবে। নিজের কাছে কিছুতেই রেখো না। শুনচ?

হারাণচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলে, হাঁ।

অনেক রাত্রি হ'ল, আজ আর কোথাও যেও না। এইখানেই শুয়ে থাকো।

৬

শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তীকে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক 'সদাদাদা' বলিয়া ডাকিত, অর্দ্ধেক লোক 'সদাপাগলা' বলিয়া ডাকিত। এই হলুদপুর গ্রামেই তাহার বাটী। তাহার পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইংরাজী ম্লেচ্ছ ভাষা, ইংরাজী শিখিলে ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখান নাই। আর প্রয়োজনই বা কি? যে দু'দশ বিঘা জমি আছে তাহাতে পরের চাকুরি করিতে হইবে না, তবে মিছামিছি জাত দিয়া কি হইবে? কেহ বলিত, সে সংস্কৃত ভাষা জানে, কেহ বলিত, জানে না; যাহা হউক এ-বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সে যে পাগল তাহাতে আর মতভেদ নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বীকার করে, তাহার একটু বাতিকের ছিট আছে। জমি দেখে, রামপ্রসাদী গান গাহে, মড়া পোড়ায়, এ-বাটী ও-বাটী করে, এমনি করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটিয়া যায়। দূরসম্পর্কে এক পিসি ভিন্ন সংসারে আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই; তাই গ্রামশুদ্ধ লোককে সে আপনার করিয়া লইয়াছে। সকলেই তাহার আত্মীয়, সকলের সহিতই তাহার সম্পর্কের ডাক, সকল স্থানেই তাহার অবারিত দ্বার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসারে তাহার কেহ আপনার লোক নাই। বাল্যকালে সদানন্দর পিতা অনেক টাকা পণ দিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্য-দোষে এক বৎসরের মধ্যেই বধূটির মৃত্যু হয়। সেই অবধি, আজ ছয় বৎসর হইল, সদানন্দ একাকী আছে। টাকা জুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হৌক, আর ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই হৌক, সে আর বিবাহ করে নাই। তাহাদিগকে অনেক টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত; কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে সে তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিত, অত টাকা পাব কোথায় যে বিবাহ করিব?

আজ অপরাহ্নে আকাশে ভারি মেঘ করিয়াছে। সমস্ত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। প্রকৃতি এমন ভাব ধরিয়া আছে যেন ইচ্ছা করিলে এখনই প্রবলধারে জল ঢালিতে পারে এবং ইচ্ছা না করিলে হয়ত এখনও তিন-চার ঘণ্টা স্থগিত রাখিতে পারে।

পিসি রাসমণি ডাকিয়া বলিলেন, ও ললনা, ঘরে যে এক ফোঁটা খাবার জল নেই। চট্ করে ঘাট থেকে এক কলসী জল নিয়ে আয় না মা।

ললনা কলসী কাঁকালে গঙ্গার ঘাটে আসিল। জল লইয়া দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই মেঘ হইতে বড় বড় ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। ললনা হন্ হন্ করিয়া পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। আসিবার পথেই সদানন্দর বাটী, পথের ধারের আটচালা-ঘরের বারান্দায় বসিয়া সে তখন রামপ্রসাদী সুরে কালীনাম গাহিতেছিল। ললনাকে দেখিয়া গান থামাইয়া বলিল, ললনা ভিজচ কেন?

ললনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি গান থামালে কেন?

সদানন্দও হাসিল; হাসি-গান তাহার মুখে অষ্টপ্রহর লাগিয়াই আছে। সুর করিয়া বলিল, গান থামিয়া গেছে, তাহার পর স্বাভাবিক স্বরে কহিল, সে-কথা যাক মিছামিছি ভিজো না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

ললনা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল, দাঁড়িও না, বাড়ি যাও।

সে কি?

পিসিমা বাড়ি নাই, বেশ জল এলে যাবে কেমন করে?

ললনা ভাবিল, সে-কথাও বটে; দুই পদ অগ্রসর হইল, কিন্তু আবার পিছাইয়া আসিল।

সদানন্দ বলিল, ফিরলে কেন?

কাল রাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল, জলে ভিজলে অসুখ বাড়তে পারে।

তবে যেও না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

সদানন্দ তখন আপন-মনে গান ধরিল—

> কভু তারে পাব না বুঝি, মিছে হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছি।
> কত জ্বালায় জ্বলে মরি, তুই কি জানবি পাষাণী মা।
> আমার সোনার তরি ডুববে এবার—

ললনা কলসী নামাইয়া গান শুনিতেছিল; মিষ্ট গলায় মিষ্ট গান তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া যাওয়ায় বলিল, একি থামলে যে?

আর গা'ব না!

কেন?

আর মনে নাই।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, তবে গাইলে কেন ?

আমি অমনি গেয়ে থাকি। তাহার পর কিছুক্ষণ আকাশপানে চাহিয়া বলিল, মেঘের উপর পদ্ম ফোটে, তুমি দেখেচ ?

ললনা সহাস্যে বলিল, কই না, তুমি দেখেছ ?

হাঁ দেখেচি।

কবে দেখলে ?

প্রায়ই দেখি। যখন আকাশে মেঘ হয় তখনই দেখতে পাই।

সদানন্দর গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া ললনার হাসি আসিল। মুখে কাপড় দিয়া বলিল, তা কি হয় ?

কেন হবে না ? পদ্ম ত জলেই ফোটে, মেঘেতেও জলের অভাব নাই, তবে সেখানে ফুটবে না কেন ?

মাটি না থাকলে শুধু জলেতে কি পদ্ম ফোটে ?

সদানন্দ ললনার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া বলিল, তাই বটে! সেই জন্যই শুকিয়ে যাচ্ছে।

ললনা আর কিছু কহিল না। সকলেই জানিত সদাপাগলা দিনের মধ্যে অমন অনেক অসম্ভব ও অসংলগ্ন কথা কহিয়া থাকে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সদানন্দ আবার কহিল, ললনা, সারদা আর তোমাদের বাটীতে যায় না ?

ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বোধ হয় তখনকার মুখ সদানন্দকে দেখাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না।

সদানন্দ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, যায় না ?

না।

কেন ?

তা বলতে পারি না।

সদানন্দ গান ধরিল—

গান থামিল, কিন্তু বৃষ্টি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। বরং আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। ললনা কাঁকে কলসী তুলিয়া লইল। সদানন্দ দেখিয়া বলিল, ওকি, যাও কোথা ?

বাড়ি যাই।

এত বৃষ্টিতে গেলে অসুখ করবে যে।

কি করব।

ললনা চলিয়া গেলে সদানন্দ আবার গান ধরিল।

৭

হারাণচন্দ্র যখন স্ত্রীর হস্তে পুরাপুরি দশটা টাকা গুনিয়া দিলেন তখন শুভদার মুখের হাসি ফুটিয়াও ফুটিতে পাইল না, বরং ম্লান হইয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এ টাকা কোথায় পেলে ?

সেও সে টাকা হাসিয়া দিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল, শুভদা, তোমার কি মনে হয় এ টাকা আমি চুরি করে এনেছি ?

শুভদা আরও মলিন হইয়া গেল। তাহার পাপ অন্তঃকরণে একথা হয়ত একবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কি বলা যায় ? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা কি লওয়া উচিত ? চুরি করা ধন খাইবার পূর্ব্বে সে অনাহারে মরিতে পারে, কিন্তু আর সকলে ? প্রাণাধিক পুত্রকন্যারা ? শুভদা বুঝিল, একথা আলোচনা করিবার এখন সময় নহে, তাই টাকা দশটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

কতক সুখে-স্বচ্ছন্দে আবার দিন কাটিতে লাগিল। হারাণ মুখুয্যেকে এখন আর বড় একটা হলুদপুরে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটী আসিলে রাসমণি যদি জিজ্ঞাসা করেন, তুই সমস্তদিন কোথায় থাকিস রে ?

হারাণ বলেন, আমার কত কাজ, চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াই।

শুভদাও মনে করে তাই সম্ভব, কেন না আর সে পয়সা চাহিতে আসে না, কাল শোধ করিয়া দিব বলিয়া আর দুই আনা, চারি আনা, ধার করিয়া লইয়া যায় না। সে কোথায় থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব, কেন না আমি তাহা জানি। সে সমস্তদিন অনাহারে অবিশ্রাম চাকরির উমেদারি করিয়া বেড়ায়। কত লোকের কাছে গিয়া দুঃখের কাহিনী কহে, কত আড়তদারের নিকট এমন কি সামান্য দোকানদারদিগের নিকটও খাতাপত্র লিখিয়া দিবে বলিয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করে, কিন্তু কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। সে অঞ্চলে অনেকেই তাহাকে চিনিত ; সেইজন্য কেহই বিশ্বাস করিয়া রাখিতে চাহে না। সন্ধ্যার সময় হারণচন্দ্র শুষ্কমুখে বাটী ফিরিয়া আসেন ; শুভদা ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করে, আজ কোথায় খেলে ?

হারাণচন্দ্র স্ত্রীর কথায় হাসিবার চেষ্টা করেন ; বলেন, আমার খাবার অভাব কি ? কে আমাকে না জানে ?

শুভদা আর কথা কহে না, চুপ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ তাহার কলসীর জল শুকাইয়া আসিতেছে, টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে ;

আর দুই-একদিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু শুভদা মুখ ফুটিয়া তাহার স্বামীর নিকটে বলিতে পারে না, কাহাকেও জানাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না, শুধু আপন মনে যাহা আছে তাহা নাড়া-চাড়া করে।

আজ তিন দিবস পরে অনেক রাত্রে স্বামীর শ্রান্ত পা দুটি টিপিতে টিপিতে শুভদা মনে মনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তর্ক-বিতর্ক করিয়া মুখ ফুটিয়া কহিল, আর নেই, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে!

হারাণচন্দ্র চক্ষু মুদিয়া নিতান্ত সাধারণভাবে বলিলেন, দশ টাকা আর কতদিন থাকে।

আর কোন কথা কহিল না। দু'জনেই সে রাত্রের মত চুপ করিয়া রহিল। শুভদা ভাবিয়াছিল, কাল কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে; কিন্তু পারিল না। বিনা কারণে নিজেই অপরাধী সাজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল, খরচ করিতে করিতে টাকা কেন ফুরাইয়া যায়, এজন্য বিশেষ তিরস্কৃত হইবে। সত্য সত্য তিরস্কৃত হইলে বোধ হয় দোষ ক্ষালন করিতে প্রয়াস করিত, কিন্তু তৎপরিবর্তে সহানুভূতি পাইয়া আর কথা ফুটিল না।

পরদিন ভোর না হইতেই হারাণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। ললনা যেরূপ গৃহকর্ম করে, করিতে লাগিল, রাসমণি নিয়মিত স্নান করিয়া আসিয়া মাটির শিব গড়িয়া ঘরে বসিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, শুধু শুভদার হাত-পা চলে না, ম্লানমুখে এখানে একবার, ওখানে একবার করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেলা আটটা বাজে দেখিয়া ললনা কহিল, মা, তুমি আজ ঘাটে গেলে না? বেলা যে অনেক হ'ল।

এই যাই।

ললনা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জননী সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মা?

কিছুই না।

তবে অমন করে বসে আছ যে?

আর কি করব?

সেকি? নাবে না? ভাত চড়াবে না?

শুভদা তাহার চক্ষু দুটি কন্যার মুখের উপর রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আজ কিছু নেই!

কি নেই।

কিছুই নেই। ঘরে একমুঠো চাল পর্য্যন্ত নেই।

ললনার মুখ শুকাইয়া উঠিল—তবে কি হবে মা? ছেলেরা কি খাবে?

শুভদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভগবান জানেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, ললনা, একবার তোর বিন্দুপিসির কাছে গেলে হয় না?

কেন মা?

যদি কিছু দেয়।

ললনা চলিয়া গেল, শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন কথা সে আর কখন বলে নাই, এমন করিয়া ভিক্ষা করিতে কন্যাকে আর কখন সে পাঠায় নাই। সেই কথাই তাহার মনে হইতেছিল। লজ্জা করিতেছিল, বুঝি একটু অভিমানও হইয়াছিল। কাহার উপরে? জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত স্বামীর মুখ মনে করিয়া উপরপানে হাত দেখাইয়া বলিত, তাঁর উপরে।

কপালে হাত দিয়া অনেকক্ষণ সেইখানে শুভদা বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে; এমন সময় ছলনাময়ী একটা বেনে পুতুলের সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে এবং পুঁতির মালায় তাহার হস্তপদহীন ধড়খানা বিভূষিত করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা, ভাত দাও।

শুভদা তাহার মুখপানে চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

ছলনা আবার বলিল, বেলা হয়েচে, ভাত দাও মা।

তথাপি উত্তর নাই।

এ-হাতের পুতুল ও-হাতে রাখিয়া ছলনা আরো একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, ভাত বুঝি এখনো হয়নি?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল না।

কেন হয়নি? তুমি বুঝি বেলা পর্য্যন্ত শুয়েছিলে! তাহার পর কি মনে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, উনুনে আগুন পর্য্যন্ত এখনো পড়েনি বুঝি?

শুভদা বাহির হইতে ক্ষুব্ধভাবে কহিল, এইবার দেব।

ছলনা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মার মুখখানা দেখিয়া এইবার যেন একটু অপ্রতিভ হইল। কাছে বসিয়া বলিল, মা, এখন পর্য্যন্ত কিছু হয়নি কেন?

এইবার সব হবে!

মা, তুমি অমন করে আছ কেন?

এই সময়ে ঘরের ভিতর হইতে পীড়িত মাধব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, ও-মা!

শুভদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছলনাময়ীও দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি ব'স, আমি মাধবের কাছে গিয়ে বসি।

তাই যা মা।

বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ললনা খিড়কির দ্বার দিয়া ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিল; কিন্তু বিন্দুবাসিনী সেখানে নাই। পূর্ব্বরাত্রেই সে শ্বশুরবাটী চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে হঠাৎ যাইতে হইয়াছিল, না হইলে শুভদার সহিত নিশ্চয় একবার দেখা করিয়া যাইত।

ম্লান-মুখে ললনা ফিরিয়া আসিল। পথে তাহার কিছুতেই পা চলিতে চাহে না। গাঙ্গুলী-বাড়ি যাইবার সময় লজ্জায় তখনও পা চলিতেছিল না। কিন্তু শুধু-হাতে ফিরিয়া আসিবার সময় আরো লজ্জা করিতে লাগিল। পথের ধারে একটা গাছতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া অন্য পথে গঙ্গার ঘাট-পানে চলিল!

নিকটে চক্রবর্ত্তীদের বাটী। বাহিরে আটচালার পার্শ্বে সদানন্দ একটা গোবৎসকে বহুবিধ সম্বোধন করিয়া আদর করিতেছিল। ললনা সেইখানে প্রবেশ করিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, ললনা, তুমি যে!

পিসিমা বাড়ি আছেন?

না। এইমাত্র কোথায় গেলেন।

ললনা ইতস্ততঃ করিয়া একপদ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ গোবৎসকে ছাড়িয়া দিয়া ললনার মুখপানে চাহিয়া বলিল, পিসিমার কাছে দরকার আছে কি?

হাঁ।

তিনি ত বাড়ি নেই, আমাকে বললে হয় না?

ললনাও সেই কথা ভাবিতেছিল, কিন্তু সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র লজ্জায় তাহার সমস্ত বদন লাল হইয়া গেল! বাটীতে কিছু খাইবার নাই সেইজন্য আসিয়াছি—ছি ছি! একথা কি বলা যায়? একদিন না খাইলে কি চলে না? কিন্তু আর সবাই? শুভদাও একদিন ঠিক এই কথাই ভাবিয়াছিল, আজ ললনাও তাহাই ভাবিল—তবু মুখ ফুটে না। যে কখনো এ অবস্থায় পড়িয়াছে, সে-ই জানে ইহা বলা কত কঠিন! সেই কেবল বুঝিবে ভদ্রলোকের একথা বলিতে গিয়া বুকের মাঝে কত আন্দোলন, কত ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া যায়। বলিবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া জিহ্বার প্রতি শিরা আপনা-আপনি আড়ষ্ট হইয়া ভিতরে ভিতরেই জড়াইয়া যায়।

ললনা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না; কিন্তু সদানন্দ যেন বুঝিতে পারিল, তাহার মুখ দিয়া ভিতরের ছায়া বুঝি কতক অনুমান করিয়া লইল, তাই হাসিয়া উঠিয়া ললনার হাত ধরিল। সে পাগল; সকলেই জানিত সদাপাগলার মতি-স্থির নাই। এমন অনেক কাজ সে করিয়া ফেলিত যাহা অন্যে করিতে পারিত

না ; অন্যে যাহাতে সঙ্কোচ করিত, সে হয়ত তাহাতে সঙ্কোচ করিত না ; অন্যকে যাহা মানাইত না, তাহাকে হয়ত সেটা মানাইয়া যাইত। তাই স্বচ্ছন্দে আসিয়া সে ললনার হাত ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, আজ বুঝি ললনার তার সদাদাদাকে লজ্জা হচ্ছে ? সদাপাগলাকে বুঝি লজ্জা করতে হয় ? হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি, কথা বলবে না ?

সদানন্দের গলার স্বর, কথার ভাব একরকমের। হাসিতে হাসিতেও সে অনেক সময় এমন কথা বলিত, যাহা শুনিলে চোখের জল আপনি উছলিয়া উঠে। তথাপি ললনা কথা কহে না। এবার সদানন্দ মুখ তুলিয়া নিতান্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিল, কি রে ললনা ? কিছু হয়েছে কি ?

ললনা মুখ নীচু করিয়া চক্ষু মুছিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, আমাকে একটা টাকা দাও।

সদানন্দ পূর্ব্বের মত, বরং আর একটু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, এই কথা ! এটা বুঝি আর সদাদাদাকে বলা যায় না ? কিন্তু টাকা কি হবে ?

তখনও লজ্জা ! ললনা ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জায় আরো একটু রক্তবর্ণ হইয়া বলিল, বাবা বাড়ি নেই।

সদানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটার পরিবর্ত্তে পাঁচটা টাকা আনিয়া ললনার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, মানুষের মত মানুষ হ'লে তাকে লজ্জা করতে হয়। পাগলকে আবার লজ্জা কি ? তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, যখন কিছু প্রয়োজন হবে তখন ক্ষ্যাপা পাগলাটাকে আগে এসে ব'লো। কেমন বলবে ত ?

ললনা দেখিল তাহার হস্তে অনেকগুলি টাকা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বলিল, এত টাকা কি হবে ?

রেখে দিলে পচে যাবে না।

তা হোক, এত টাকায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিতেছে দেখিয়া সদানন্দ আবার আসিয়া তাহার হাত ধরিল। কাতরভাবে বলিল, ছি, ছেলেমানুষি ক'রো না। টাকার প্রয়োজন না থাকে অন্যদিন ফিরিয়ে দিও। আর একথা কাকেও ব'লো না, তবে নিতান্ত যদি বলতে হয়, ব'লো যে সদাপাগলা টাকায় চার পয়সা হিসাবে সুদে টাকা ধার দিয়েছে।

দিনমান এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলে আহার করিল, কিন্তু শুভদা সেদিন জলস্পর্শও করিল না। রাসমণি অনেক গালাগালি করিলেন, ললনা অনেক পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু কিছুই সেদিন তাহার মুখে উঠিল না।

সন্ধ্যার পর হারাণচন্দ্র রুক্ষ মাথায়, একহাঁটু ধুলা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রের কোঁচার একপার্শ্বে সের-দুই আন্দাজ চাউল, অপরপার্শ্বে একটু লবণ,

দুটো আলু, দুটো পটল, আরো এমন কি কি বাঁধা ছিল। একটা পাত্র আনিয়া সেগুলি খুলিয়া রাখিবার সময় শুভদা কাঁদিয়া ফেলিল। চাউল একরকম নহে; তাহাতে সরু, মোটা, আতপ, সিদ্ধ সমস্তই মিশ্রিত ছিল। শুভদা বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামী তাহাদিগের জন্য ঐগুলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মাধব বলিল, বড়দিদি, আমি বোধ হয় আর ভাল হতে পারব না।

ললনা সস্নেহে ভ্রাতার মস্তকে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল, কেন ভাই ভাল হবে না? আর দু'দিনেই তুমি সেরে উঠবে।

কত দু'দিন কেটে গেল; কই সেরে ত উঠলাম না।

এববার সারবে।

আচ্ছা, যদি ভাল না হই?

নিশ্চয় হবে।

যদি না হই?

ললনা তাহার দুর্ব্বল ক্ষীণ হাত দুইটি আপনার হাতে লইয়া অল্প গম্ভীর হইয়া বলিল, ছি, ওকথা মুখে আনতে নেই।

মাধব আর কথা কহিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ললনা কহিল, কিছু খাবি কি?

মাধব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কিছুক্ষণ পরেই ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল। ললনা একটা ছোট কাঁচের গ্লাসে একটু পাঁচন ঢালিয়া মাধবের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, খাও।

মাধব পূর্ব্বের মত শিরশ্চালন করিল। ঔষধ সে কিছুতেই খাইবে না। সে এরূপ প্রায়ই করিত, তিক্ত ঔষধ বলিয়া সে কিছুতেই খাইতে চাহিত না, কিন্তু একটু জোর করিলেই খাইয়া ফেলিত।

ললনা বলিল, ছি, দুষ্টামি করে না—খাও।

মাধব হস্তে গ্লাস লইয়া সমস্ত ঔষধ নীচে ফেলিয়া দিল।

মাধব আর কখনও এরূপ করে নাই। ললনা বিস্মিত হইল, ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, ও কি মাধু?

আমি ওষুধ আর খাব না।

কেন?

মিছামিছি খাব কেন? যদি ভালই হব না, তবে ওষুধ খেয়ে কি হবে?

কে বলেচে ভাল হবে না?

মাধব চুপ করিয়া রহিল।

ললনা নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিল, মাধু, আমার কথা শুনবে না?

বালক-সুলভ অভিমানে তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

আমার কথা কেউ শোনে না, আমিও কারো কথা শুনব না।

কে তোমার কথা শোনে না?

কে শোনে? আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে মা রাগ করেন, বাবা রাগ করেন, পিসিমা কথা কন না, তুমিও রাগ কর, তবে আমি কেন কথা শুনব?

মাধবের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললনা সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি শুনব।

তবে বল, আমি ভাল না হলে কি রোজ এমনি করেই শুয়ে থাকব?

তা কেন?

তবে কি?

ললনার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল। কোন কথা কহিতে পারিল না।

মাধব তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বড়দিদি, আমাদের ছোটভাই যদুর অসুখ হয়েছিল, কিন্তু সে ভাল হ'লো না। তার পর মরে গেল। বাবা কাঁদলেন, মা কাঁদলেন, পিসিমা কাঁদলেন, তুমিও কাঁদলে, সবাই কাঁদলে—মা আজো কাঁদেন, কিন্তু সে আর এল না, আমিও যদি তার মত মরে যাই?

ললনা দুই হস্তে নিজের মুখ আবৃত করিল। অন্য সময় হইলে সে তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিত, কিন্তু এখন পারিল না। মাধবও কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর পুনর্ব্বার কহিল, বল না বড়দিদি, মরে গেলে কি হবে?

ললনা মুখ আবৃত করিয়াই কহিল, কিছু না—শুধু আমরা কাঁদব। বুঝি সে তখনই কাঁদিতেছিল।

মাধব বুঝিতে পারিয়াছিল কি-না জানি না, কিন্তু সে আজ আর ছাড়িবে না; অনেকদিন হইতে যে কথার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা আজ সমস্ত জানিয়া লইবে। তাই পুনর্ব্বার বলিল, দিদি, মরে গেলে কোথায় যেতে হয়?

ললনা উপর-পানে চাহিয়া বলিল,—ঐখানে—আকাশের উপরে।

আকাশের উপরে? বালক বড় বিস্মিত হইল—কিন্তু সেখানে কার কাছে থাকব?

ললনা অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, আমার কাছে।

মাধব অতিশয় সন্তুষ্ট হইল ; হাসিয়া বলিল, তবে ভাল আচ্ছা আমাদের সেখানে বাড়ি আছে ?

আছে।

তবে আরো ভাল। আমরা দু'জনে সেখানে বেশ থাকব, না ?

হাঁ। ললনা মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন তাহাই হয়।

মাধব হাত দিয়া তাহার মুখ আপনার দিকে ফিরাইয়া বলিল, বড়দিদি, সেখানে যা ইচ্ছে তাই খেতে পাওয়া যায় না ?

যায়।

অনেক ডালিম আছে।

আছে।

বালক একগাল হাসিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিল। যেন এত আনন্দ সে একপার্শ্বে একভাবে থাকিয়া সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিবে না ; কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া বলিল, দিদি, ক'বে যাওয়া হবে ?

মাধু !

কি দিদি ?

মাকে ছেড়ে তুই কেমন ক'রে যাবি।

কেন, মা-ও ত যাবে !

যদি না যায় ?

আমি ডেকে নিয়ে যাব।

তাতেও যদি না যায় ?

এইবার মাধব বড় বিষণ্ণ হইল। দিদি, মা কি কখন যাবে না ?

যাবে, কিন্তু অনেকদিন পরে।

তা হোক—আমরা আগে যাব ; তার পর না হয় মা যাবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, মাকে জিজ্ঞেস করলে হয় না ?

না। এ-কথা মাকে বললে, তিনিও যাবেন না—আমাকেও যেতে দেবেন না।

মাধব ভয়ে ভয়ে বলিল, তবে বলব না। তুমি আমাকে ওষুধ দিয়ে খাও গে যাও। আমি শুয়ে থাকি।

ঔষধ খাইয়া, বাতাসা খাইয়া, জল খাইয়া, মাধবচন্দ্র মনের সুখে আকাশের কথা ভাবিতে লাগিল। সেখানে কত কি করিবে, কত ঘুরিয়া বেড়াইবে, কত ডালিম খাইবে, দুই-চারিটা জননীর নিকটে নীচে ফেলিয়া দিবে, ভাল ভাল পাকা ডালিম নিজে খাইয়া খোসাগুলো ছলনাদিদির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিবে, একটি দানাও তাহাতে

রাখিবে না, ছলনাদিদি খুব চাহিবে, অনেক চাহিবে—তবে ছুটো-একটা ফেলিয়া দিবে, আরো কত কি শত-সহস্র কর্ম্মের তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিতে করিতে মাধবচন্দ্র সে-রাত্রের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

আর ললনা? সেও সে-রাত্রের মত অদৃশ্য হইল। পিসিমা রাসমণি, জননী শুভদা, ছলনা, হারাণচন্দ্র সকলেই ডাকাডাকি করিল, কিন্তু কিছুতেই সে উপরের দ্বার খুলিল না।

বড় মাথা ধরিয়াছে—আমাকে ডাকিও না—আমি কিছুতেই উঠিতে পারিব না।

পরদিন হইতে মাধবচন্দ্র একটু অন্যরকম হইয়াছে। সে একে শান্ত, তাহার উপর আরো শান্ত হইয়াছে। ঔষধ খাইতে আর আদৌ আপত্তি করে না—এটা খাব না, ওটা দাও, ও খাব না, তা দাও, এরূপ একবারো বাহানা করে না। আজকাল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। মা যদি কখন জিজ্ঞাসা করেন, মাধু, কিছু খাবি কি? সে বলে, দাও।

কি দেব?

যা হয় দাও।

বড়দিদি কাছে বসিয়া থাকিলে ত আর কথাই নাই। ছু'জনে চুপি চুপি অনেক কথা কহে, বিস্তর পরামর্শ করে; কিন্তু কেহ আসিয়া পড়িলেই চুপ করিয়া যায়।

এখন হইতে হারাণের সংসারে আর তেমন ক্লেশ নাই। যখন বড় কিছু হয় তখনই ললনা ছুটো-একটা টাকা বাহির করিয়া দেয়। শুভদা জানে কোথা হইতে টাকা আসিতেছে, রাসমণি ভাবে হারাণ কোথা হইতে লইয়া আসে, হারাণ ভাবে, মন্দ কি! যখন কোথা হইতে আসিতেছে, তখন কোথা হইতেই আসুক। আমিই বা কোথা হইতে আনিব? তবে একটা কথা তাঁহার আজকাল প্রায়ই মনে হইতেছে, সে-কথাটা আফিমের মৌতাত সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, অভ্যাসটা বুঝি একেবারেই ছাড়িয়া যাইতেছে। আর ছাড়িলেই বা উপায় কি? বাহাল রাখিবার মত আফিম বা কোথা হইতে যোগাইবে? যেমন করিয়া হউক আর যাহা করিয়াই হউক পেট ভরিয়া যখন চারিটা খাইতে পাইতেছি, তখন ওজন্য আর মন খারাপ করিব না; সময় ভাল হইলে আবার হইবে, এখন যেমন আছি তেমনই থাকি।

দিনকতক পরে সদানন্দর পিসিমাতা একদিন তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, বাবা, আমাকে একবার কাশী দেখিয়ে নিয়ে এস; কবে মরব কিছুই জানা নাই, অন্ততঃ এজন্মে একবার কাশী বিশ্বেশ্বর দেখে নিই।

সদানন্দ কোনো কিছুতেই আপত্তি করে না, ইহাতেও করিল না। দুই-একদিন পরে কাশী যাইবে স্থির করিল। যাইবার দিন সন্ধ্যাবেলা 'ললনা', 'ললনা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সে একেবারে উপরে আসিয়া উঠিল। ললনা তখন উপরেই ছিল, সদানন্দকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ কোঁচায় কাপড়ে করিয়া গোটা-পঞ্চাশ টাকা বাঁধিয়া আনিয়াছিল, সেইগুলি খুলিয়া একটা বালিশের তলায় চাপা দিয়া রাখিয়া বলিল, আমরা আজ কাশী যাব। কবে ফিরব বলতে পারি না। যদি প্রয়োজন হয় এগুলি খরচ ক'রো।

ললনা বিস্মিত হইয়া উঠিল—এত টাকা?

সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দও হাসিয়া উঠিল—কত টাকা? পঞ্চাশ টাকা বেশি টাকা নয়। দেখতে অনেকগুলি বটে, কিন্তু খরচের সময় খরচ করতে অনেক নয়।

কিন্তু এত—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সদানন্দ কি একরূপ হস্তভঙ্গি করিয়া একেবারে নীচে আসিয়া রন্ধনশালায় শুভদার নিকট আসিয়া বসিল।

খুড়িমা, আমরা কাশী যাব।

শুভদা সে-কথা শুনিয়াছিল। বলিল, কবে আসবে?

তা কেমন করে বলব? তবে পিসিমার কাশী দেখা হলেই ফিরে আসব বোধ হয়।

শুভদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাই এসো বাবা। আশীর্ব্বাদ করি নিরাপদে থেকো।

সদানন্দ উচ্চ হাসিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন ললনা অর্দ্ধেকগুলি টাকা নিজের নিকট রাখিয়া অপর অর্দ্ধেক মাতৃসকাশে ধরিয়া দিয়া বলিল, মা, যাবার সময় সদাদাদা এই টাকাগুলি দিয়ে গেছেন।

শুভদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেগুলি গুনিতে লাগিল। গণনা শেষ করিয়া কন্যার পানে চাহিয়া বলিল, সদানন্দ আর জন্মে বোধ হয় আমাদের কেউ ছিল।

ললনা মাথা নাড়িয়া বলিল, বোধ হয়।

এত টাকা কি মানুষে দিতে পারে?

ললনা উত্তর দিল না।

ললনা, সদানন্দ কি পাগল?

কেন?

তবে এমন করে কেন?

দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হওয়া কি পাগলের কাজ?

তবে লোকে পাগল বলে কেন?

ললনা সহাস্যে বলিল, লোকে অমন বলে থাকে।

* * *

হারাণ মুখুয্যের সংসারে আজকাল কষ্ট নাই বলিলেই হয়! খাওয়া-পরা বেশ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পাড়ার পাঁচজনে কথা বলিতে লাগিল।

কেহ বলিল, হারাণে বেটা নন্দীদের ঢের টাকা মারিয়াছে; কেহ বলিল, বেটা আজকাল একটা বড়লোক। কেহ বলিল, কিছুই নাই—বাড়িতে দু'বেলা, হাঁড়ি চড়ে না। এমনি অনেক কথা হইত। যাহারা পর তাহারা একটু কম কৌতূহলী হইয়া রহিল, যাহারা একটু আত্মীয় তাহারা অধিক কৌতূহলী হইয়া মুখোপাধ্যায়-পরিবার সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণঠাকুরাণী সহসা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বলি বৌয়ের কি হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়া চুকল কি?

শুভদা বলিল, হাঁ, এইমাত্র।

তখন কৃষ্ণঠাকুরাণী পানের সহিত তামাকপত্র চর্ব্বণ করিতে করিতে এবং পিক ফেলিতে ফেলিতে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন, বৌ, হারাণ আজকাল কচ্চে কি?

কি আর করবেন—চাকরি-বাকরির চেষ্টা কচ্চেন।

সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা উত্তর করিল না।

কৃষ্ণঠাকুরাণী আবার বলিলেন, লোকে বলে হারাণ মুখুয্যে নন্দীদের ঢের টাকা মেরেচে; সে আজকাল বড়লোক—তার খাবার ভাবনা কি? কিন্তু আমি ত সব কথা জানি, তাই বলি, সংসার এখন চলে কেমন করে?

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, অমনি একরকম করে।

হারামজাদা মাগী বামুনপাড়ার কাত্তি, সে-ই ত এই দুর্ঘটনা ঘটালে; ইচ্ছা করে মুখপুড়ীকে পাঁশ পেড়ে কাটি।

শুভদা একথা কানে না তুলিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, তোমার খাওয়া হয়েছে।

হাঁ বোন, হয়েছে। সেই হারামজাদীই ত এই সর্ব্বনাশ ঘটালে। হারাণ মুখ্যু কি না, তাই তার ফাঁদে পা দিলে। তিন হাজার টাকা চুরি করলি, না হয় দুশ'-একশ' মাগের হাতেই এনে দিতিস্! তবু ত কিছু থাকত?

শুভদা বলিল, ঠাকুরঝি, আজ কি রাঁধলে?

কি আর রাঁধব বোন? আজ বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাতে-ভাত ছাড়া আর কিছুই করিনি। তা মাগীর কি ছাই একটু পরকালের ভাবনাও আছে? মিনসে দুটো টাকার জন্যে যখন হাতে-পায়ে ধরলে, তখন কি না ঘর থেকে বের করে দিলে! কিন্তু ভগবান কি নেই? বামুনের যেমন সর্ব্বনাশ করেচে, তোর মতন সতীলক্ষ্মীর

যখন চোখের জল ফেলিয়েচে, তখন শাস্তি কি হবে না? তুই দেখিস, আমি বললাম—

শুভদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, বিন্দু অমন হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি চলে গেল কেন?

ওর শ্বশুরের নাকি রাতারাতি কলেরা হয়েছিল। তা তুই এখন সংসারের কিরকম বন্দোবস্ত করবি?

আমি আর কি করব? ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে।

কৃষ্ণঠাকুরাণী একটু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, তা ত হবেই। কিন্তু ভাবনার উপর ভাবনা হচ্চে এই তোর ছোট মেয়েটা। ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল—এখন তার বিয়ে না দিলে ভালও দেখাবে না বটে, আর লোকেও পাঁচ কথা বলবে। তার কিছু উপায় হচ্চে?

শুভদা যখন ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, তখন ললনা সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছলনার কথা সে কতক শুনিতে পাইয়াছিল, এবং কতক অনুমান করিয়া লইয়া বেশ বুঝিল যে, সুসময়ই হোক, আর অসময়ই হোক, বাঙালীর ঘরে মেয়ের বিবাহ না দিলে চলিবে না; সম্ভবতঃ জাতি যাইবে।

৯

শুক্লা একাদশী রজনীর প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথী-তীরের অর্দ্ধবনাবৃত একটা ভগ্ন শিবমন্দিরের চাতালের উপর একজন দ্বাবিংশ-বর্ষীয় যুবক যেন কাহার জন্য চাহিয়া বহুক্ষণ হইতে বসিয়া আছে।

যুবকের নাম সারদাচরণ রায়। হলুদপুর গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের একমাত্র সন্তান। লেখাপড়া কতদূর হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মদক্ষ তাহা বলিতে পারি। বৃদ্ধ পিতার সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম নিজেই নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। সারদাচরণের জননী জীবিত নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন হারাণ মুখুয্যেদের বাটীর সহিত ইঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল; রাসমণি ও সারদার জননী উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এখন তিনিও গত হইয়াছেন, আত্মীয়তা বন্ধুত্বও গত হইয়াছে। বিশেষ সারদাচরণের পিতা হরমোহনবাবু দরিদ্রের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না।

এইখানে একটু ললনার কথা বলিয়া রাখি, কেননা, তাহার সহিত এ আখ্যায়িকায় আমাদিগের অনেক প্রয়োজন আছে। বালিকা-কাল হইতেই সারদার সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার পর তাহার বিবাহ হয়। হারাণবাবুর অবস্থা তখন

মন্দ ছিল না, ক্ষুদ্র আয়তনে যতখানি সম্ভব ঘটা করিয়া বড়মেয়ের বিবাহ দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, ললনা দুই বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে। তখনও সারদাচরণের সহিত তাহার ভাব ছিল। সে ভাব কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দুইজনেরই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ক্রমে দুইজনেই বুঝিতে লাগিল যে, এ প্রণয় পরিণামে বড় সুখের হইবে না। সারদাচরণ না বুঝুক কিন্তু ললনা একথা বেশ বুঝিতে লাগিল। ক্রমশঃ ললনা ভালবাসার দোকান-পাট একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সে আর কাছে আসে না, আর আসিতে বলে না, আর ভালবাসা জানায় না, আর গোপনে তেমন করিয়া পত্র লিখে না—দেখিয়া শুনিয়া সারদাচরণ বড় বিপদে পড়িল। প্রথমে সে অনেক বুঝাইল, অনেক আপত্তি করিল, অনেক যুক্তি দেখাইল; কিন্তু ললনা কর্ণযুগল বন্ধ করিয়া রহিল। একদিন সে একরূপ স্পষ্টই কহিল, তার এসব ভাল লাগে না।

সারদাচরণও সে দিবস কুপিত হইল, বলিল, যদি ভাল লাগে না তবে এতদিন লাগল কেন?

এতদিন ছেলেমানুষ ছিলাম, এখন বড় হয়েছি।

বড় হলে বুঝি আর ভাল লাগতে নাই?

না।

কিন্তু বুঝে দেখ—

কথা শেষ না হইতেই ললনা বলিয়া উঠিল, আর বুঝে কাজ নাই। তুমি আমাকে আর কুপরামর্শ দিও না।

সারদাচরণ চটিয়া উঠিল, বলিল. আমি বুঝি তোমাকে কুপরামর্শ দিই?

দাও না ত কি।

দিই?

দাও।

তবে এস আজ সব শেষ করে দিই।

ভালই ত।

তোমার সঙ্গে এ-জন্মে আমি আর কথা ক'ব না।

ক'য়ো না।

তখন দুইজনে দুইজনের গন্তব্যস্থলে চলিয়া গেল। সমস্ত পথটা সারদাচরণ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে গেল, সমস্ত পথটা ললনা চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিল।

সে আজ চারি বৎসরের কথা। চারি বৎসর পরে সারদাচরণ আবার ললনার পথ চাহিয়া ভগ্ন মন্দিরে বসিয়া রহিল। সে পূর্ব্বের কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছিল, অন্ততঃ যাইতেছিল; কিন্তু ললনাই পুনর্ব্বার অনুরোধ করিয়া তাহাকে এ-স্থানে

আনয়ন করিয়াছে। তাই পূর্ব্বের কথা পুনরায় একটির পর একটি করিয়া তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইতে লাগিল। কেহ বলে, বাল্য-প্রেমে অভিসম্পাত আছে; কেহ বলে, বাল্য-প্রেম দৃঢ় হয় না; কেহ বলে, দৃঢ় হয়। যাহাই হৌক এ-বিষয়ে ঠিকঠাক একটা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা নাই। সকল রকমই হইতে পারে; কিন্তু যাহাই হৌক, ইহার একটা স্মৃতি চিরদিনের জন্য ভিতরে রহিয়া যায়। যেমন করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হৌক না কেন, একটু ক্ষুদ্রতম শিকড় বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে অনেক হাত জমির তলে পাওয়া যায়।

সারদাচরণের অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। আজ চারি বৎসর পরে সে আবার আসিবে, কাছে বসিবে, কথা কহিবে! সারদার ভিতরটা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল, আনন্দে যেন অল্প রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু কেন? কেন আসিবে? কেন আমাকে এ-সময়ে এ-স্থানে আসিতে অনুরোধ করিল? আর কি সম্বন্ধ আছে?

রাত্রি প্রায় একটা বাজে। একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সেই পথে আসিতে লাগিল। সারদাচরণ ভাবিল, একি ললনা? ললনাই ত বটে! কিন্তু বড় হইয়াছে।

ললনা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সারদাচরণ সঙ্কোচ ছাড়িয়া বলিল, ব'স।

তখন বহুদিনের পর দুইজনে মুখোমুখি হইয়া চাঁদের আলোকে ভগ্ন মন্দিরে সেই চাতালের উপর উপবেশন করিল। বহুক্ষণ অবধি কেহ কথা কহিতে পারিল না! তাহার পর সারদাচরণ সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল, আমাকে এখানে ডেকে আনলে কেন?

ললনা মুখ তুলিয়া বলিল, আমার প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন?

বলছি।

পুনরায় বহুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইলে সারদাচরণ বলিল, কই বললে না?

বলছি। পূর্ব্বে তুমি আমাকে ভালবাসতে, এখন আর বাস কি?

প্রশ্নের ভাবে সারদাচরণ বড় বিস্মিত হইল। কহিল, সে কথা কেন?

কাজ আছে।

যদি বলি এখনও ভালবাসি?

ললনা মৃদু হাসিয়া সলজ্জে বলিল, আমাকে বিবাহ করবে?

সারদাচরণ একটু পিছাইয়া বসিল। বলিল, না।

কেন করবে না?

তোমাকে বিবাহ করলে জাত যাবে।

গেলেই বা।

খাব কি?

খাবার ভাবনা তোমাকে করতে হবে না।

কিন্তু পিতার মত হবে না।

হবে। তুমি তাঁর ত একটিমাত্র সন্তান; ইচ্ছা করলে মত করে নিতে পারবে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সারদাচরণ বলিল, তবুও হয় না।

কেন?

অনেক কারণ আছে। প্রথমত পিতার মত হলেও, তোমাকে বিবাহ করলেই জাত যাবে। জাত খুইয়ে হলুদপুরে তিষ্ঠান আমাদের সুখের হবে না। আর আমার এমন অর্থ নাই যে, তোমাকে নিয়ে বিদেশে গিয়ে থাকতে পারি! দ্বিতীয়তঃ, যা ফুরিয়ে গিয়েচে তা ফুরিয়েই যাক, এ আমার ইচ্ছাও বটে, মঙ্গলের কারণও বটে।

ললনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তবে তাই হোক। কিন্তু আমার একটি উপকার করবে?

বল, সাধ্য থাকে ত করব।

তোমার সাধ্য আছে, কিন্তু করবে কি না বলতে পারি না।

বল; সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখব।

আমার ভগিনী ছলনাকে বিবাহ কর।

সারদাচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন, তার কি পাত্র জুটচে না?

কৈ জুটচে? আমরা দরিদ্র; দরিদ্রের ঘরে কে সহজে বিবাহ করবে? শুধু তাই নয়। আমরা কুলীন; অঘরে বিবাহ দিলে হয়ত বর জুটতে পারে, কিন্তু তা হলে কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তোমরা আমাদের পালটি ঘর; তুমি বিবাহ করলে সবদিকেই রক্ষা হয়। বিবাহ করবে?

আমি পিতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন। তাঁর মত না নিয়ে কোন কথাই বলতে পরব না।

তবে মত নিয়ে বিবাহ কর।

আমি যতদূর জানি, এ বিবাহে তাঁর মত হবে না।

ললনা ম্লানভাবে কহিল, কেন মত হবে না?

তবে তোমাকে বুঝিয়ে বলি। লুকিয়ে কোন ফল নাই। আমার পিতা কিছু অর্থ-পিপাসু; তাঁর ইচ্ছা যে আমার বিবাহ দিয়ে কিছু অর্থ লাভ করেন। তোমরা অবশ্য কিছুই দিতে পারবে না, তাই বিবাহ হবে না।

ললনা কাতর হইয়া বলিল, আমরা দরিদ্র, কোথায় কি পাব? আর তোমাদের অর্থের প্রয়োজন কি? যথেষ্ট ত আছে।

সারদাচরণ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, সে-কথা আমি বুঝি, কিন্তু তিনি বুঝবেন না।

তুমি বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় বুঝবেন।

আমি একবার মাত্র বলব ; বুঝিয়ে বলতে পারব না।

ললনা নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিল, তবে কেমন করে হবে ?

আমি কি করব ?

তোমার বোধ হয় বিবাহ করতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু ছলনার মত কন্যা তুমি সহজে পাবে না। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্ম্মিষ্ঠা ; অধিকন্তু একজন দরিদ্রের যথেষ্ট উপকার করা হবে, একজন ব্রাহ্মণের জাত-কুল রক্ষা করা হবে এবং আমি চিরদিন তোমার কেনা হয়ে থাকব। বল, এ বিবাহ তুমি করবে ?

পিতা যা বলবেন তাই করব।

আজ তোমাকে সকল কথা বলি। হয়ত এ-জন্মে আর কখন বলবার অবসর পাব না, তাই বলি—তোমাকে লজ্জা কখন করি নাই, আজও করব না। সমস্ত কথা খুলে বলে যাই—তোমাকে চিরদিন ভালবেসে এসেচি, এখনো ভালবাসি। একথা পূর্ব্বে একবার বলেছিলাম, আজ বহুদিন পরে আর একবার শেষে বললাম। তুমি আমার একমাত্র অনুরোধ—বোধ হয় এই শেষ অনুরোধ—রাখলে না। যা হবার হ'ল, আর এমন কখনো হবে না। মিথ্যা তোমাকে এত ক্লেশ দিলাম, সেজন্য ক্ষমা ক'রো।

সারদাচরণ মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ললনা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিল, পিতাকে এ-বিষয়ে অনুরোধ করব।

ললনা না ফিরিয়াই বলিল, ক'রো।

কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞাধীন।

ললনা চলিতে চলিতে বলিল, তা ত শুনলাম।

যদি কিছু করতে পারি তোমাকে জানাব।

ভাল।

ললনা, আমাকে ক্ষমা করো—

করেছি।

১০

আমার নক্সা—দাও বাবা চার আনা পয়সা। 'গাড্ডিলে'র হাত হইতে চারি আনা তাম্রখণ্ড গুনিয়া লইয়া হারাণচন্দ্র কোঁচার খুঁটে জড়াইয়া রাখিলেন। যা

থাকে কপালে ধরলাম আট আনা। আট আনা পয়সা হারাণচন্দ্র সম্মুখে শতছিন্ন চাটায়ের উপর ঠুকিয়া রাখিয়া তাস হাতে লইলেন। সঙ্গীরা সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে স্ব স্ব তাস দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই হাত দুই-তিন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ফের নক্সা—দাও ত চাঁদ টাকা! 'গাড্ডিল' হারাণচন্দ্রকে টাকা দিয়া তাহার সম্মুখে তাস জোড়া নিক্ষেপ করিল। অপরাপর সকলে একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া স্ব স্ব তহবিল হাতড়াইয়া পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

আর চাই—আর চাই—আর চাই?

বস্ কর—আর না।

পনরতে চেপে যাও।

পচে যা—পচে যা বাবা—এই আমার নক্সা।

প্রায় নিশাবসানে হারাণচন্দ্র যখন স্থান পরিত্যাগ করিলেন তখন কোঁচার টিপ টাকা-পয়সায় রীতিমত ভারী। সে-রাত্রে তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। পরদিনও এ-দোকান সে-দোকান করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। বেলা চারিটার সময় যখন তিনি বাটীতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার চক্ষু অসম্ভব রক্তবর্ণ; মুখ, নাক, কাপড়, চাদর, সর্ব্বাঙ্গ হইতে গঞ্জিকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

হারাণচন্দ্র স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলে শুভদা সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, আজ বড় বেলা হয়েচে।

কি করি বল, কাজের গতিকে বেলা হয়ে যায়। তুমি এখনো কি খাওনি?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণচন্দ্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, খাও নি?

এইবার খাব।

হারাণচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এ-সব তোমার বড় অন্যায়। আমার কিছুই ঠিক নেই। যদি সমস্তদিন না আসি, তা হলে কি সমস্তদিন উপবাসী থাকবে?

দুই-এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়া হারাণচন্দ্র শুভদার পানে চাহিয়া বলিলেন, কাল সকালবেলা তুমি আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলে, না?

শুভদা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কই না।

চাওনি? আমি ভেবেছিলাম চেয়েছিলে। পরে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কাল না চেয়ে থাক, দু'দিন পরে ত চাইতেই হবে—সে একই কথা। আমার ঐ চাদরের খুঁটে গোটা-আষ্টেক টাকা বাঁধা আছে, তা থেকে গোটা-পাঁচেক্ তুমি নিও।

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সে আজ বড় বিস্মিত হইল, বহুদিন হইতে এরূপ কখন হয় নাই। বহুদিন হইল তিনি এরূপ স্বেচ্ছায় শুভদার হাতে টাকা দিতে আসেন নাই। আহারাদি শেষ হইলে শুভদা বলিল, টাকা পেলে কোথায় ?

আজ হারাণচন্দ্রের মুখ ফুটিয়া হাসি বাহির হইল। বলিলেন, ওগো, আমাদের টাকার জন্য ভাবতে হয় না। পুরুষমানুষের পেটে যদি বুদ্ধি থাকে ত তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটায় টাকা ছড়ান থাকে। বুঝেছ ?

শুভদা কি বুঝিল সে-ই জানে, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না।

উপরোক্ত ঘটনার পরে প্রায় দুইমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আজ সন্ধ্যার সময় শুভদা ললনার কাছে বসিয়া নিতান্ত মলিন হইয়া বলিল, ললনা মা, আজ কি কিছু নেই ?

কিছুই নেই মা।

কতদিন ও-কথা তুই বলেচিস, কিন্তু তার পরেই দু'আনা চার আনা বের করে দিয়েচিস্, দ্যাখ মা, যদি কিছু থাকে, না হলে আজ রাতে জলবিন্দুও কারো মুখে যাবে না।

জননীর কাতর মুখ ও অশ্রুজড়িত গদ্‌গদ্ স্বর শুনিয়া ললনা কাঁদিয়া ফেলিল—কিছুই নেই মা। তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, কিছু নেই।

তখন দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল। কন্যাকে অনেকটা অবিশ্বাস করার মত হইয়াছে বলিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু, ললনার অশ্রু অন্য কারণে বহিতে লাগিল। সে কিছু নাই বলিয়াও ইহার পূর্ব্বে দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ বাস্তবিকই কিছু দিতে পারিল না। সদানন্দ-প্রদত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রার শেষ বিন্দুটি আজ প্রাতঃকালে নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সকলে কি খাইবে, কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে, না খাইতে দিতে পারিয়া জননীর মন কেমন হইবে, প্রাতঃকালে আবার কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে, এই সব ভাবিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। বিন্দু ছিল, সে এখন নাই, সদানন্দ ছিল, সেও এখানে নাই। শুধু কি তাই ? আজ দুইদিন হইতে হারাণচন্দ্রেরও দেখা নাই। সম্ভবতঃ গুলির দোকানে, না হয় জুয়ার আড্ডায় !

এখানে একটু হারাণচন্দ্রের কথা বলি, তিনি গাঁজা টিপিতেন, গুলি খাইতেন, ছয় পয়সা চারি পয়সা কর্জ্জ করিতেন, দুই আনা চারি আনা শুভদার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া আদায় করিতেন, নিতান্ত দায়ে পড়িলে ফোঁটা কাটিয়া গামছ ছাইভস্ম মাখিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের শেষ বৃত্তি—ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, কিন্তু জুয়ার ধর্ম্ম বিশেষ অবগত ছিলেন না। এখন এইটি হইয়াছে। জুয়া-খেলার প্রথম অংশে যেরূপ হয়, অর্থাৎ দুই-চারি পয়সা পাওয়া যায়, দুই-চারি টাকা লাভ হয়—তাঁহারও

তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, অদৃষ্টও তেমনি গুটাইয়া আসিতে লাগিল। শুভদাকে সেই পাঁচ টাকা দেওয়াই তাঁহার শেষ দেওয়া হইল। তাহার পর যে একেবারে কিছুই পান নাই তাহা নহে। কখন কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আয় অপেক্ষা ব্যয় ভাগটাই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে তিনি হলুদপুরে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। এখন আবার বামুনপাড়ায় তিষ্ঠানও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথিমধ্যে যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় সে-ই কিছু না কিছুর জন্য দাবী করিয়া বসে। দুই পয়সা চারি পয়সা, দুই আনা চারি আনা, এমন প্রত্যেক পরিচিত লোকের নিকটই তাঁহার 'কাল দিব' বলিয়া কর্জ্জ করা আছে; প্রতি দোকানদারের তাঁহার নিকট চারি আনা আট আনা পাওনা আছে। এই সকল কারণে বামুনপাড়ায় তাঁহাকে সচরাচর আর দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে সন্ধ্যার সময় গুলির দোকানটা অনুসন্ধান করিলে একপার্শ্বে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে; একটু অধিক রাত্রি হইলে জুয়ার আড্ডাঘরের ঝাঁপ খুলিয়া প্রবেশ করিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অধিক রাত্রিই তাঁহার এইখানে অতিবাহিত হয়। পয়সা নাই বলিয়া নিজে খেলিতে পারেন না, কিন্তু পরের খেলায় বাজি মারিয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি পয়সা লাভ করেন। খেলিতে বসিয়া কেহ উঠিতে চাহে না, হারাণচন্দ্র সে সময়ে তামাক সাজিয়া সরবরাহ করেন, বিজেতার পক্ষ টানিয়া দুটো কথা কহিয়া, দুটো রসিকতা করিয়া, হাতে পৈতা জড়াইয়া দু'বার দুর্গানাম জপ করিয়া জয়ী পক্ষের মন রাখিয়া, মৌতাতের যোগাড়টা করিয়া লন। যেদিন কিছু অধিক আদায় হয় সেদিন নিজেই দু'হাত খেলিতে বসেন। হয় কিছু পান, না হয় লাভের অংশ পিপীলিকায় ভক্ষণ করিয়া ফেলে। দুই-চারি আনা হাতে হইলে সেদিন আর তাঁহাকে পায় কে? গুলির দোকানে আসিয়া সাবেকি চালে মুরুব্বির আসন গ্রহণ করেন, অনেককে রাজা উজির প্রভৃতি উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া শুভদার মুখখানা মনে করিতে করিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অন্ন আছেই। শুভদার জমিদারি কখন ফুরাইবে না; তাঁহার মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা শুভদা কখনও রিক্তহস্ত হইবে না। কাহারও না থাকুক, তাঁহার একমুঠা অন্ন আছেই। কিন্তু বাটী আসিবার সময় তাঁহার একটু মুস্কিল হয়; যেন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয়, বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া পা যেন আর তেমন করিয়া চলিতে চাহে না। অবশেষে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনাকে আরও একটু বিব্রত বোধ করিতে হয়। শুভদা যেরূপভাবে পা ধুইবার জল লইয়া আসে, যেরূপভাবে পা মুছাইয়া দিতে আসে, যেরূপ শুষ্কমুখে ভাতের থালাটি সম্মুখে ধরিয়া মৌন হইয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে বসিয়া থাকে, তাহাতে হারাণচন্দ্রের মনটাও কেমন কেমন করিতে থাকে, ভাতের গ্রাসগুলো

তেমন স্বচ্ছন্দে উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। বেলা পাঁচটাই হোক আর রাত্রি তিনটাই হোক—হারাণচন্দ্র দেখিতে পান শুভদা একইভাবে না খাইয়া না বিশ্রাম করিয়া তাহার ভাতের থালাটি সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে। একবার বলে না, কেন এত বেলা হইল; একবার জিজ্ঞাসা করে না, এত রাত্রি করিলে কেন? তাহার বিরস মৌন মুখখানাই তাহাকে অধিক বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। সে বুঝিতে পারে সে স্বামী হইলেও এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তির উপযুক্ত নহে, তাই এত যত্ন এত আদর সে নির্বিবাদে ভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। সে দেখিতে পায়, একজন ক্রমাগত অপরাধ করিয়া আসিতেছে, আর একজন ক্রমাগত ক্ষমা করিয়া যাইতেছে, তাই গুলিখোর গাঁজাখোর হইলেও তাহার চক্ষুলজ্জা করে। শুভদা একবার তিরস্কার করে না, একবার রাগ করে না, একবার ভাব-ভঙ্গিতেও প্রকাশ করে না যে, তুমি অমন করিও না, অমন করিলে আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না। হারাণচন্দ্রের বোধ হয়, যেন তাহার নিজের বিচার তাহাকে নিত্য নিত্য নিজেই করিতে হইতেছে। নিত্য নিত্য এমন করিয়া অবিচার করিতে যেন মাঝে মাঝে সঙ্কোচ বোধ হয়। যাই হোক, এমন করিয়াই দিন কাটিয়া আসিতেছিল।

অদ্য অনেকরাত্রে হারাণচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আজ তাহার একটু অন্যরূপ ঠেকিল। আজ শুভদা পদপ্রক্ষালনের জল লইয়া আসিল না, নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্নব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া কেহ বসিয়া নাই। এককোণে একটা প্রদীপ অতি ম্লানভাবে টিপ্‌ টিপ্‌ করিতেছে, দীপালোক উজ্জ্বল করিতে গিয়া হারাণচন্দ্র দেখিলেন তাহাতে তৈল পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার ভয় হইল; আজ দুইদিন তিনি বাটী আসেন নাই, বুঝি বা ইহার মধ্যে কিছু হইয়াছে। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া হারাণচন্দ্র নিজের মনে কি সব ভাবিতে লাগিলেন।

ভোর হইয়া আসিতেছে, তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। হারাণচন্দ্র কি ভাবিয়া চোরের ন্যায় শতছিন্ন পাদুকাটি হাতে লইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

অলক্ষিতে প্রস্থান করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। চাতালের উপর ছলনাময়ী বসিয়াছিল। অত ভোরে সে কখনও গাত্রোত্থান করে না, কিন্তু আজ কি জানি কেন, উঠিয়া বাহিরে বসিয়াছিল। তাঁকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, তুমি কখন এলে?

হারাণচন্দ্র নিতান্ত অপ্রতিভভাবে বলিলেন, কাল রাতে।

আচ্ছা বাবা, তোমার কি আক্কেল বল ত? কাল মা, পিসিমা, বড়দিদি, কেউ একবিন্দু জল পর্য্যন্ত খেতে পায়নি, আর তুমি চুপি চুপি জুতো হাতে ক'রে পালিয়ে যাচ্চ? আজ আমরা কি খাব বল ত?

হারানচন্দ্রের বোধ হইল ছলনাময়ী যেন তাহার মাথাটা কাটিয়া লইয়াছে। হাতের জুতা আপনা-আপনি খসিয়া নীচে পড়িয়া গেল; থতমত খাইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, সত্যি তাই কি?

ছলনা আরও চীৎকার করিয়া ডাকিল, ও পিসিমা, শুনচ বাবার কথা? আমি যেন মিথ্যে কথা বলচি? কাল সমস্ত রাত মা আর বড়দিদি কেঁদেচে—তুমি তা কেমন করে জানবে বল? শুধু খেতে আসা বৈ ত আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই!

হারাণচন্দ্র আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, জুতা-জোড়াটি হাতে তুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

ছলনা আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো বাবা পালিয়ে গেল।

ছলনা ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম, তাহার উপর বিষম দুর্মুখ। কাহাকে কি বলিতে হয়, কখন কি বলিতে হয়, সে কখনও শিখে নাই। ললনা এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল। পিতা চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে ছলনার সম্মুখে আসিয়া বলিল, ছলনা! তোমার একটুও কি বুদ্ধি নেই?

কেন?

কাকে কি বলতে হয় এখনো কি শেখনি? বাবাকে অমন করে কি বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয়?

ছলনা কুপিত হইয়া কহিল, আমি তাড়িয়ে দিলাম, না আপনি পালিয়ে গেল।

ছিঃ! বাপকে কি ও-কথা বলতে আছে?

কেন বলতে নেই? বাপের মত বাপ হলে তাকে কিছু বলতে নেই, কিন্তু অমন ধারা বাপকে সব বলতে আছে। কার বাপ অমন ক'রে দৌড়ে পালিয়ে যায়? কার বাপ অমন করে গাঁজা-গুলি খেয়ে বাইরে পড়ে থাকে? আমি খুব বলব—আরো বলব।

ললনা বিরক্ত হইয়া বলিল, এখান থেকে তুই চলে যা।

আমি কেন চলে যাব, তুই চলে যা। তুই আমার উপর গিন্নিপনা করতে আসিস্ নে।

হার মানিয়া ললনা মৌনমুখে সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

১১

সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, শুভদা রাসমণির কাছে এটা কাংস্যপাত্র রাখিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, বেলা অনেক হ'ল; আজ তিনি বোধ হয় আর আসবেন না। এই ঘটিটা বাঁধা দিয়ে দেখ না যদি কিছু পাওয়া যায়।

রাসমণি শুভদার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বড় লজ্জা করে বৌ।

ললনা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, মা, আমি একবার দেখে আসি।

শুভদা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কোথায়?

ললনা মৃদু হাসিয়া একবার পিসিমাতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, এই ঘোষেদের দোকানে।

তুই যাবি মা!

কেন, তাতে আর লজ্জা কি? আমি এখানকার মেয়ে; ছেলেবেলা থেকে আমাকে সবাই দেখচে, আমার আর লজ্জা কি? সুসময় অসময় কার ঘরে নেই মা?

ললনা চলিয়া যায় দেখিয়া রাসমণি তাহার হস্ত হইতে ঘটিটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, তবে আমিই যাই।

সেদিন বেলা তিনটার পরে সকলের আহার হইল। সকলে তৃপ্ত হইলে শুভদা ললনাকে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ললনা লুকিয়ে দুটো সজনে শাক ছিঁড়ে আন না মা?

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিল, এত বেলায় কি হবে বল?

আমার দরকার আছে?

কি দরকার মা?

শুভদা অল্প হাসিয়া বলিল, তোর শুনে কি হবে?

কথার ভাবে ললনা যেন কতক বুঝিতে পারিল, বলিল, হাঁড়িতে বুঝি ভাত নাই?

ভাত কেন থাকবে না?

তবে কেন?

গৃহস্থ-ঘর; দুটো সিদ্ধ করে রাখতে দোষ কি?

ললনা কাতর হইয়া বলিল, সত্যি কথা বল না মা, কি হয়েছে?

কি আর হবে?

তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লুকিয়ো না, মা। ললনা পায়ে হাত দিতে যাইতেছিল, জননী তাহা ধরিয়া ফেলিল। আরো একটু নিকটে আসিয়া তাহার কপালের উপর চুলগুলি কানের পাশে গুঁজিয়া দিতে দিতে প্রসন্ন-মুখে বলিল, একজনের বেশি ভাত নেই; তিনি যদি আসেন, তাই—

তাই বুঝি তুমি শুধু সজনে পাতা চিবিয়ে থাকবে?

শুভদা পূর্ব্বের মত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সজ্‌নে পাতা কি অখাদ্য?

অখাদ্য নয় বলে কি শুধু খায়?

তা হোক। তখন তুই ত বললি ললনা, সুসময় অসময় কার ঘরে নেই! তাই অসময়ে সুসময়ের কথা মনে রাখতে নেই। আবার যখন ভগবান মাপবেন, তখন আবার সব হবে। তখন—এবার শুভদার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

ললনা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জননীর পদপ্রান্তে একরাশি সজিনার পাতা ফেলিয়া দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। একজন ভিক্ষুক অনেকক্ষণ ধরিয়া বামুন-পাড়ার একটি ক্ষুদ্র মুদির দোকানের একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দোকানটি ক্ষুদ্র। দুই-এক পয়সার খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কেহ বড় একটা এ-স্থানে আসে না। কত লোক আসিতেছে; এক পয়সার তৈল কিনিতেছে, দুই পয়সার ডাল কিনিতেছে, সিকি পয়সার লবণ কিনিতেছে, তারপর চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ভিক্ষুক কিন্তু কোন কথাই কহে না; ক্রয়-বিক্রয় দেখিতেছে ও দাঁড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে দোকানদারের চক্ষু সেদিকে পড়িল; তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তুমি কি নেবে গা?

ভিক্ষুক মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না।

দোকানদার বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে মিছে এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়িও না।

এইসময় একজন খরিদ্দার বলিয়া উঠিল, ও বুঝি ভিক্ষে করতে এসেছে!

দোকানদার অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যাও যাও, এখানে কিছু মিলবে না। সন্ধ্যার সময় আবার ভিক্ষে কি?

লোকটা চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঠিক পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইল। দোকানদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আবার এলে যে?

চাল কিনবে?

কি চাল? কত ক'রে?

মোটা চাল।

কৈ দেখি?

লোকটা একটা ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া বলিল, এই দেখ।

দোকানদার দ্রব্য দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল—এ যে ভিক্ষে-করা চাল। ক'টা পয়সা নিবি।

চাউল-বিক্রেতা দোকানদারের মুখপানে চাহিয়া বলিল, দু'আনা।

ইস্—চারটে পয়সা দাম হয় না, তা আবার দু'আনা? আমি নিতে চাইনে।

লোকটাকে বোধ হয় চিনাইয়া দিতে হইবে না; ইনি আমাদের হারাণচন্দ্র!

হারাণচন্দ্র নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দোকানদারের বাপান্ত করিতে করিতে পুঁটুলি খুলিয়া মুঠা মুঠা চাল চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। এত চাল কি চার পয়সায় দেওয়া যায়? সমস্ত দিনের মেহনতের দাম কি চার পয়সা? আড্ডা-ধারীর কাছে নিয়ে যাই ত চারদিনের মৌতাত যোগায়, কিন্তু সেখানে কি যাওয়া যায়? ছিঃ—ব্যাটারা ভিক্ষে-করা চাল চিনে ফেলবে। তা হলে? ছি-ছি-ছি—বাড়ি নিয়ে যাব? কিন্তু এ ক'টি চাল কার মুখে দেব? কাজ নেই।

হারাণচন্দ্র পুঁটুলিটি গুছাইয়া বাঁধিয়া আবার সেই দোকানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দোকানদারকে ডাকিয়া বলিলেন, চাল নাও।

চার পয়সায় দিবি ত?

হাঁ।

তবে ঐ ধামাতে ঢেলে দে।

হারাণচন্দ্র একটা পাত্রে চালগুলি ঢালিয়া দিয়া হাত পাতিলেন। দোকানদারের নিকট চারিটা পয়সা গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূর আসিয়া হারাণচন্দ্র একচোট খুব হাসিয়া লইলেন। কেমন ব্যাটাকে ঠকিয়েছি, হারামজাদার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল দিয়েছি। অর্দ্ধেক চাল খেয়ে ফেলেছি। ব্যাটা ধরতেও পারেনি। দোকানদার যে ধরিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই হারাণচন্দ্র তাহা একবারও মনে করিলেন না। মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে গুলিখানার ঝাঁপ খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আর কাজ নাই; আমরা অন্যত্র যাই।

১২

আর ত পারি না মা!

তিন দিন উপবাস করিয়া শুভদা কন্যা ললনার গলা ধরিয়া রুদ্ধাবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

ললনা সযত্নে মাতৃ-অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বলিল, কেন মা অমন কর, এদিন কিছু চিরকাল থাকবে না—আবার সুদিন হবে।

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়, কিন্তু আর ত সয় না। চোখের উপর তোদের এত দুর্দ্দশা মা হয়ে আর দেখতে পারিনে। আমি মা গঙ্গার কোলে ডুব দিই, তুই মা যেমন করে পারিস্ এদের দেখিস্। দোরে দোরে ভিক্ষে করিস —উঃ—মা হয়ে আর পারিনে।

শুভদা যেরূপভাবে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, যেরূপভাবে কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিল, তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। সে আজ অনেকদিনের পর আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে; অনেক সহ্য করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছে, তাই আজ তাহাকে সামলাইতে পারা যাইতেছে না। যে, কখনও ক্রোধ করে না, সে ক্রোধ করিলে বড় বিষম হয়; যে বড় শান্ত তাহাতে ঝড় উঠিলে বড় প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠে; তাই ললনা বড় বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। কোনরূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, এমন করিলে সে আর বরদাস্ত করিতে পারিবে না। বুকখানা যদি ফাটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

গভীর রাত্রে মাতাপুত্রী সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শুভদার স্বামীর জন্য বড় ভয় হইয়াছে। আজ ছয়দিন হইল তিনি বাটী আসেন নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি অপমানে ও লাঞ্ছনার ভয়ে তিনি আত্মঘাতী হইয়াছেন। অপদার্থ বলিয়া কন্যা হইয়াও ছলনা সেদিন যেরূপ অপমানিত করিয়াছিল, যেরূপ গঞ্জনা দিয়াছিল, তাহাতে আত্মঘাতী হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। সেই কথাই অষ্টপ্রহর মনে হইতেছে। আজও নিশাশেষে শুভদা চমকাইয়া উঠিয়া বসিল; ললনাকে তুলিয়া বলিল, ওরে তিনি নাই।

ললনা ঘুমের ঘোরে ভাল বুঝিতে পারিল না, তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কে মা?

আমি স্বপন দেখছিলাম যে তিনি আর নাই।

কেন মা অমন কর? কথা শেষ করিয়াই ললনা কাঁদিয়া ফেলিল। যতটুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল তাহা দু'জনে কাঁদিয়াই শেষ করিল।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে কৃষ্ণঠাকুরাণী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময়-পথিপার্শ্বে মুখুয্যে-বাটীতে একবার প্রবেশ করিয়া অঙ্গন হইতে ডাকিলেন, বৌ!

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কি ঠাকুরঝি? ব'স।

আর বসব না দিদি - বেলা হ'ল। নেয়ে যাবার সময় একবার মনে করলাম, বৌকে দেখে যাই।

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

কৃষ্ণঠাকুরাণী গলাটা একটু খাট করিয়া বলিলেন, বৌ একবার শুনে যাও ত।

শুভদা নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, হারাণের কোন খবর পেলি?

শুভদা বলিল, না।

আজ কতদিন সে বাড়ি আসেনি?

ছ'দিন হল।

ছ'দিন আসেনি? বামুনপাড়ায় কারুকে পাঠাস্‌নি কেন?

কাকে পাঠাব? কে যাবে?

তাও বটে, আমাকে বলিস্‌নি কেন?

শুভদা উত্তর দিল না।

জলের কলসীটা নামিয়া আসিতেছিল; সেটাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, হাতে কিছু টাকাকড়ি আছে কি?

কিছু না।

তবে সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেটা কেমন আছে?

সেই রকমই।

এখন ললনাকে একবার আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিস্‌।

তিনি প্রস্থান করিলে শুভদা ললনাকে ডাকিয়া বলিল, কেষ্ট ঠাকুরঝি তোকে একবার ডেকে গেছেন, একবার যা।

কেন?

তা জানিনে।

ললনা কৃষ্ণপ্রিয়ার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মাতার হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিল, পিসিমা দিলেন।

শুভদা মুদ্রা দুইটি অঞ্চলে বাঁধিয়া বলিল, আর কিছু বললেন কি?

হাঁ, বাবা এলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

শুভদা সেদিন ঠাকুরের উদ্দেশে অনেক প্রণাম করিল, পূজার কক্ষস্থিত কালীপটের প্রতি বহুক্ষণাবধি যুক্ত-করে চাহিয়া রহিল, তুলসীতলায় অনেক মাথা খুঁড়িল, তাহার পর জিনিসপত্র আনাইতে দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল।

সেদিন যথাসময়ে মনোমত আহার পাইয়া ছলনাময়ী মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে পুতুলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে ও-পাড়ায় ললিতার নিকট প্রস্থান করিল।

* * * *

রাত্রে একটু আঁধার হইলে, অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া আজ সমস্তদিনের পর হারাণ-চন্দ্র বাটী প্রবেশ করিলেন। ছয় দিবস পূর্ব্বে তিনি যেমন ছিলেন, আজো তেমনি আছেন, কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুধু বস্ত্রখানার। বর্ণটা অঙ্গার অপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং গুনিয়া দেখিলে বোধ হয় শতাধিক স্থানে গাঁইট বাঁধা দেখিতে পাওয়া যাইত। যথাসময়ে তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া শুভদা কন্যা ললনাকে ডাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা, রোজ যেন তোর মুখ দেখে উঠি—

ললনাও একটু হাসিল—কেন মা?

আজ যে সুখ পেলাম, জন্মেও এমন পাইনি।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনা কৃষ্ণপিসিমাকে যাইয়া বলিল, কাল রাতে বাবা এসেছেন।

কৃষ্ণার মুখ প্রফুল্ল হইল; যেন বড় একটা দুর্ভাবনা তিরোহিত হইল। স্মিতমুখে বলিলেন, এসেচে? ভাল আছে?

হাঁ।

এতদিন কোথায় ছিল?

তা জানিনে।

বৌ জিজ্ঞাসা করেনি?

না।

তোর পিসিমা কিছু বলেনি?

না। তিনি ত বাবার সঙ্গে কথা কন না।

কথা কন না? কেন?

তা জানিনে। পিসিমাই জানেন।

বেলা এগারটার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কলাপাতা-চাপা একটা পাথরের বাটি হাতে করিয়া শুভদার নিকট আসিয়া বলিলেন, বৌ, একটু তরকারি এনেচি, হারাণকে দিস্।

শুভদা বাটীটা হাতে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘর উদ্দেশ করিয়া বলিল, ঐ ঘরে আছেন।

কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হোক, এখন আর যাব না, ঘরে সমস্ত জিনিস আতুড় পড়ে আছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধ উঠান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুভদাকে বলিলেন, বৌ, হারাণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবি?

কি?

এতদিন সে কোথায় ছিল?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

খাওয়াইতে বসাইয়া শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন কোথায় ছিলে?

হারাণচন্দ্র মলিন-মুখে অধোবদন হইয়া বলিলেন, গাছতলায়।

শুভদা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পরদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণপ্রিয়া আবার আসিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর বলিলেন, বৌ, সে-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি?

হাঁ।

কি বললে ?

বললেন যে, গাছতলায় ছিলাম।

আবার অন্যান্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল। উঠিবার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কাপড়ের নীচে হইতে দু'খানা থান কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন, ঘরে ছিল তাই নিয়ে এলাম। হারাণকে পরতে দিস্।

শুভদা তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখ্ বৌ, হারাণ যদি জিজ্ঞাসা করে, কে দিয়েচে, তা হলে আর কারো নাম করিস! আমার নাম করিস্নে।

শুভদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন ?

কৃষ্ণপ্রিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না অমনি।

আর যদি নাম করি ?

এবার কৃষ্ণপ্রিয়াও সহাস্যে বলিলেন, তা হলে তোর কেষ্টঠাকুরঝির মাথা খাবি।

আবার একদিন-দুইদিন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। হারাণচন্দ্র এবার আসিয়া অবধি আর বাটীর বাহির হন না। শুভদার সে-পক্ষে কিছু ভয় দূর হইয়াছে; কিছু দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে, কিন্তু সংসার চলে কিরূপে ? দুর্ভাবনার মূল হইয়াছে এইখানেই। কে একদিন এক টাকা দান করিল, কে আর একদিন দুই টাকা ভিক্ষা দিল, এমন করিয়া কি এমন পরিবার প্রতিপালিত হয়। ভাবনার কথা কি শুধু ইহাই। মাধবের মুখ দেখিলে ত শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত জল হইয়া যায়; তাহার উপর ছলনা। সে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; বিবাহের সময় হইয়াছে, এমন কি দুই-চারি মাসের মধ্যে হয়ত সে বয়স উত্তীর্ণ হইয়াও যাইতে পারে। এদিকে চাহিলে শুভদা আর কূল-কিনারা দেখিতে পায় না। মাধবের নিকট পার আছে, কিন্তু বাঙালীর ঘরে ছলনার নিকট পার নাই। তার মুখ দেখিলে রক্ত জল হইয়া যায়, কিন্তু ইহার মুখ দেখিলে শরীরের অস্থিপঞ্জর পর্য্যন্ত তরল হইয়া পড়িবার উপক্রম করে। দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় শুভদা যে প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা আর কেহ না দেখিতে পাইলেও ললনা দেখিতে পাইত। গঙ্গার ঘাট হইতে এক কলসী জল আনিতে জননী যে হাঁপাইতে থাকে, ললনা তাহা দেখিতে পাইত; তরকারি কুটিবার সময় আলু-পটলের খোসা ছাড়াইতে গিয়া হাত আটকাইয়া বাধিয়া যায়, ললনা তাহা জানিতে পারিত; গ্রামে শুভদার মত কেহ সুপারি কাটিতে পারিত না, সেই শুভদার সুপারি-কাটা আজকাল সরু মোটা হইয়া যায়,

ললনা তাহা বুঝিতে পারিত; আহার কমিয়া গিয়াছে, দুইবেলার পরিবর্ত্তে আজকাল বেলা চারিটার সময় এক বারে দাঁড়াইয়াছে; পীড়াপীড়ি করিলে বলে, আদতে ক্ষুধা নাই। ললনা এসব দেখিত আর লুকাইয়া চক্ষু মুছিত; কখনও কখনও ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিত। ইহাতে ফল হইবার হইলে হইতে পারিত, কিন্তু জগতে তাহা হয় না।

১৩

আজ একাদশী। ললনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, জননী রন্ধন করিতেছেন। চুলার ভিতর দেখিল কি একটা পদার্থ দগ্ধ হইতেছে। চিনিতে না পারিয়া বলিল, ওটা কি মা। কি পোড়াচ্চ।

চারটি সরষে ফুল।

কি হবে?

ছলনা খাবে। আজ নেয়ে আসবার সময় ক্ষেত থেকে তুলে এনেছিল। ভেজে দিতে বলেছিল; কিন্তু তেল ত নেই, তাই কলাপাত জড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছি।

ললনা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

আহারের সময় সাধের সরিষার ফুলের আকৃতি দেখিয়া ছলনাময়ী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল. এই বুঝি ভাজা হয়েছে? এ ছাই হয়েছে।

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, একটু পুড়ে গেছে।

আমি খেতে চাইনে; তুমি পোড়া জিনিস ভালবাস, তাই নিজের মনের মত করে পুড়িয়ে রেখেচ! তা তুমিই খেয়ো—এই রইল। ছলনা মুখখানা তেলো হাঁড়ির মত করিয়া পাতের নীচে নামাইয়া রাখিল।

ছলনা যাহা বলিল তাহা নিজের বিশ্বাস-মত বলিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার মনোমত কোন দ্রব্য না হইলে কর্কশ কথা বলিতে তাহার মত কেহই পারে না।

অনেক গজ্‌ গজ্‌ করিয়া ছলনা আহার করিয়া চলিয়া যাইলে ললনা বলিল, মা, দিন দিন ছলনা মন্দ হয়ে যাচ্চে; ওকে কিছু বল না কেন? আমার ত ওকে কোন কথা বলতে সাহস হয় না। একটা বললে দশটা শুনিয়ে দেয়।

শুভদা একটু ভাবিয়া বলিল, সব মেয়ে কি তোর মত হয় মা। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল পাঁচ রকমের হয়। আমি খাওয়াতে পারিনে, পরাতে পারিনে, কাজেই রাগ করে দুটো কথা বললে সয়ে যেতে হয়।

কিন্তু একি ভাল ?

ভাল নয় তা জানি ; কিন্তু কি করব ? আমার সময় ভাল হলে ছলনাও বলত না, আমাকেও শুনতে হ'ত না।

ললনাও বুঝিল জননীর কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে !

পরদিন প্রায় এই সময়েই সে অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে জননীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

শুভদা মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি হল ?

ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণপিসিমা বললেন, আর কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই ! তোমার বাবাকে কিছু উপায় করতে বল, না হলে আমি দুঃখী মানুষ আর টাকা-কড়ি কিছু দিতে পারব না।

সকল কাজ-কর্ম্ম সেদিনের মত সম্পন্ন হইলে ললনা মাধবের নিকট আসিয়া বসিল।

মাধব বলিল, দিদি, তার কি হ'ল ?

কার কি মাধু ?

মাধু থামিয়া বলিল, সেখানে যাবার ?

ললনাও অল্প থামিল, অল্প চিন্তা করিল তাহার পর বলিল, সেই কথাই আজ তোকে বলব মাধু।

মাধব সাগ্রহে একেবারে উঠিয়া বসিল—কি দিদি ? কবে যাওয়া হবে ?

আমি কাল যাব।

কাল যাবে ? আর আমি ?

আমি আগে যাই, তার পরে যেয়ো।

মাধব ব্যস্তসহ বলিল, কেন, একসঙ্গেই যাই চল না !

ললনা বলিল, না, তা হলে মা বড় কাঁদবে।

মাধব ক্ষুণ্ণ হইল—কাঁদুক্ গে।

ছিঃ, তা কি হয় ? আমি যাই।

আবার কবে আসবে ?

তুমি যেদিন যাবে, সেইদিন আর একবার আসব।

তার মধ্যে আর আসবে না ?

না।

আমি কবে যাব ?

আমি যেদিন নিতে আসব।

আসবে ?

হাঁ।

তুমি গেলে মা কাঁদবেন ?

বোধ হয়।

মাধব কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, দিদি, তবে কাজ নেই।

কেন ভাই ?

মা কাঁদবে মনে হলে আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে হয় না।

তবে তুই যাবিনে ?

মাধব আবার কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, হ্যাঁ যাব।

তবে আমি কাল যাব ?

যেয়ো।

আমাকে না দেখতে পেলে কাঁদবিনে ?

কবে আমাকে নিতে আসবে ?

আর কিছুদিন পরে।

তবে যাও, আমি কাঁদব না।

মাধবের অলক্ষিতে ললনা দুই-এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আমি গেলে এ-সব কথা মাকে বলো না।

না।

মা যখন যা বলবেন, তাই শুনো—কিছুতে যেন মার মনে কষ্ট না হয়। ঠিক সময়ে ওষুধ খেয়ো।

খাব।

কিছুক্ষণ থামিয়া ললনা আবার বলিল, মাধু, সদাদাদাকে তোমার মনে আছে ?

আছে।

তিনি যদি আসেন—যদি তোমাকে দেখতে আসেন—তা হলে ব'লো যে দিদি চলে গেছে। কেউ যখন না থাকবে তখন ব'লো।

আচ্ছা।

এইসময় শুভদা আসিয়া বলিলেন, অনেক রাত হয়েচে, তুই শুগে যা মা।

মাধব সে-কথার উত্তরে বলিল, মা, দিদি আজ আমার কাছে শোবে।

দিদিকে ছাড়িতে মাধবের তখন কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না। শুভদা বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া ললনাকে বলিলেন, তবে তাই শোও—আমি ওপরে ছলনার কাছে শুই গে।

শুভদা চলিয়া গেলেও ভ্রাতা-ভগিনীর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল; তাহার পর মাধবচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সকালবেলায় সে যে-সকল গৃহকর্ম্ম করে তাহা এখন পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে। বেলা আট-নয়টা বাজে দেখিয়া শুভদা মাধবকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর দিদি কোথায়? ছলনাকে বলিলেন, তোর দিদি কোথায় গেল?

সবাই বলিল, বলতে পারি না।

বেলা অধিক হয় দেখিয়া শুভদা সমস্ত কর্ম্ম নিজেই করিতে লাগিলেন, ছলনাও সেদিন অনেক সাহায্য করিল। আহার্য্য প্রস্তুত হইল, সকলে আহার করিল—দ্বিপ্রহরও অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ললনার দেখা নাই।

রাসমণি খুঁজিতে গেলেন, ছলনাময়ী আহার করিয়া পাড়া বেড়াইতে গেল, সেখানে যদি ললনা থাকে ত পাঠাইয়া দিবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাসমণি আসিয়া বলিলেন, কোথাও ত তাকে পেলাম না—বাড়ি এসেচে কি?

কই না।

সন্ধ্যার পর ছলনাও ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি এ গাঁয়ে নাই।

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু ললনা আসিল না।

হারাণচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া অবধি বাটীর বাহির হন নাই; তিনিও, তাই ত মেয়েটা গেল কোথায়, বলিয়া একবার খুঁজিতে বাহির হইলেন। রাত্রি বারোটার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাই ত, তাই ত—কিছুই যে বোঝা যায় না।

সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিল; রাসমণি কাঁদিতে লাগিলেন, ছলনা কাঁদিল, শুধু মাধবচন্দ্র বড় একটা কিছু বলিল না। সকলের ব্যস্ততা এবং ক্রন্দনাদি দেখিয়া সে একবার কথাটা ভাঙ্গিতে গিয়াছিল, কিন্তু দিদির নিষেধ মনে করিয়া জননীর অশ্রু দেখিয়াও মৌন হইয়া রহিল।

পরদিন আসিল। সূর্য্য উঠিল, অস্ত গেল—রাত্রি হইল। আবার প্রভাত হইল, সূর্য্য উঠিল, অস্ত গেল, কিন্তু ললনা আসিল না। গ্রামের সকলেই একথা শুনিল। ললনাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাই তাহার জন্য সকলেই দুঃখিত হইল। কেহ কাঁদিল, কেহ শুভদাকে বুঝাইতে আসিল, কেহ পাঁচরকম অনুমান করিতে লাগিল, এইরূপে চার-পাঁচদিন অতিবাহিত হইল।

শুভদা প্রথমে মাধবচন্দ্রের সম্মুখেও ললনার জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার কথা মনে হইল তখন সমস্ত অশ্রু প্রতিষেধ করিল। জননীর অধিক ক্লেশ

দেখিলে বোধ হয় সে ভিতরের কথা বলিয়া ফেলিত, কিন্তু যখন দেখিল সব থামিয়া গিয়াছে তখন আর কোন কথা কহিল না।

কিন্তু শুভদা বড় বিস্মিত হইল। বড়দিদির কথা মাধব কেন জিজ্ঞাসা করে না? একবার বলে না, দিদি কোথায়? একবারও জিজ্ঞাসা করে না, বড়দিদি আসে না কেন? শুভদার অল্প সন্দেহ হইল—মাধব বোধ হয় কিছু জানে; কিন্তু সাহস করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

আজ ছয় দিবস পরে নন্দ জেলেনী গঙ্গায় মৎস্য ধরিতে ধরিতে, আঘাটায় একটা চমড়া লাল-পেড়ে কাপড় অর্দ্ধ জলে অর্দ্ধ স্থলে বালুমাখা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। হারাণবাবুর বাটীর নিকটেই তাহার বাটী; সে ললনাকে ঐ কাপড় অনেক-দিন পরিতে দেখিয়াছিল। তাহার সন্দেহ হইল বোধ হয় ঐ বস্ত্র ললনার হইতে পারে। সে আসিয়া এ-কথা রাসমণিকে জানাইল। তিনি ছুটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, চিনিতে বিলম্ব হইল না—তাহা ললনারই বটে। কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানা বাটীতে তুলিয়া আনিলেন; শুভদা দেখিল, হারাণচন্দ্র দেখিলেন, ছলনা দেখিল, পাড়ার আরো পাঁচজন দেখিল—ঠিক তাহাই বটে। সে কাপড় ললনারই। তাহার হাতের সেলাই করা, তাহার হাতের তালি দেওয়া, তাহার হাতের এক কোণে লাল সুতা দিয়া নাম লেখা। আর কি ভুল হয়? শুভদা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল। মুখুয্যেদের ললনা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একদিন মনে হইল তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে, বায়ু-পরিবর্ত্তন না করিলে হয়ত কঠিন পীড়া জন্মাইতে পারে। সুরেন্দ্রবাবুর অনেক আয়। বয়স অধিক নহে; বোধ হয় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না; এই বয়সে অনেক সখ, তাই পাত্রমিত্রের অভাব নাই। দুই-চারিজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে—তোমরা কি বল? সকলেই তখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। তাহার অনেক দিন হইতে একথা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাঁহার ক্লেশ বোধ হয় এই জন্যই সাহস করিয়া বলে নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না, আমার বিশ্বাস বায়ু-পরিবর্ত্তন করিলেই সব আরোগ্য হইয়া যাইবে।

ইহাতেও কাহারো সন্দেহ ছিল না। বায়ু-পরিবর্ত্তনের মত ঔষধ আর নাই বলিলেও চলে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তোমরা বলতে পার কোন স্থানের বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম?

তখন অনেকে অনেক স্থানের নাম করিল।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি বলি কিছুদিন জলের উপর বাস করলে হয় না?

সকলে বলিল, ইহা অতি চমৎকার।

তখন জলযাত্রার ধুম পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড একখানা বজরা নানারূপে সজ্জিত হইতে লাগিল। দুই-তিনমাসের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে সমস্ত বোঝাই হইল। তাহার পর দিন দেখিয়া পাঁজি খুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু নৌকায় উঠিলেন। সঙ্গে ইয়ারবন্ধু, গায়ক-বাদক অনেক চলিল; তন্মধ্যে একজন গায়িকারও স্থান হইল। মাঝিরা পাল তুলিল 'বদর' বলিয়া রূপনারায়ণ নদে বজরা ভাসাইয়া দিল।

অনুকূল বাতাসে পাল-ভরে বৃহৎ বজরা রাজহংসীর ন্যায় ভাসিয়া চলিল। স্থানে স্থানে নোঙ্গর করা হইতে লাগিল; সুরেন্দ্রবাবু সদলবলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে জলে স্থলে অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল, অনেকদিন কাটিয়া গেল; তাহার পর বজরা কলিকাতায় আসিয়া লাগিল। অপরাপর সকলের ইচ্ছা ছিল এই স্থানে যেন অধিকদিন থাকা হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু তাহাতে অমত করিয়া বলিলেন, কলকাতার বায়ু অপেক্ষাকৃত দূষিত, এখানে থাকব না। বজরা উত্তর-মুখে চলিল।

বজরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল তখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা মনে করিতে লাগিল যে, অনেকদিন বজরায় বাস করা হইয়াছে, বহুত জলকণা সম্পৃক্ত স্নিগ্ধ বায়ু

সেবন করিয়া শরীরে আরাম এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা সাধন করা হইয়াছে, এখন বাটী ফিরিয়া গিয়া স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মুখ দেখিতে পারিলে শরীরের কান্তিটা সম্ভবতঃ আরো একটু বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। এই হিসাবে আর অধিক দূর যাইতে অনেকেই মনে মনে অনিচ্ছুক হইল; আর দুই-একদিন পরে মুখ ফুটিয়া দুই-এক জন বলিয়া ফেলিল, অনেকদিন দেশ ছেড়ে আসা হয়েছে—আপনার শরীরও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে —এখন ফিরলে হানি কি!

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হানি কিছুই নাই, কিন্তু এখন ফিরব না, তোমাদের যদি বাড়ির জন্য মন খারাপ হয়ে থাকে ত তোমরা যাও।

সামান্য বাড়ির জন্য, তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্রের জন্য মন খারাপ হইয়া যাওয়া কাপুরুষতা মনে করিয়া, যাহারা কথা পাড়িয়াছিল তাহারা চুপ করিয়া গেল! সুরেন্দ্রবাবু আর অন্য কথা বলিলেন না।

বজরা থামিয়া থামিয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল; ভিতরে কিন্তু আর পূর্ব্বের মত সুখ নাই। সুরেন্দ্রবাবু ভিন্ন অনেকেই প্রায় বিষণ্নতায় সময়াতিবাহিত করিতে লাগিল। তখন দুই দিবস পূর্ব্বে কাপুরুষতা মনে করিয়া যাহারা কথা পাড়িয়াও চাপিয়া গিয়াছিল, তাহারা পৌরুষের গর্ব্ব ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই কথা পাড়িবার অবসর খুঁজিতে লাগিল। প্রবাসে থাকিয়া বাটী যাইবার কথা—স্ত্রী পুত্রের মুখ মনে পড়িয়া সেইখানে ফিরিয়া যাইবার একবার বাসনা হইলে তাহা আর কিছুতেই দমন করিয়া রাখা যায় না। একদিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই মনে হয় যেন এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদেরও তাহাই হইল। অ র তিন-চার দিনে প্রায় সকলেই লজ্জার মাথা খাইয়া বাটী ফিরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু আপত্তি করিলেন না; তখন বজরা চন্দননগর অতিক্রম না করিতেই প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। ভৃত্যবর্গ ভিন্ন বজরা প্রায় শূন্য হইয়া গেল। বাহিরের লোকের মধ্যে কেবল একজন পশ্চিমাঞ্চল-নিবাসী বাদক ও একজন অনুগৃহীতা নর্ত্তকী রহিল। বাবু তাহাদের লইয়াই চলিলেন—দেশে ফিরিবার কথা একবারও মনে করিলেন না।

একদিন বৈকালে সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই পশ্চিমদিকে মেঘ করিয়া আসিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবু একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিলেন, হরিচরণ, মেঘ করে আসচে দেখচ।

আজ্ঞে হাঁ।

ঝড় হবে বলে বোধ হয় কি?

বোশেখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড় হাওয়া আশ্চর্য্যি কি বাবু ?

তবে বজরা বাঁধ।

এখানে কিন্তু গাঁ আছে বলে মনে হচ্চে না ; আঘাটায় লাগাব কি ?

লাগাবে না ত কি ডুবে মরব ?

মাঝি একটু হাসিয়া বলিল, আমি থাকতে সে ভয় নেই বাবু। ঝড় আসবার আগেই নোঙ্গর করব।

সুরেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অত সাহস ক'রে কাজ নেই—তুমি কাছি ধর।

অগত্যা হরিচরণ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইয়া বজরা বাঁধিয়া ফেলিল।

সুরেন্দ্রবাবু বজরার ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বাবু গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, একবার ওস্তাদজীকে ডেকে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানী, মাথায় একহস্ত উচ্চ পাগড়ি বাঁধিয়া দাড়িটা কর্ণমূলে জড়াইয়া, গোঁফ মুচড়াইতে মুচড়াইতে আসিয়া বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু পরপারে তীরের অনতিদূরে জলের উপর কালো মত কি একটা পদার্থ ভাসিয়া আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। পদার্থ-টা একটা মনুষ্য-মস্তক বলিয়া বোধ হইতেছিল—তাহাই মনোযোগ করিয়া দেখিতেছিলেন। ওস্তাদজীর শব্দ প্রথমে কর্ণে প্রবেশ করিল না।

ওস্তাদজী উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু ফিরিয়া চাহিলেন। ওস্তাদজীকে দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, এখন বোধ হয় ঝড় আসবে না ; একটু গীতবাদ্য হোক।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, যো হুকুম।

সুরেন্দ্রবাবু আবার সেই পদার্থ টা দেখিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই একজন যুবতী আসিয়া নিকটে একখানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। পশ্চাতে ওস্তাদজী বাঁয়া-তবলা হাতে করিয়া ছাদের উপর উঠিতেছিল ; সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, তুমি নীচে যাও—বাজনায় আর কাজ নেই, আজ শুধু গান হোক।

ওস্তাদজী একটু গূঢ় হাস্য করিয়া নামিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বেই যে স্ত্রীলোকটি গালিচার উপর আসিয়া বসিয়াছিল তাহার নাম জয়াবতী ; বয়সে বোধ হয় বিংশতি হইবে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল শরীর—দেখিতে মন্দ নহে ; বহুদিবস হইতে সুরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। বাঙালীর ঘরের মেয়ে, সাজসজ্জার আড়ম্বর বেশী কিছু ছিল না। একখানা দেশী কালোপেড়ে শাড়ি

ও দুই-একখানা গহনা পরিয়া শিষ্ট-শান্ত ঘরের বধূটির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, জয়া, আজ যে তোমাকে সমস্ত দিন দেখি নাই?

মাথার বেদনায় সমস্ত দিন শুয়েছিলাম।

এখন ভাল হয়েছে কি?

জয়াবতী অল্প হাসিয়া বলিল, অল্প।

গান গাইতে পারবে কি?

জয়াবতী আবার হাসিল—হুকুম করুন।

হুকুম আর কি, যা ইচ্ছে হয় গাও।

জয়াবতী গীত গাহিতে আরম্ভ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু পরপারস্থিত ভাসমান কৃষ্ণ পদার্থটার পানে চক্ষু রাখিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে কিছুক্ষণ পরে, জয়াবতীর গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, জয়া, ওটা নড়ে বেড়াচ্ছে না?

জয়াবতী গান ছাড়িয়া সেটা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, বোধ হয়।

তবে আমার দূরবীণটা। ডাকিয়া বলিলেন, ওরে নীচে থেকে আমার দূরবীণের বাক্সটা নিয়ে আয় ত।

দূরবীণ আসিল, বাক্স খুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সেই পদার্থটা দেখিয়া দূরবীণ-বাক্স বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

জয়াবতী জিজ্ঞাসা করিল, কি ওটা?

একজন মানুষ বলে বোধ হয়।

এতক্ষণ ধরে জলে কি করছে?

তা জানি নে। দেখলে হয়।

একজন লোক পাঠিয়ে দিন।

আমি নিজেই যাব। অনুজ্ঞা মত একজন মাঝি অল্পক্ষণ পরে বজরা-সংলগ্ন বোট লইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ও-পারে চল।

বোট কাছে আসিলে সুরেন্দ্রবাবু দেখিলেন, পদ্মের মত অনিন্দ্যসুন্দর একজন স্ত্রীলোক গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, কাল মেঘের মত একরাশি চুল নীল জলের উপর চতুর্দ্দিকে ভাসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন্দ্রবাবু আরও নিকটে আসিলেন, তথাপি, স্ত্রীলোকটি উঠিল না বা উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না, যেমন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, নিকটে কোন গ্রাম আছে কি?

স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি বলতে পারি না। বোধ হয় নাই।

তবে তুমি এখানে কোথা হ'তে এলে ?

স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া রহিল।

তোমার বাড়ি কি নিকটেই ?

না, অনেক দূর।

তবে এখানে কেন ?

আমাদের নৌকা ডুবে গিয়েছিল।

কবে ?

কাল রাত্রে।

তোমার সঙ্গীরা কোথায় ?

বলতে পারি না।

তুমি এতক্ষণ ধরে জলে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম অনুসন্ধান কর নাই কেন ?

সে পুনর্ব্বার চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তর না পাইয়া বলিলেন, তোমার বাড়ি এখান হ'তে কতদূরে হবে ?

প্রায় দশ-বার ক্রোশ।

কোন্ দিকে ?

সুরেন্দ্রবাবুর বজরা যেদিকে যাইতেছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐ দিকে।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি ঐ দিকেই যাব। আমার বজরায় স্ত্রীলোক আছে, যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে ত আমার সঙ্গে এস ; তোমাকে বাটী পৌঁছিয়ে দিব।

আবার সে মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যাবে ?

যাব।

তবে এস।

পুনর্ব্বার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সে বলিল, আমার কাপড় ভেসে গিয়েচে।

এইবার সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, সে কিজন্য এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছে। নিজে তীরে নামিয়া মাঝিকে পুনরায় বজরায় ফিরিয়া গিয়া বস্ত্র আনিতে বলিয়া দিয়া বলিলেন, কাপড় এলে আমার সঙ্গে যাবে ত ?

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, যাব।

মাঝি বস্ত্র লইয়া প্রত্যাগমন করিল, অল্লক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন।

বজরায় আসিয়া সুরেন্দ্রবাবু আগন্তুককে জয়াবতীর জিম্মা করিয়া দিলেন; সে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, যত্ন আত্মীয়তা করিয়া তাঁহাকে আপনার কামরায় সে-রাত্রের মত লইয়া গেল।

আহার করাইয়া, পান দিয়া, কাছে বসিয়া জয়াবতী কহিল, ভাই, তোমার নামটি?

আমার নাম মালতী। তোমার নাম?

জয়াবতী। তোমাদের বাড়ি?

মহেশপুরে।

এখান থেকে কত দূরে?

প্রায় দশ-বার ক্রোশ উত্তরে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথা ভাই?

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কোথাও নয়।

সে কি—বিয়ে হয় নি?

হয়েছিল, কিন্তু সে-সব চুকে গেছে।

জয়াবতী একটু দুঃখিতভাবে কহিল, কতদিন?

অনেক দিন। আমার সে-সব কথা ভাল মনে পড়ে না।

জয়াবতী একথা চাপা দিয়া বলিল, তোমাদের বাড়িতে কে আছে?

কেউ নেই। এক পিসি ছিল, তিনিও বোধ হয় বেঁচে নেই।

জয়াবতী বুঝিল নৌকাডুবির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এ-কথারও আন্দোলন করা উচিত মনে করিল না। কহিল, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ভাই?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, সাগরদ্বীপে।

যারা তোমার সঙ্গে ছিল তাদের কি হ'ল?

জানি নে।

এখন বাড়ি যাবে?

তাই ভাবচি।

জয়াবতী অল্প হাসিয়া অপ্রস্তুতভাবে বলিল, আমার সঙ্গে যাবে?

নিয়ে গেলেই যাই। তোমার স্বামী আমার অনেক উপকার করেচেন। আর বাড়িতেও আমার কেউ নেই? বাড়ি গেলেও যে কার কাছে থাকব তা ত জানি নে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া জয়াবতী জিভ কাটিয়াছিল; উত্তর জানিয়া মনে মনে

শঙ্কিত হইল। জয়াবতীর মনে হইল—মালতীকে লইয়া যাওয়া বড় সুখের বিষয় হইবে না। সুরেন্দ্রবাবুর নিকট—

মালতী বলিল, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

নারায়ণপুরে।

কোথায় যাচ্ছিলে?

বেড়াতে। বাবুর শরীর ভাল নয়, তাই—

আরও দুই-চারিটা কথাবার্তার পর সে রাত্রের মত দুইজনে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

২

রাত্রিটা সুরেন্দ্রবাবুর ভাল নিদ্রা হইল না, সেইজন্য অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হাত-মুখ ধুইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। হাওয়ার জোর ছিল, পাল তুলিয়া মাঝি-মাল্লারা বজরা খুলিয়া দিল। একটু বেলা হইলে, জয়াবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকটির কিছু জানতে পেরেছ?

সমস্ত।

বাড়ি কোথায়?

মহেশপুরে।

মহেশপুরে কোথায়?

তা জানিনে। এখান থেকে দশ-বার ক্রোশ উত্তরে।

বাপের নাম কি?

জিজ্ঞাসা করি নি।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, সব খবরই জেনেছ দেখছি! স্বামীর নাম কি?

স্বামী নেই।

শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

বলে নি।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জাত জান কি?

না।

নাম জান?

জানি; মালতী।

মালতীর যদি আপত্তি না থাকে ত একবার আমার কামরায় ডাকতে ব'লো—আমি

নিজে সব জিজ্ঞাসা করব।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, কামরায় আসুন।

সুরেন্দ্রবাবুও কালবিলম্ব না করিয়া কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচে গালিচার উপর মালতী অধোবদনে বসিয়াছিল। জয়াবতীও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিবামাত্র সে প্রস্থান করিল। এ-সকল সে জানিত; হয়ত তাহার সম্মুখে সব কথা না হইতে পারে, হয়ত কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে, সে তাহা বুঝিত—তাই সরিয়া গেল, কিন্তু অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল কি না, সব কথা শুনিবার বাসনা তাহার ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না।

সুরেন্দ্রবাবু একটা কৌচে আসিয়া অধিবেশন করিলেন। নীরবে বহুক্ষণ মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; মুখখানি বড় ম্লান, বড় বিষণ্ণ, কিন্তু বড় মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল; বর্ণটা বড় সুন্দর, অঙ্গসৌষ্ঠব অতিশয় প্রীতিপদ। তাঁহার বোধ হইল এতটা রূপ একসঙ্গে তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। বিধবা—কি জাতি?

সুরেন্দ্রবাবু মুখ ফুটিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নাম কি?

মালতী বলিল, শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তিনি বাটীতেই আছেন?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, না; তিনি নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বলিলেন, বাটীতে আর কে আছে?

এইবার মালতী বহুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, বোধ হয় কেউ নাই।

এতদিন কোথায় ছিলে?

সেইখানেই ছিলাম, কিন্তু আমরা সাগরে যাচ্ছিলাম, পথের মাঝে নৌকাডুবি হয়েচে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

কালিপাড়ায়।

সেখানে তোমার কে আছে?

হয়ত কেউ আছে, কিন্তু আমি তাদের চিনি না।

কখন সেখানে যাও নাই?

বিবাহের সময় একবার মাত্র গিয়েছিলাম।

সুরেন্দ্রবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোমার বাপের বাড়িতেও কেউ নাই, শ্বশুরবাড়িতেও কেউ নাই, অন্ততঃ তুমি জান না—তবে এখন কোথায় যাবে?

কলকাতায়।

কলকাতা? সেখানে কে আছেন?

কেউ না।

কেউ না? তবে কোথায় থাকবে?

কারও বাটী অনুসন্ধান করে নেব।

তারপর?

মালতী মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তুমি রাঁধতে জান?

জানি।

কলকাতায় কোথাও রাঁধতে পেলে থাকবে?

হাঁ।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, মালতী, কলকাতা ভিন্ন আর কোথাও ঐ কাজ পেলে করবে কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বোধ হইল যেন সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তরে বিমর্ষ হইলেন। আরো কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, কলকাতায় যা আশা কর, অন্যস্থানে তার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ পেলেও করবে না?

মালতী পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িল। বলিল, কলকাতা ভিন্ন আর কোথাও আমি যাব না।

সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ম্লান মুখ দেখিয়া মালতীও বুঝিতে পারিল যে, তাহার কথা সুরেন্দ্রবাবুর মনোমত হয় নাই, সম্ভবতঃ ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, যারা কলকাতা চেনে না তাদের পক্ষে কলকাতা অতি মন্দ স্থান; তোমার যা অভিলাষ ক'রো, কিন্তু খুব সাবধানে থেকো। আর একটা কথা, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নারায়ণপুরে বাটী, যদি কখন প্রয়োজন মনে কর আমাকে সংবাদ দিও, কিংবা আমার বাটীতে যেও। আপদ-বিপদে উপকার করলেও করতে পারি।

মালতী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

আমরা এক সপ্তাহ পরে কলকাতা অভিমুখে ফিরব। এখন এই বজরাতেই থাক; যখন কলকাতায় পৌছব তখন নেমে যেও।

সুরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে মালতী সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবুর কথাতে সে বেদনা পাইয়াছিল, কিন্তু কাঁদিবার আরো শত-সহস্র কারণ ছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, বজরায় স্থান দিয়াছেন, আরো অধিক উপকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সে কি রাঁধিতে

মাত্র কলিকাতায় যাইতেছে? স্নেহময়ী মাতা, পীড়িত ভ্রাতা, নিঃসহায় সংসার, সে কি শুধু রাঁধিয়া নিজের উদর পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে? পাচিকার কর্ম্ম ছল মাত্র। সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে চাহে এবং কলিকাতা ভিন্ন অর্থ কোথায়? অর্থোপার্জ্জনের পথও সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মালতী রূপবতী; শরীরে তাহার রূপ ধরে না একথা সে টের পাইয়াছে; কলিকাতা বড় সহর। সেখানে ঐ রূপ লইয়া গেলে বিক্রয় করিবার জন্য ভাবিতে হইবে না, হয়ত আশাতীত মূল্যেও বিক্রয় হইতে পারে, তাই কলিকাতা যাইতে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। সেখানে তাহার আদর হইবে, দরিদ্র ছিল ধনবতী হইবে, ক্লেশে জীবন কাটিতেছিল এইবার সুখে কাটিবে, তথাপি মালতী কাঁদে কেন? আমরা জানি না—তাহার কথা সে-ই জানে।

পরদিন বজরা হলুদপুর গ্রামের নিম্ন দিয়া চলিতে লাগিল, মালতী খড়খড়ি খুলিয়া বাঁধা ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। ঘাটে জনপ্রাণী নাই—যে আশায় মালতী চাহিয়া রহিল তাহা হইল না। গ্রাম ছাড়িয়া বজরা দূরে চলিয়া গেল, মালতী জানালা বন্ধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়াবতী নিকটে আসিয়া বসিল, চক্ষু মুছাইয়া সস্নেহে বলিল, কেঁদে আর কি হবে বোন? তাঁদের সময় হয়েছিল, তাই মা গঙ্গা কোলে নিয়েচেন। জয়াবতী ভাবিল, নৌকাডুবিতে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের জন্যই মালতী কাঁদিতেছে। সে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। জয়াবতী মালতী অপেক্ষা বয়সে বড়; তাহাকে স্নেহ করে, ছোট ভগিনীর মত দেখে; বিশেষ, মালতী কলিকাতায় নামিয়া যাইবে শুনিয়া স্নেহ আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মালতী উঠিয়া বসিলে জয়াবতী অন্যান্য কথাবার্ত্তায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৬

৺কাশীধামে মৃত্যু হইলে হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই সদানন্দের পিসিমাতা কাশী যাইলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। সদানন্দ পুণ্যশরীরা পিসিমাতার দেহ বারাণসী ধামে গঙ্গাবক্ষে দাহ করিয়া চির-শিবলোকবাসের সুব্যবস্থা করিয়া হলুদপুরে ফিরিয়া আসিল।

শূন্য বাটীতে অনেক রাত্রে প্রবেশ করিয়া সদাপাগলা নিজ হস্তে ভুটো সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল। একবার মনে করিল তখনই হারাণবাবুর বাটীতে গিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিবে, কিন্তু অত রাত্রে দেখাশুনার সুবিধা না হইতে পারে মনে ভাবিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিল। কাশী থাকিয়া সে হারাণবাবুর

দুশ্চরিত্রের কথা, শুভদার দুরদৃষ্টের কথা, ললনার হতভাগ্যের কথা মনে করিত; রোগের সেবা করিতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিয়াও সে উহাদিগকে ভুলিতে পারিত না। মধ্যে একবার পত্র লিখিয়া সংবাদ অবগত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর কোন পক্ষেই পত্রাদি লিখেন নাই—সদানন্দও তাই প্রায় একমাসকাল কোন সংবাদ জানিতে পারে নাই। দেশে ফিরিয়া সে সেইসব কথা মনে করিতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া, চালাঘরের বাতার পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে করিতে লাগিল, মেঘের উপর পদ্ম ফুল ফুটে কি না? ললনা বলিয়াছিল, মাটি ভিন্ন ফুল ফুটে না– সে কথা সঙ্গত কি না? আর এ কথা যে বলিয়াছিল, সে কেমন করিয়া জানিল মেঘের উপর পদ্ম ফুটিতে পারে না? যাই হোক, রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে সদানন্দ স্থির করিয়া ফেলিল যে, উপরে পদ্ম ফুটিতে পারে, কিন্তু ফুটিয়া অনেকদিন থাকিতে পারে না, শুকাইয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা—শুষ্ক হইয়াই যাইতেছে বোধ হয়।

পরদিন শ্রীমান সদানন্দ চক্রবর্ত্তী ফুল, বেলপাতা, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ইত্যাদি বহু দ্রব্য হস্তে লইয়া একেবারে হারাণবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই শুভদাকে দেখিতে পাইল। শুভদা উঠান ঝাঁট দিতেছিল; খ্যাংরাটা ফেলিয়া দিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া শুভদা মৃদুস্বরে বলিল, কবে এলে সদানন্দ?

কাল রাত্রে।

সকলে ভাল আছেন?

সদানন্দ দুঃখিতভাবে অল্প হাসিয়া বলিল, সকলের মধ্যে ত পিসিমা; তিনি কাশীতেই স্থান পেয়েচেন।

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল, কি পেয়েচেন?

পিসিমাতার কাশীতেই মৃত্যু হয়েচে।

শুভদা এ-কথা জানিত না; তাহার এক শোকে আর এক শোক উথলিয়া উঠিল। শুভদা কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল; বাবা ললনাও নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, নাই? কোথায় গিয়াছে?

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কোথায় আর যাবে—বাছা সংসারের দুঃখে-কষ্টে আত্মঘাতী হয়েচে। পাঁচদিন হ'ল গঙ্গার তীরে তার পরনের কাপড়টি পাওয়া গেছে। শুভদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সদানন্দও চক্ষুর জল মুছিল, কিন্তু এক ফোঁটা কিংবা দুই ফোঁটা মাত্র। তাহার পর শুভদা যতক্ষণ না শান্ত হইল ততক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। শুভদা শান্ত হইলে বলিল, কিছু বলে যায় নি?

কিছু না।

হারাণকাকা কোথায় আছেন ?

শুভদা চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, বলতে পারি না। কখন কখন বাটীতে আসেন বটে।

তিনি এখন কি করছেন ?

তাও জানি না।

মাধব কেমন আছে ?

পূর্ব্বের মত।

আর সকলে ?

ভাল আছে।

সদানন্দ উঠিতেছিল, শুভদা বলিল, তোমার ওখানে রাঁধবে কে ?

আমি নিজে।

শুভদা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এখানে খেলে হয় না ?

হবে না কেন ? কিন্তু তার দরকার কি, রাঁধতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তা হোক, তুমি এখানে খেয়ো।

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আজ নয়। আজ পিসিমার তর্পণ করতে হবে।

শুভদা ভাবিল, তা হবেও বা, তাই কোন কথা আর বলিল না।

সদানন্দ বাটী আসিয়া একটা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িল। তখন বেলা আটটা বাজিয়াছিল, পরে যখন ভূশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে—জ্যোৎস্না রাত্রি ফুটফুট করিতেছে, সদানন্দ বাহিরে আসিয়া একটা বাগান পার হইয়া সারদাচরণের বাটীর পশ্চাতে একটা জানলার নিকট দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল, চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল, সারদা !

সারদা গৃহে ছিল, সদানন্দর ডাক শুনিতে পাইল। জানলার নিকট আসিয়া বলিল, কে ?

সদানন্দ বলিল, আমি।

কে—সদানন্দ ?

হাঁ।

কবে এলে ?

কাল রাত্রে।

এদিকে কেন? চল, বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

না, ওদিকে যাব না, তুমি এখানেই এস।

সারদাচরণ নিকটে আসিলে সদানন্দ বলিল, ললনা মরেছে তা জান কি?

সারদাচরণ বিষণ্ণভাবে কহিল, জানি।

কেন মরল কোন সংবাদ রাখ কি?

না, তবে বোধ হয় সাংসারিক দুঃখেকষ্টে আত্মঘাতী হয়েছে।

সদানন্দ তাহার পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আর কিছু জান না?

কিছু না।

সদানন্দ তীক্ষ্ণদৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণতর করিয়া বলিল, তুমি পাষণ্ড। সাংসারিক দুঃখে-কষ্টে একজন মরতে পারে, আর তুমি সম্মুখে থেকে একটু সাহায্য করতে পার না?

সদানন্দর ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া সারদাচরণ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার কারণও ছিল; সে এবং সদানন্দ বাল্য-সুহৃৎ, উভয়ে উভয়কে বহুদিন হইতে চিনিত। সারদার ছেলেবেলার কথা সদানন্দ সমস্ত অবগত ছিল এবং সেইজন্যই যে আজ তাহাকে কথা শুনাইতে আসিয়াছিল, সদানন্দর সে প্রকৃতি নহে; কিন্তু সারদা অন্যরূপ ভাবিয়া লইল। সে মনে করিল, সদানন্দ ছেলেবেলার সেইসব লইয়া দুটো কথা শুনাইয়া দিতেছে; তাই একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, সদানন্দ, সে সকল কথায় এখন আর ফল কি? আরো মনে করে দেখ, আমার পিতা জীবিত রয়েছেন, তাঁর বর্ত্তমানে ইচ্ছা হলেই কি আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করতে পারি? বিশেষ সে আমাকে কিছুই বলে নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইল। কহিল, কিছুই বলে নাই? কিছুই বলতে আসে নাই?

সম্প্রতি নয়; তবে অনেকদিন পূর্ব্বে একবার এসেছিল।

কি জন্য? কোথায়?

সারদাচরণ বলিল, বলছি। প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে অনেক রাত্রে, আমাকে ঐ শিবমন্দিরে আসতে অনুরোধ করেছিল; আমার যাবার ইচ্ছা না থাকলেও গিয়েছিলাম—

সদানন্দ রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যাবার ইচ্ছা ছিল না।

সারদা ম্লানভাবে বলিল, আর কেন ভাই!

সদানন্দ সে-কথা শুনিল না, বলিল, তারপর?

তারপর বিবাহ করতে অনুরোধ করেছিল।

কার সঙ্গে?

তার নিজেরই সঙ্গে।

নিজের! ললনার সঙ্গে? তুমি কি বলিলে?

সারদা আপনার বাল্যকথা স্মরণ করিয়া বড় লজ্জিত হইল, কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আমি—আমি তা কি করব বল? বাবা এখনো বেঁচে আছেন।

সদানন্দ কতকটা ক্রোধে, দুঃখে, কতকটা মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, তোমার বাবার বেঁচে কি লাভ?

এইবার সারদাচরণ কুপিত হইল। পিতার সম্বন্ধে কোন কথা তাহার সহিত বলিল না; বলিল, লাভালাভের কথা তিনি ভাল জানেন। আমাদের এ বিষয়ে বিচার করবার কোন অধিকার নাই—ভালও দেখায় না। যা হোক, আমি বললাম, তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

সে চলে গেল?

না, তখনও চলে যায় নাই, ছলনাকে বিবাহ করতে বলল।

তুমি স্বীকার করলে না?

সারদাচরণ সদানন্দর মুখ দেখিয়া এবং তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, অস্বীকারও করি নাই, বলেছিলাম পিতার মত হলে করতে পারি।

সদানন্দ বলিল, পিতার মত হ'ল না?

না।

কেন?

বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বলছি শোন, বাবার ইচ্ছা আমার বিবাহ দিয়ে কিছু অর্থ লাভ করেন—হারাণবাবু কি তা দিতে পারতেন?

সদানন্দ সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না, বলিল, তোমার পিতা কি আশা করেন?

আমি বলতে পারি না।

অর্থের আশা পূর্ণ হলে আর কোন আপত্তি হতে পারে কি?

সম্ভব নয়।

তোমার নিজের কোন আপত্তি নাই?

কিছু না।

তবে দেখা যাক, বলিয়া সদানন্দ পুনর্ব্বার বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিল।

সারদাচরণ বলিল, কোথায় যাও? একটু বসবে না?

না।

সদানন্দ, আমার কোন দোষ নাই।

বোধ হয় নাই—ভগবান জানেন—আমি বলতে পারি না।

রাগ করলে?

না।

সদানন্দ বাটী ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইল, তাহার পর পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। পথ বাহিয়া গঙ্গাপানে চলিল। ভাগীরথীর ছোট ছোট ঢেউ বাঁধাঘাটের সোপানে ঝলমল ছলছল করিয়া ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া সরিয়া যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে; সদানন্দ কিছুক্ষণ সেইগুলি দেখিতে লাগিল, দূরে একখানা বজরা ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া আসিতেছে, সদানন্দ অন্যমনে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঘাটের সর্ব্বনিম্ন সোপানের উপর বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া আপনার মনে আকাশপানে চাহিয়া গান ধরিল।

৪

সেইদিন রাত্রে জ্যোৎস্না-ধৌত প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া ভাঁটার স্রোতে গা ভাসাইয়া, ধীরে ধীরে হস্ত-সঞ্চালনের মত ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া দুটি দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে সুরেন্দ্রবাবুর প্রকাণ্ড বজরা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ভাসিয়া আসিতেছে।

ছাদের উপরে সুরেন্দ্রবাবু ও জয়াবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, নীচে কামরার জানলা খুলিয়া মালতী গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট রজত ঢেউগুলি গুনিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল। মালতী বুঝিতে পারিল এইবার হলুদপুরে আসিতেছে। আরো কিছুক্ষণ আসিয়া গঙ্গাতীরের অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার পার্শ্বে বাঁধা ঘাট চন্দ্রকিরণে ধপ্‌ ধপ্‌ করিতেছে তাহাও দেখিল। আর তাহার পশ্চাতে হলুদপুর গ্রাম সুপ্ত নিস্তব্ধ পড়িয়া আছে। মালতী তথাকার প্রত্যেক বাটী, প্রত্যেক নর-নারীর নিদ্রিত মুখ মানস-চক্ষে দেখিতে লাগিল, আর ঐ ঘাট—সে যখন ললনা ছিল তখন দু'বেলা ঐখানে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, গাত্র ধৌত করিতে আসিত; ঐ ঘাট হইতে পিত্তল-কলসী পূর্ণ করিয়া জল না লইয়া গেলে পান করা, রন্ধন করা চলিত না। ললনা এখন মালতী—সে আর ললনা নহে, তবুও তাহাকে এখনো ভুলিতে পারা যায় না, হারাণ মুখুয্যেকে ভুলিতে পারা যায় না, তাই ভাবিতেছিল আর কাঁদিতেছিল, আর সদাপাগলাকেও সে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। ইতিপূর্ব্বেই তাহা মালতী ভাবিয়া দেখিয়াছিল। মালতী ভাবিল, ছলনা, বিন্দু, কৃষ্ণপিসিমা, গিরিজায়া, শৈলবতী, রমা—কেউ না—কেউ না; সদানন্দ তাহার পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা লইয়া স্মৃতির অর্দ্ধেক জড়াইয়া বসিয়া আছে, কর্ণে তাহারই গান শুনিতে পাইতেছে। মালতীর বোধ হইল যেন সদাপাগলের প্রফুল্ল

সুর করুণ হইয়া অস্পষ্টভাবে কোথা হইতে তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছে। মালতী বিস্মিত হইল; স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল ঠিক সদানন্দর মত গীত গাহিতেছে। বজরাখানা আরও একটু আগাইয়া আসিলে মালতী দেখিল ঘাটের নীচে জলে পা রাখিয়া একজন বসিয়া আছে, কিন্তু গান তখন বন্ধ হইয়াছে। লোকটি কে তাহা ঠিক চিনিতে না পারিলেও মালতী পরিষ্কার বুঝিল এ সদানন্দ ভিন্ন আর কেহ নহে; পাগল ক্ষ্যাপা লোক ভিন্ন কে আর অত রাত্রে মা গঙ্গাকে গান শুনাইতে আসিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন মালতী পুনর্ব্বার কাঁদিতে বসিল। সদানন্দর কথা যত মনে করিতে লাগিল, তত ললনার কথা মনে পড়িতে লাগিল; শুভদা, ছলনা, মাধব, পিসিমা আর হতভাগা হারাণ মুখুয্যে—সকলেই সদানন্দর স্মৃতি মাঝখানে রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল, প্রভাত হইল, ক্রমে সূর্য্য উঠিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল। মালতী কিন্তু উঠিতে পারিল না। সমস্ত অঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা; গা গরম হইয়াছে, মাথা টন্ টন্ করিতেছে, আরো নানা উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। দাসী আসিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, তোমার যে দেখচি জ্বর হয়েচে। মালতী চুপ করিয়া রহিল। জয়াবতী আসিয়া গায়ে হাত দিল, জানালা খোলা আছে দেখিয়া একটু অনুযোগ করিল। বলিল, এমনি করে কি জানালায় মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে? সমস্ত রাত্রি পূবে হাওয়া লেগে গা গরম হয়েচে।

মালতী মৃদুভাবে বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই জানালা বন্ধ করা হয় নি।

সুরেন্দ্রবাবু একথা শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন। সত্যই জ্বর হইয়াছে। তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ছিল। তাহা হইতে ঔষধ লইয়া দিলেন আর জয়াবতীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যেন খুব সাবধানে রাখা হয়।

জয়াবতী মালতীর কাছে আসিয়া বসিল। জানালা সার্শি সমস্ত বন্ধ, মালতী কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, এমন কি বজরা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে তাহাও ঠিক বুঝিতে পাইতেছিল না। কামরায় জয়াবতী ভিন্ন আর কেহ নাই দেখিয়া মালতী বলিল, দিদি! জয়াবতীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আমরা কতদূর এসেছি জান?

জয়াবতী বলিল, প্রায় আট-দশ ক্রোশ হবে।

মালতী তাহা জানিতে চাহে নাই, বলিল, কলকাতা আর কতদূর?

এখনো প্রায় দু'দিনের পথ।

মালতী চুপ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া লইল। পরে বলিল, দিদি, যদি সে সময়ের মধ্যে ভাল না হই?

জয়াবতী কথার ভাবটা বুঝিতে পারিল। স্ত্রীলোকে এ-সময়ে হিংসা রাখে না—তাই একটু হাসিয়া বলিল, তা হলে আমরা তোমাকে জলে ফেলে দেবো।

মালতীও একটু হাসিল, কিন্তু সে-হাসিতে এ-হাসিতে একটু প্রভেদ ছিল। বলিল, হ'লে ভাল হ'তো দিদি।

জয়াবতী অপ্রতিভ হইল। কথাটার যে আরো একটু অন্যরূপ মানে হইতে পারে তাহা সে ততটা ভাবিয়া বলে নাই, বলিল, ছিঃ! ও-কথা কি বলে?

মালতী চুপ করিয়া রহিল, আর উত্তর করিল না। নিঃশব্দে সে ভাবিয়া দেখিতেছিল যে, জয়াবতীর কথা সত্য হইলে কেমন হয়? ভাল হয় কি? হয় না। মরিতে তাহার সাধ নাই, তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, সে মরণের অধিক ক্লেশ পাইতেছে, তথাপি মরিতে পারিবে না; মরণে ভয় নাই, তথাপি মরিবার ইচ্ছা নাই। যাহারা সে ইচ্ছা করিতে পারে, তাহাদের দুঃখ তত অধিক নয়। একবিন্দু জল তাহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জয়াবতী সস্নেহে তাহা মুছাইয়া বলিল, ভাব কেন বোন? পূবে বাতাস লেগে একটু গা গরম হয়েচে, তাই বলে ভাবতে হয়? তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া সাবধান হইয়া বলিল, আর যদি তেমন হয় তা হলেও ত উপায় আছে, কাছেই কলকাতা—সেখানে ডাক্তার-বদ্দির অভাব কি?

অভাব কিছুরই ছিল না এবং প্রয়োজনও কিছুই হইল না। বজরা যেদিন কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিল সেদিন মালতীর আর জ্বর ছিল না, কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, এখনো কিছুই খাইতে পায় নাই। বজরা কলিকাতা ছাড়াইয়া একটু দূরে—পরপারে নোঙ্গর করা হইল। কামরার জানালা খোলা ছিল, মুখ বাড়াইয়া মালতী জাহাজ, মাস্তুল, বড় বড় নৌকা ও প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা-শ্রেণীর চূড়া দেখিতে লাগিল। মালতীর ভয় হইতেছিল; ভাবিতেছিল এই কি কলিকাতা? তাহা হইলে এত গণ্ডগোল এত শব্দ-সাড়ার মধ্যে কে কাহার কথা শুনিতে পাইবে? এত ব্যস্ত সহরে কে তাহাকে দেখিবার অবকাশ পাইবে? কিন্তু তাহা ত হইবে না, তাহাকে যাইতে হইবে। যেজন্য এ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের মুখ মনে করিয়া নরকে ডুব দিতে বসিয়াছে—ইহকাল পরকাল কোন কথাই মনে স্থান দেয় নাই, তাহাদের মুখ এত শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। আজ না হয় কাল এ আশ্রয় পরিত্যাগ করিতেই হইবে; আর যখন হইবেই তখন আর ভয় করিয়া লাভ কি?

সে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রচার করিলেন যে, বজরা এস্থানে আরও তিন-চারিদিন বাঁধা থাকিবে। মালতীর শরীর রীতিমত সুস্থ হইলে তবে সে যেখানে ইচ্ছা যাইবে; বজরা সেইসময়ে খোলা হইবে। মালতী একথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিল। আন্তরিক সে ইহাই প্রার্থনা করিতেছিল;

কেন না, যতই প্রয়োজনীয় এবং কর্ত্তব্য হউক না, আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয়ে যাইতে মনকে তেমন সহজে রাজি করিতে পারা যায় না, ইতিপূর্ব্বেই সে এই মর্ম্মে তাহার সহিত কলহ করিতেছিল—এখন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া সেটাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া চন্দনসই গোছ এরকম করিয়া লইবার মত সময় পাইল।

পরদিন মধ্যাহ্নে জয়াবতী কলিকাতা ভ্রমণ করিতে যাইবে স্থির হইয়াছিল। গাড়ি, পান্সী ঠিক করিয়া ভৃত্য সংবাদ দিল; জয়াবতী বাবুকে তাহার সহিত যাইতে অনেক সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না; মালতী যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাবু নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন—তাহার শরীর ভাল নয়, আবার জ্বর হইতে পারে! তখন অগত্যা জয়াবতী একাই দাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেল।

মালতী কামরার ভিতর শয়ন করিয়াছিল, সুরেন্দ্রবাবু দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মালতী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া বসিল, সুরেন্দ্রবাবু একটু দূরে উপবেশন করিলেন—অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। তিনি কিছু বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে সাহস হইতেছিল না—অনেকক্ষণ পরে একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, তুমি এইখানেই কি নিশ্চয় নেমে যাবে?

মাথা নাড়িয়া মালতী বলিল, হাঁ।

বেশ করে চিন্তা করে দেখেচ কি?

মালতী সেইরূপভাবে বলিল, দেখেচি।

কোথায় যাবে?

তা ত জানি না।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তবে আর কি দেখেচ? আজ নয়, কাল একবার কলকাতার ভিতরটা দেখে এসো; তার পর যদি নিশ্চিত ত্যাগ করে অনিশ্চিতই ভাল লাগে—যেও, আমি বারণ করব না।

মালতী কথা কহিল না!

তিনি কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা ম্লানভাবে কহিতে লাগিলেন, তুমি যতটা না ভেবেচ, আমি ততটা ভেবে দেখেচি। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে পারবে না; ভদ্রলোকের কন্যা ভদ্র সংসারে প্রবেশ করতে না পারলে তুমি থাকতে পারবে না; এ অবস্থায় নিঃসহায় অবস্থায় কেমন করে যে এত বড় সহরে সমস্ত অনুসন্ধান করে নিতে পারবে, আমি বুঝতে পারি না। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার কহিলেন, আর ভেবে দেখ, তোমার এ-বয়সে মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে আপনাকে বেশ সামলিয়ে চলতে পারবে কি? ভয় হয় পাছে পদে পদে বিপদে পড়।

মালতী নিঃশব্দে কাঁপিতেছিল, এসকল সে সমস্তই ভাবিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু

উপায় ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, মালতী কাঁদিতেছে, পূর্ব্বেও তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন অন্যরূপ মনে হইতে লাগিল; বলিলেন, যাওয়াই কি স্থির করলে?

মালতী চোখ মুছিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে অনেকেই বোকা মনে করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। যাহারা তাঁহাকে এ আখ্যা প্রদান করিত তাহাদের অপেক্ষাও তিনি বোধ হয় শতগুণ অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের মত কর্ম্ম করিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না। মালতীর মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন, তাহার পর মালতী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে বলিলেন, মালতী, তোমার বড় টাকার প্রয়োজন, না।

তাহার চক্ষুজল আবার উছলাইয়া উঠিল। এত প্রয়োজন বোধ হয় জগতে আর কাহারো নাই।

বড় প্রয়োজন কি?

মালতী কান্না কতকটা শেষ করিয়া ভাঙ্গা স্বরে বলিল, বড় প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিলেন, বুঝিতে তাঁহার আর বাকী নাই। পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল; কারণ, এ সব লোকেরও যে কাঁদিবার যথার্থ কারণ থাকিতে পারে, সকলেই যে শুধু মন ভোলাইবার জন্য কাঁদে না তাহা তিনি কুসংসর্গ-দোষে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। অল্প হাসিয়া অল্প চাপিয়া বলিলেন, তবে আর কাঁদচ কেন? তুমি রূপসী, তুমি যুবতী, কলকাতায় যাচ্ছ—এখন আর তোমার অর্থের ভাবনা ভাবতে হবে না—কলকাতায় অর্থ ছড়ান আছে দেখতে পাবে।

মালতীর বোধ হইল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তাহার মাথাটা খসিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে, এখন জানালা গলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। মালতী এইরূপ কিছু একটা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা বোধ হইল যেন বাধা পড়িয়াছে, যেন মূর্চ্ছিত হইয়া একজনের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে কোল যেন অগ্নি-বিক্ষিপ্ত, বড় কঠিন, বড় উত্তপ্ত, তাহাতে যেন একবিন্দু মাংস নাই—এতটুকু কোমলতা নাই। সমস্ত পাষাণ, সমস্ত অগ্নিময়। মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও মালতী শিহরিয়া উঠিল। যখন জ্ঞান হইল তখন যে সে কাহারো ক্রোড়ের উপর শুইয়া আছে তাহা বোধ হইল না; চাহিয়া দেখিল আপনার শয্যাতে শুইয়া আছে, কিন্তু পার্শ্বে সুরেন্দ্রবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল, দুই হাতে মুখ চাপিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, মালতী, কাল প্রাতঃকালে আমি বজরা খুলে দেব, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেব না, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। নিশ্বাস রোধ করিয়া মালতী শুনিতে লাগিল—যেজন্য তুমি কলকাতা যেতে চাচ্ছ তা তুমি পারবে না। এ বৃত্তি বোধ হয় তুমি পূর্ব্বে কখন কর নাই, এখনও পারবে না। তোমার যত অর্থের প্রয়োজন হয়, যা কিছু সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভিলাষ হয় আমি দেব।

মালতীর রুদ্ধশ্বাসের সহিত চক্ষু-জল বাহির হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রবাবু তাহা বুঝিলেন, সযত্নে আপনার ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, মালতী, আমার সঙ্গে চল। আমি খুব ধনী না হলেও দরিদ্র নই—তোমার ব্যয় স্বচ্ছন্দে বহন করতে পারব; আর বল দেখি, আমি তোমাকে এখানে ফেলে গেলে বাঁচবে কি? না, আমি শান্ত-মনে বাড়ি ফিরতে পারব? সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে আরো বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, সস্নেহে সে অশ্রু মুছাইলেন—আগ্রহে ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় সঙ্কুচিত সে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া বলিলেন, কেমন যাবে ত?

মালতীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, সে আর সে নয়; সে ললনা নয়, সে মালতী নয়, সে কেহ নয়, শুধু এখন যাহা আছে তাহাই; সুরেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গিনী, আজন্মের প্রণয়িনী; সে সীতা, সে সাবিত্রী, সে দময়ন্তী; সীতা-সাবিত্রীর নাম কেন? সে রাধা, সে চন্দ্রাবলী; কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সুখ, শান্তি, স্বর্গের ক্রোড়ে আবার মান-অপমান কি? ললনা নিস্পন্দ অচেতন স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া রহিল; সে ক্রোড় আর অস্থিময়, পাষাণ, অঙ্গার-বিক্ষিপ্ত নহে; এখন শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল, মধুময়। ললনার বোধ হইল সে এতদিন শাপগ্রস্ত ছিল, এখন পুনরায় স্বর্গে আসিয়াছে, এতদিন পরে হৃত ধন ফিরাইয়া পাইয়াছে। মালতীর সঙ্কুচিত ওষ্ঠ পুনরায় বিস্ফারিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ সে ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, আর পাপের প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ললনা দেবী স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। তখন সূর্য্য অস্তগমন করিতেছিলেন, জানালার ফাঁক দিয়া এ পাপচিত্র দেখিয়া যাইলেন, সে অপরাহ্ণ-সূর্য্য-রক্ত-করস্পর্শে ললনার মুখমণ্ডল সুরেন্দ্রর চক্ষে সহস্রগুণ অধিক মনোমুগ্ধকর প্রতিভাত হইল, তিনি সহস্র আবেগ সহস্র তৃষ্ণায় সে-মুখ পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিলেন, মালতী, যাবে ত?

যাব।

সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্ত হইলেন—তবে চল এখনি যাই।

কিন্তু দিদি?

কে দিদি?

তোমার স্ত্রী।

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গিল। শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রী! সে ত অনেকদিন মরেছে।

জয়াবতী?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাস্য করিলেন; বলিলেন, জয়া আমার স্ত্রী নয়—তাকে কখন বিবাহ করি নাই।

তবে কি?

কিছু নয়—কিছু নয়। তুমি আমার সব, সে কেউ নয়—তুমি সব—তুমি সমস্ত।

এবার মালতী তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিল, ক্রোড়ে মুখ লুকাইল,—ছিঃ ছিঃ! মুক্তকণ্ঠে কহিল, আমি তোমার চিরদাসী, আমাকে পরিত্যাগ ক'রো না।

না, কখন না।

তবে আমাকে নিয়ে চল।

চল।

আজ।

এখনি।

এই সময়ে বাহিরে শত-সহস্র কণ্ঠে নানাকণ্ঠে নানারূপে চীৎকার করিয়া উঠিল, ধর ধর—সরে যাও—তফাৎ—তফাৎ—গেল গেল—ডুবল—হো হো ঐ যা—সুরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মালতীও বাহির হইয়া পড়িল; সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এ-পারে ও-পারে, চতুর্দ্দিকে মাঝি-মাল্লা, মুটে-মজুর সমস্ত সমবেত হইয়া চীৎকার করিতেছে এবং কিছু দূরে প্রায় মধ্যগঙ্গায় একখানা পান্‌সি স্টিমারে ধাক্কা লাগিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে।

চক্ষুর নিমেষে সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন কি ঘটিয়াছে; চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওতে আমার জয়া আছে—সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্ব হইতে মালতী ধরিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ পাগলের মত ছটফট করিয়া আবার চীৎকার করিলেন, ধোরো না, ধোরো না—আমার জয়া যায় যে!

ততক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রাণ নৌকাখানি প্রকাণ্ড স্টিমারের তলদেশে ধীরে ধীরে তলাইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথও মাঝি-মাল্লা, ভৃত্য প্রভৃতির হস্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

! জ্ঞান হইলে, প্রথমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আকুলভাবে বলিয়া লন, জয়া! পার্শ্বে মালতী বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল, তাঁহার কথার ভাবে সে আরো অধিক করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। তিনি কিন্তু

তাহা দেখিলেন না; একবারমাত্র চাহিলেন, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, জয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

নিকটে একজন পুরাতন ভৃত্য বসিয়াছিল, সে কাতরভাবে কহিল, না।

পাওয়া যায় নাই? তবে বোধ হয় সে আর বেঁচে নাই।

ভৃত্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বোধ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি কত হয়েছে?

প্রায় দশটা।

দশটা? তবু সংবাদ নাই?

ভৃত্য উত্তর দিল, না।

সুরেন্দ্রবাবু অধিকতর হতাশ হইয়া কপালে করাঘাত করিলেন, বলিলেন, তোমরা সবাই যাও—সমস্ত সহরে সমস্ত গঙ্গার ধারে সন্ধান কর গে!

ভৃত্য মনে মনে ভাবিল, মন্দ হুকুম নয়; মুখে বলিল, যে আজ্ঞে; পরে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

কক্ষে মালতী ভিন্ন আর কেহ নাই, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সময় অতিবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল। কামরার দেয়ালে যে ঘড়িটা ছিল সেটা আপনার মনে এগারটার পরে বারটা, তাহার পর একটা, তুইটা, তিনটা, চারিটা—তাহার পুঁজিপাটা সমস্ত বাজাইয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহা লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। সুরেন্দ্রনাথ এ-পাশ ও-পাশ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, মালতী পাশে বসিয়া তাঁহার যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল, আর চক্ষু মুছিতে লাগিল, তাহারও কষ্ট হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে এবং ততোধিক নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সে ভাবিয়া দেখিতেছিল।

একে ত কলিকাতার গঙ্গা সমস্ত রাত্রিই প্রায় নিদ্রা যান না, এখন আবার চারিটা বাজিয়া গিয়াছে—চতুষ্পার্শ্বে অল্প ঈষৎ বেশ সাড়াশব্দ হইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মালতীর পানে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, সমস্ত রাত্রি মিথ্যে জেগে কোন ফল নাই, তুমি-শোও গে।

মালতী উঠিয়া যাইতেছিল, তিনি আবার ডাকিয়া বলিলেন, ব'স, যেয়ো না, তোমাকে কিছু বলব।

মালতী তুই পদ অগ্রসর হইয়াছিল, পুনরায় সেইখানেই উপবেশন করিল।

সুরেন্দ্রনাথ একবার চক্ষু রগড়াইলেন, একবার কি বলিবেন তাহা যেন

ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিলেন, মালতী, কার পাপে এই হ'ল।

মালতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; একথা সে বহুবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ; উত্তরও একরকম পাইয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে গিয়াও তাহার মুখ বন্ধ হইল, কাজেই অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

সুরেন্দ্রবাবুও যাহা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা না বলিয়া বলিলেন, সে-সব কথা পরে হবে, এখন যাও।

মলতী তথা হইতে আপনার কামরায় আসিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল কি ? না ; বাকী রাত্রিটুকু শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। অনেকবার বসিল, অনেকবার শুইল, অনেক দেব-দেবীর নাম করিল ; অনেক কথা মনে করিল ; তাহার পর ভোরবেলায় তন্দ্রার ঝোঁকে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দেখিল জয়াবতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কখন দেখিল সদানন্দ মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে, কখন দেখিল জননী শুভদা আকুলভাবে রোদন করিতেছে ; সর্ব্বশেষে বোধ হইল যেন মাধব আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেছে, মালতীর তথায় যাইবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। মালতীর সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল প্রাতঃসূর্য্যকিরণ খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

সেদিন সমস্তদিন সে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইল না ; কিছু পূর্ব্বেই তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরদিনও তিনি আসিলেন না ; তাহার পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া আপনার কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সেদিন এমনি কাটিল। পরদিন তিনি মালতীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মালতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিম্নমুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একখানা কাগজ লইয়া লিখিতেছিলেন, বোধ হয় কোথাও পত্র লিখিতেছিলেন। মালতী আড়চক্ষে ভয়ে ভয়ে দেখিল তাঁহার সমস্ত মুখ অতিশয় ম্লান, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আছে মাথার চুলগুলা নিতান্ত রুক্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বস্ত্রের স্থানে স্থানে এখনো কাদা লাগিয়া আছে, মালতী আপনা-আপনি শিহরিয়া উঠিল, তাহার বোধ হইল যেন নিতান্ত গর্হিত অপরাধে তাহাকে বিচারালয়ে আনয়ন করা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবাবু অর্দ্ধলিখিত কাগজখানা পার্শ্বে রাখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে কি ?

মালতী অধোবদনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হয়েছে।

আমি আজ বজরা খুলে দেব। পরপারে কলকাতা—তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার।

কথা শুনিয়া মালতীর চক্ষে জল আসিল; কোন কথা কহিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পার্শ্বের কাগজখানা হাতে লইয়া বলিলেন, এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, এই পত্রখানা নিয়ে সন্ধান করে তাঁর নিকট যাও, তিনি তোমার কোন-রূপ উপায় করে দেবেন।

টপ্ করিয়া একফোঁটা জল মালতীর চক্ষু হইতে পদতলে কার্পেটের উপর পড়িল।

সুরেন্দ্রবাবু বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তোমার টাকাকড়ি বোধ হয় কিছু নাই?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা আমি জানতাম। এই নাও, বলিয়া মনিব্যাগ উপাধানের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এতে যা আছে, কোনরূপ উপায় না হলেও এক বৎসর এতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলবে; তারপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যা হয় ক'রো।

আর একফোঁটা জল কার্পেটের উপর আসিয়া পড়িল।

সেদিন উন্মত্ত ছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কার পাপে এমন ঘটল? কিন্তু এখন জ্ঞান হয়েছে, এখন দেখছি আমারই পাপের এই ফল—তুমি নির্দোষ। আমার জয়াকে আমি মেরে ফেলেছি।

কপালের উপর কয়েক বিন্দু ঘাম জমা হইতেছিল, তিনি হাত দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ঢের হয়েছে—আর পাপ করব না; কিছুদিন সৎপথে থেকে দেখি যদি সুখ পাই।

মালতী দাঁড়াইয়া রহিল; সুরেন্দ্রবাবু পত্রখানা শেষ করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে বলিলেন, এই নাও। শ্যামবাজারে সন্ধান করে নিও, বোধ হয় এতে উপকার হবে।

কম্পিত-হস্তে মালতী পত্রখানা তুলিয়া লইল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, টাকা নাও।

সে তাহাও উঠাইল; দ্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হইল।

সুরেন্দ্রবাবুর ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল; বলিলেন, ধর্ম্মপথে থেকো—

মালতী আর একপদ অগ্রসর হইল। এবার সুরেন্দ্রনাথের গলা কাঁপিল—মালতী, সেদিনকার কথা বিস্মৃত হ'য়ো—

মালতী দ্বারের হাতল ধরিয়া টানিল, দ্বার অর্দ্ধ উন্মোচিত হইল, সুরেন্দ্রনাথের গলা আরো কম্পিত হইল—অসময়ে, কষ্টে পড়লে আমাকে স্মরণ ক'রো।

মালতী বাহিরে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল ; সুরেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, মালতী !

মালতী সেইখানে দাঁড়াইল।

আবার ডাকিলেন, মালতী !

সে এবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কপাটে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

চক্ষু মুছিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, জয়ার শোক এখনও ভুলি নাই—

মালতী দ্বার ছাড়িয়া সেইখানে উপবেশন করিল, তাহার পা কাঁপিতেছিল।

মালতী, কি নিয়ে সংসারে থাকব ? সুরেন্দ্রনাথ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন —তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে আর বাঁচব না। এইবার নীচে গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

মালতী কাছে আসিয়া বসিল, আপনার ক্রোড়ের উপর মাথা তুলিয়া লইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি যাব না।

তখন দুজনেই বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিলেন। মালতী পুনর্ব্বার চক্ষু মুছাইয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু মুদ্রিতই ছিল ; সেইভাবেই ভগ্নস্বরে বলিলেন, সেদিন তুমি কি বলেছিলে মনে আছে ?

কি ?

চির-দাসী !

তাই।

সুরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হরিচরণ !

ছাদের উপর হইতে হরিচরণ মাঝি বলিল, আজ্ঞে।

বজরা এখনি খুলে দাও।

এখনি ?

এখনি।

৬

যতক্ষণ বজরাখানা দেখা গেল, সদানন্দ গীত বন্ধ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল। আজ তাহার মনটা ভাল ছিল না, নিদ্রাও ভাল হইল না। প্রাতঃকালে শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, আমার এখানে খেলে হয় না ?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, কেন হবে না ?

আমি তাই মনে করেচি ; আমার কেউ নেই, দু'বেলা এখানেই দুটি খাব।

শুভদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ ত।

পিসিমার শ্বশুরবাড়িতে তাঁর কতক জমি-জমা আছে, সেগুলা আমিই পেয়েচি, দু-একদিনের মধ্যেই সেখানে গিয়ে আমাকে সব দেখে-শুনে নিতে হবে।

শুভদা বলিল, তা ত নিশ্চয়, না হলে কে আর দেখবে?

তাই মনে করেছি যে, আমার ধানের গোলাটা এখানেই রাখব, না হলে চুরি যেতে পারে।

শুভদা ভিতরের কথা বুঝিল না। বলিল, এতদিন ত চুরি যায়নি।

না যাক, কিন্তু এখন ত যেতে পারে।

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ইহার দুই-একদিনের মধ্যেই সদানন্দর ধানের গোলা, কলাইয়ের মরাই, আলুর বোঝা, নারিকেল ভাঁই, গুড়ের জালা সমস্ত একে একে সরিয়া আসিয়া মুখুয্যে-পরিবারে স্থান গ্রহণ করিল।

দেখিয়া শুনিয়া শুভদা বলিল, সদানন্দ, লোকে কি বলবে?

সদানন্দ হাসিয়া উত্তর দিল, জিনিস আমার, লোকের নয়। আমি এখানে খাই, এখানে থাকি, আমার জিনিস-পত্রও থাকবে।

বাস্তবিক পাড়ার পাঁচজনও পাঁচরকম কথা কহিতে লাগিল, কেহ বলিল, হারাণের বৌ সদাপাগলাকে যাদু করিয়াছে; কেহ কহিল, সদানন্দ একেবারে পাগলা হইয়া গিয়াছে; কেহ বা এমন কথাও রটাইল যে, ছলনার সহিত সদার বিবাহ হইতেছে। সদানন্দ এ-কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল, যে সম্মুখে এ-কথা উত্থাপন করিল তাহাকে হাসিমুখে একটা রামপ্রসাদী গান শুনাইয়া দিল, কাহাকে বা রসিকতা করিয়া বলিল, আমি মরিলে তোমার নামে দু'বিঘা জমি লিখিয়া দিয়া যাইব, কাহাকে বা ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল, পাগলা মানুষে পাগলামি করে সেজন্য তোমরা ভাবিও না। ক্রমশঃ লোকে মুখ বন্ধ করিতে লাগিল, তবে যাহারা ঈর্ষাপরতন্ত্র তাহারা মনে মনে জ্বলিতে লাগিল। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ-কথা শুনিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া দিলেন।

বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়া সদানন্দ দুঃখিতভাবে বলিল, যা হবার তা হয়েচে; এখন পিসিমার শ্বশুরবাটী হতে ফিরে এসে ধানের গোলাটা আপনার বাটীতে রেখে যাব।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ওহে সদানন্দ, তোমার পিতাও আমাকে মান্য করে চলতেন।

আমিও কোনরূপ অমান্য করি নাই।

তবে এমন কথা বললে কেন?

সদানন্দ অপ্রতিভভাবে কহিল, আমার সব সময়ে মতিস্থির থাকে না।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আরো রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তুমি উৎছন্ন যাচ্ছ।

সদানন্দ মৃদু হাসিল; বলিল, আপনারা একটু চেষ্টা করলে না যেতেও পারতাম।

তুমি আমার সামনে হতে দূর হও।

যে আজ্ঞে, বলিয়া সদানন্দ বাহিরে আসিয়া খুব একগাল হাসিয়া লইল, তাহার পর গলা ছাড়িয়া রামপ্রসাদী ধরিল।

নিকটে কাঙ্গালীচরণ মাথায় পটলের বোঝা লইয়া হাটে যাইতেছিল, সে চোখে হাসি, মুখে গান দেখিয়া বলিল, কি দাদাঠাকুর, এত আমোদ কিসের?

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ ছিল, খুব খেয়েচি।

সে বলিল, বটে!

তখন সদানন্দ আজকাল পটলের দর জিজ্ঞাসা করিয়া আর একবার হাসিয়া পূর্ব্বত্যক্ত গানটার সুর গলার মধ্যে বেশ করিয়া ভাঁজিয়া লইয়া মনের আনন্দে পথ বাহিয়া চলিল, কাঙ্গালীচরণও যথাস্থানে চলিয়া গেল।

এখন একটা কথা আছে। কবি বলিয়াছেন, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; সাংসারিক অস্তিত্ব ইহার বড় একটা নাই। এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে আংশিক সত্য, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ হারাণচন্দ্রের যাহা পার্থিব সুখের শেষ সীমা, শুভদা তাহা তেমন উপভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। হারাণচন্দ্র দু'বেলা পরিতোষে আহার করিতে পান, চাহিলেই দুই-চারি আনা পয়সা স্ত্রীর নিকট কর্জ্জ করিতে পারেন, তাহা পরিশোধ করিবার বালাই মাত্র নাই, বাজারের ভিতর দিয়া এখন উন্নত মস্তকে গমনাগমন করেন, কোন শ্যালকের নিকট একটি পয়সা মাত্র কর্জ্জ নাই, আড্ডাধারী তাঁহার পূর্ব্বপদ সসম্মানে ফিরাইয়া দিয়াছে; আর চাই কি? তবে যেটুকু বাকী আছে, হারাণচন্দ্র ভাবেন, সদানন্দ আর একটু ক্ষেপিলেই তাহা সমাধান করিয়া ফেলিবেন। গুলির দোকানটা তখন নিজেই কিনিয়া লইবেন, আর কাত্যায়নী ছোটলোক বেটীর গর্ব রীতিমত খর্ব্ব করিবেন। তাহার এক বৎসরের খোরাক ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে আগাম ফেলিয়া দিয়া বলিবেন, ছোটলোক বেটী! আমাকে হেয় করিস্? পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারা জানেন না, তা তুই কোন্ ছার। আর ভগবান নন্দী; তার বাটীর সম্মুখে যদি আড্ডাঘর না বসাই ত আমার নাম হারাণ নয়। হারাণচন্দ্র এখন গুন্ গুন্ স্বরে গলায় সুর লইয়া সমস্ত বামুনপাড়াটা ঘুরিয়া বেড়ান।

কিন্তু শুভদা? তাহার কি-এক ভাবনা? ভগবান জানেন স্বামী-সুখ সে একদিনের জন্যও পায় নাই; অন্ততঃ তাহার মনে পড়ে না—সে স্বামীর মুখে অন্ন-

ব্যঞ্জন তুলিয়া দিতে যে তাহার কত আনন্দ, কত তৃপ্তি তাহা সে নিজেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না; আনন্দে চোখের কোণে জল আসে, কিন্তু কে তাহা দেখিবে? দেখিবার একজন ছিল, বুঝিবার একজন ছিল, কিন্তু সে পূর্ব্বেই গত হইয়াছে। শুধু ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে শুভদা এই সুখেই সাংসারিক কাহিনী খতম্ করিয়া দিতে পারিত; কিন্তু ছলনা দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার উপায় কি করিয়া হইবে? যে মরিয়াছে, সে বাঁচিয়াছে, কিন্তু মাধবের মনে যে কি আছে, শুভদা সে তত্ত্ব কিছুতেই নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারে না। আজকাল চিকিৎসার অনেক সুযোগ হইয়াছে; যথাসাধ্য চিকিৎসাও হইতেছে, কিন্তু ফল যে কিছু হইতেছে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। শুভদা একথা ভাবিয়া কপালে করাঘাত করে, ললনার কথা মনে করিয়া আকুলভাবে আপনা-আপনি রোদন করে, আর তাহার নিকট যাইবার কামনা করে; আবার জল আনে, রন্ধন করে, সকলকে খাওয়ায় পরায়—এমনি করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়া চলিতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়া সদানন্দ শুভদার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, ছলনা বড় হয়েচে।

শুভদা মলিন-মুখে বলিল, হাঁ।

আর রাখা যায় না, ভালও দেখায় না।

শুভদা বলিল, মা দুর্গাই জানেন।

সদানন্দ একটু হাসিল; বলিল, মা দুর্গা ত আর বিবাহ দিয়ে যাবেন না!

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

হরমোহনবাবুর ছেলে সারদার সঙ্গে বিবাহ দিলে হয় না!

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না; বলিল, সারদার সঙ্গে?

হাঁ।

তা সম্ভব কি?

অসম্ভবই বা কিসে?

কি জানি! ও-কথাটা শুভদা সম্পূর্ণ হতাশ ভাবেই বলিল।

পাগলা সদানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া লুকাইয়া একটু হাসিয়া লইল; তাহার পর বলিল, এ-বিষয় সারদার নিকট একদিন বলেছিলাম; তার অমত নাই।

শুভদার মুখে আগ্রহের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু তখনই তাহা মিলাইয়া গেল; বলিল, কিন্তু তার পিতা? তাঁর কি মত হবে?

না হবে কেন?

কেন হইবে না তাহা শুভদা বুঝিত, ছেলের ইচ্ছাসত্ত্বেও কেন যে বাপের ইচ্ছা হইবে না তাহাও জানিত, কিন্তু খুলিয়া বলিতে পারিল না। তাহার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কে তাহার পিতার মত করাইতে যাইবে? কিন্তু তাহাও বলিল না, শুধু মৌন-মুখে কাতর নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পাগল সে মৌনভাষাও বুঝিল; বলিল, তাহার পিতার মত আমাদেরই চেষ্টা করে করাতে হবে। কারণ বিবাহ ত দিতেই হবে।

শুভদা ভয়ে ভয়ে, আশায় নিরাশায়, অস্ফুটে বলিল, হবে কি?

নিশ্চয় হবে।

কেমন করে জানলে?

পাগল আবার একটু হাসিল; বলিল, আমি তা জানি। আপনি ভাববেন না, এ মত আমি নিশ্চয় করাব।

বৃদ্ধ হরমোহনের কিরূপে মত করাইতে হইবে সদানন্দ তাহা বিশেষ বিদিত ছিল, মত নিশ্চয় হইবে তাহাও জানিত।

শুভদা কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে দুধ আনিতে গেল; কিন্তু দুধের বাটি হাতে লইয়া অসাবধানে তাহাতে বড় এক ফোঁটা চোখের জল মিশাইয়া ফেলিল। অপ্রতিভভাবে বাহিরে আসিয়া কহিল, সদানন্দ, ব'স, ও-ঘর থেকে দুধটা বদলে নিয়ে আসি।

ও-ঘরে আসিয়া, দুধের কড়ায় হাত রাখিয়া শুভদা আরো একটু কাঁদিয়া লইল, সাবধান হইয়া আরো দুই-চারিটা বড় বড় ফোঁটা মৃত্তিকার উপরে ফেলিল, তাহার পর চক্ষু মুছিয়া দুগ্ধ ঢালিতে লাগিল। শুভদা কাঁদিল বটে, কিন্তু তাহা অন্তর্ভেদী রক্তবিন্দু নহে, বরং অসম্ভব আনন্দাশ্রু; ললনার শোকের এক ফোঁটা জল; স্বামীর বেদনার একবিন্দু বারি।

আহার সমাপন করিয়া সদানন্দ মাঠপানে চলিল। সেখানে তাহার ক্ষেত আছে, কৃষাণ কাজ করে, গরু-বাছুর চরিয়া বেড়ায়—সেখানে সদানন্দ আলের উপর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, একটা অশ্বত্থমূলে বসিয়া দুই-চারিটা কালীনাম করিল, দুই-চারি ছিলিম তামাক পোড়াইল, তাহার পর তথা হইতে উঠিয়া হরমোহনবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ হরমোহন তখন নিদ্রান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, কলিকার তাওয়াটা তখনও তত উত্তপ্ত হয় নাই, একটু একটু ধূম নির্গত হইতেছিল মাত্র।

বৃদ্ধ সদানন্দকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি হে, অনেকদিন যে তোমাকে দেখি নাই?

সদানন্দ বলিল, অনেকদিন কাশীতে ছিলাম।

তা শুনেছিলাম। তোমার পিসিমাতার কাশীপ্রাপ্তি হয়েছে তাও শুনেচি। এলে কবে? ব'স।

সদানন্দ বিলক্ষণ সপ্রতিভভাবে নিকটেই স্থান গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিল। সদানন্দ মুখবন্ধের ধার ধারে না, মিথ্যা আড়ম্বরের ঘটা তাহার ভাল লাগে না; বসিয়াই বলিল, মহাশয়ের নিকট বিবাহের ঘটক হয়ে এসেচি।

হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, কার?

আপনার পুত্রের।

বৃদ্ধ এইবার গম্ভীর হইলেন! বিষয়ী লোক সাংসারিক কথাবার্ত্তার সময় হাসি-তামাসাগুলিকে অনেকদূরে বিদায় দিয়া আসেন। হরমোহনের নিকট তাঁহার পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা একটা গুরুতর বৈষয়িক আলোচনার মধ্যে। এতাবৎ এবিষয়ে তাঁহাকে অনেক মাথা ঘামাইয়া আসিতে হইয়াছে, অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে এরূপ জটিল দেনা-পাওনার চুক্তি-তর্কে রীতিমত বুদ্ধি পরিচালনা না করিতে পারিলে কিছুতেই একটা ন্যায্য মীমাংসায় আসিতে পারা যায় না, এবং পলিতমুণ্ড, মুণ্ডিতশ্মশ্রু ব্যক্তি ভিন্ন যে ঘটকালীর কথা অপর কাহারও মুখেও আসিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। এখন উক্তরূপ গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা একজন বালকের মুখে শুনিয়া বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে হইতে তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন যে, সদানন্দ আরো একটু অধিক বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়াছে, এবং এখন তাহার ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া বিলক্ষণ রুক্ষভাবে এবং যথারীতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কার বিবাহ? সারদার?

আজ্ঞে হাঁ।

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বাটীর ভিতরপানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, ঐদিকে বোধ হয় সারদা আছে, যাও।

তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া একথার অর্থ সদানন্দ বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল, সারদার সহিত আমার প্রয়োজন নাই, আপনার নিকটেই এসেচি।

বৃদ্ধ পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নিকট?

আজ্ঞে হাঁ।

কেন?

এই যে বললাম—আপনার পুত্রের সম্বন্ধ করতে। সারদার কি বিবাহ দেবেন না?

দেব—কিন্তু সে কথা কেন?

প্রয়োজন না থাকলেই কি এসেচি?

তোমার প্রয়োজন ? আমার সহিত ?

আজ্ঞে হাঁ।

কিন্তু তোমার সহিত সে-সব কথা হতে পারে না।

সদানন্দ বুঝিল যে, জগতের এ-শ্রেণীর লোকের নিকট, মুখে একবিন্দু হাসির চিহ্ন-মাত্র থাকিলেও সাংসারিক কোনরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না; মুখখানা তেলো-হাঁড়ির মত না করিতে পারিলে, সে যে দেনা-পাওনা, টাকাকড়ির কথা একবিন্দুও বুঝিতে পারে তাহা এ সম্প্রদায়ের মনুষ্য ধারণার মধ্যেই আনিতে পারে না। তখন সদানন্দ চেষ্টা করিয়া যতখানি পারিল ততখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, হতে খুব পারে। বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের স্বর্গলাভ হয়েছে; সেই অবধি আমিই তাঁর সমস্ত বিষয়ে-আশয় দেখে এসেছি। সাংসারিক কথাবার্ত্তা আমাকেই কইতে হয়; বিবাহের সম্বন্ধ করতে এসে দেনা-পাওনা মীমাংসা করতে হয় তা জানি এবং আশা করি সে-বিষয়ে আপনিও যতটা বুঝবেন, আমিও প্রায় ততটাই বুঝব।

বৃদ্ধ হরমোহনের এই প্রথম বোধ হইল যে, ইহা ঠিক পাগলের মত বলা হয় নাই। একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অবশ্য দেনা-পাওনার মীমাংসা ত একটা করাই চাই।

সদানন্দ হাসি চাপিতে পারে না; তাই আবার একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পূর্ব্বেই মহাশয়কে নিবেদন করেচি যে, সে-সব আমার সহিত হলে বিশেষ ক্ষতি হবে না; তার কোনরূপ একটা মীমাংসা করতেই এসেচি।

হরমোহন একটু নরম হইলেন। বলিলেন, কার কন্যা ? কোথায় ?

এই গ্রামেই। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা।

হারাণের ?

আজ্ঞে হাঁ।

সে কি দেবে ?

আপনি যা চাইবেন তাই।

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া লইলেন; তাহার পর বলিলেন, মেয়েটি দেখতে শুনতে কেমন ?

আপনি তাকে দেখেচেন, কিন্তু বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই; যা হোক, মেয়েটি দেখতে শুনতে আমার বিবেচনায় মন্দ নয়। আপনার পুত্র তাকে দেখেচে—বিবাহ করতেও অনিচ্ছুক নয়।

বৃদ্ধ এবার একটু হাসিল। বলিল, তা হলেই হ'ল। আর আমাদের গৃহস্থ পরিবারে মোমের পুতুলেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই; দেখতে শুনতে নিতান্ত মন্দ না হয় এবং কাজ-কর্ম্ম করতে পারে, এই হলেই হ'ল।

সদানন্দ বলিল, তা পারবে।

কিন্তু হারাণ কি দিতে পারবে? তার অবস্থা তো এখন ভাল নয়।

না, অবস্থা ভাল নয়। তাই বুঝে আপনি যা আদেশ করবেন তাই দেবেন।

বৃদ্ধ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন, উপরোক্ত কথাটা না বলিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিশালী হরমোহন তাহা সহজেই শোধরাইয়া লইয়া বলিলেন, তা কি জান বাপু, মেয়ের বিবাহের কিছু খরচ আছেই।

অবশ্য।

তখন হরমোহন অভ্যাসমত অধরের ক্ষীণহাসিটুকু বিদায় দিয়া পাথরের মানুষটি সাজিয়া বলিলেন, এক সহস্র নগদ মুদ্রার কম সারদার বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না।

সদানন্দ সহাস্যে বলিল, তাই হবে।

সদানন্দর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ত নিজের উপরই চটিয়া গেলেন। আপনাকে একটি অতিশয় বৃহদাকার গর্দ্দভ বলিয়া মনে মনে সম্বোধন করিলেন; কেন দেড় সহস্রের কথা কহিলেন না, এ আপসোস তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। যখন কথা বাহির হইয়া গিয়াছে তখন আর ফিরাইতে পারা যায় না; যাহা হৌক, মন্দের যতটা ভাল হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, অবশ্য মেয়েকে গহনা দিতেই হবে।

হবেই।

দান-সামগ্রী রীতিমত আছেই।

আছেই।

তবে আমারও অমত নাই।

তবে একটা দিন স্থির করে ফেলুন।

বৃদ্ধ একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, অবশ্য এ বিবাহ আপনা-আপনির মধ্যেই, আর হারাণও কিছু আমাদের পর নয়, তবুও নিয়মগুলা সব পালন করে চলতে হবে।

সদানন্দ একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, নিয়ম আবার কি?

নিয়ম এখন কিছুই নয়, তবে লেখাপড়া একটা প্রয়োজন।

বেশ তাই হোক।

কিন্তু কার সঙ্গে হবে?

আমারই সঙ্গে হোক।

কবে?

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, একমাস পরে।

বৃদ্ধ সম্মত হইলেন।

তখন সদানন্দ বলিল, আমার একটি অনুরোধ আছে।

কি বাপু ?

এ দেনা-পাওনার কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তি না শুনতে পায়।

কেন ?

একটু কারণ আছে।

হরমোহন বিষয়ী লোক; সদানন্দর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, নিঃশব্দে দান করতে চাও ?

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া, সেই নিঃস্বার্থ দয়া দেখিয়া হরমোহনেরও সেইসময়ের জন্য লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি রীতিমত বিষয়ী লোক, এ-ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দিলেন না ? একটা শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, বাপু, আমাদের বয়স হয়েচে, এজন্য চক্ষুলজ্জাও ততটা নাই, না হলে হারাণের অবস্থা আমি বিশেষরূপেই জানি। যা হোক, তুমি যখন নিঃশব্দে দান করতে পারচ, তখন আমিও নিঃশব্দে গ্রহণ করতে পারব। সেজন্য তুমি চিন্তা ক'রো না।

সদানন্দ প্রফুল্ল-মুখে নমস্কার করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

৭

শুভদা শুনিল, হারাণবাবু শুনিলেন, ছলনাও শুনিল যে, তাহার সহিত সারদার বিবাহ হইতেছে। এ বিবাহ সদানন্দ ঘটাইয়াছে। শুনিয়া রাসমণি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সদানন্দ পূর্ব্বজন্মে শুভদার পুত্র ছিল। সদানন্দর সমক্ষে একথা বলা হইয়াছিল, সে একথা নিরুত্তরে স্বীকার করিয়া লইল, অতঃপর কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না।

নানা গোলযোগে পড়িয়া তাহার এ-পর্য্যন্ত পিসিমার সম্পত্তি দেখিতে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, এখন সময় পাইয়া একথা সে শুভদাকে জ্ঞাত করিল, শুভদা তাহাতে সম্মত হইল; তখন পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া কিছু দিবসের জন্য শ্রীমান সদানন্দ বিদেশযাত্রা করিল। শুভদার সংসার এখন তাহার সংসার হইয়াছে; সুতরাং ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে ভুলিল না এবং আরো, বিবাহের অপরাপর সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য শুভদাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া সদানন্দ মৃত পিসিমাতার সমস্ত জমি-জমা বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইল, তাহার পর একজন মুরুব্বি স্থির করিয়া এক কথায় তাহাকে সমস্ত বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধ মাসকালের মধ্যেই হলুদপুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হরমোহনের সহিত লেখাপড়া করিল, গহনা গড়াইল, জিনিসপত্র আনাইল, বিবাহের দিন স্থির

করিল, তাহার পর সময় করিয়া সারদাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এতদিন পর্য্যন্ত নিভৃতে তাহার দুটো কথা কহিবার সময় হইয়া উঠে নাই। আজ অনেকদিনের পরে দু'জনেই আপোষে দুটা কথা কহিতে চাহিল, তাই হাত ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরে একস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

উপবিষ্ট হইয়া সারদাচরণ বলিল, সদানন্দ, তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে ?

কতক কতক পড়ে বৈ কি।

মনে পড়ে যখন আমি একজনকে বড় ভালবাসতাম, যখন দিবারাত্রি কেবল ঐকথাই ভাবতাম, তোমার কাছে কত আশা, কত কল্পনা, কত কি বলতাম, অভিমান হ'লে কত কাঁদতাম, আর তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে—না হয় বিদ্রূপ করতে, সে সব কথা তোমার মনে পড়ে সদানন্দ ?

তা আর পড়ে না ? সে ত সেদিনকার কথা, বোধ হয় সাত-আট বৎসরের অধিক হবে না—কিন্তু বিদ্রূপ ত কখন করি নাই।

আমার বোধ হ'ত যেন বিদ্রূপ করতে। যা হোক, তার পর যেদিন সে আমার সব আশা ধূলিসাৎ করে দিল, অভিমানভরে দু'জনেই কথা বন্ধ করে চিরবিদায় নিলাম ; সেদিন কত রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার কাছে বসে কাঁদলাম, সে-কথা তোমার মনে আছে ভাই ?

আছে।

সদানন্দ কিছু অন্যমনস্ক হইল। সারদা কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া অদূরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ঐখানে সে মরেচে।

সদানন্দ সে-কথা শুনিতে পাইল না, আপন-মনে গঙ্গায় একখানা নৌকা সাদা পালভরে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সারদা আবার বলিল, ঐখানে ললনা ডুবে মরেচে।

এবার সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, কোন্‌খানে ?

ঐখানে।

কেমন করে জানলে ?

ঐখানে তার পরিহিত বস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।

সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে চল, কাপড়খানা একবার দেখে আসি।

সারদা অল্প হাসিল ; বলিল, কাপড়খানা কি এখানে আছে ?

তবে চল স্থানটা দেখে আসি।

দু'জনে তখন সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ জল লইয়া চোখ-মুখ ধুইল, তাহার পর পুনর্ব্বার যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

সদানন্দ, আমার বড় অনুতাপ হয়।

কেন?

সময়ে সময়ে বোধ হয় আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।

কেন?

জগদীশ্বর জানেন তার আয়ু শেষ হয়েছিল কিনা, কিন্তু আমার বোধ হয় আমি বিবাহ করলে সে হয়ত এখনও বেঁচে থাকত।

সদানন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, যে মরেছে সে নিশ্চয়ই মরত। তুমি কি করবে?

তা জানি। তবুও যদি তার কথা রাখতাম, যদি বিবাহ করতাম!

সদানন্দ হাসিল; বলিল, জাত যেত যে।

সারদাচরণ তাহা ভাবিল; বলিল, তা যেত।

তবে আর তুমি কি করবে?

সারদার চোখে জল আসিল। বলিল, কি আর করব, কিন্তু এত অনুতাপ হ'ত না।

সদানন্দ অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, ক্রমশঃ সয়ে যাবে।

আহা, যদি তার শেষ অনুরোধটা রক্ষা করতে পারতাম!

কি অনুরোধ?

বলেছিল, একঘর দরিদ্রের জাত বাঁচাও—ছলনাকে বিবাহ কর।

সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, ছলনাকে কি বিবাহ করবে না?

করব, কিন্তু তার অনুরোধ রক্ষা করা হ'ল কি?

কেন হ'ল না?

প্রকারান্তরে হ'ল বটে, কিন্তু—আচ্ছা সদানন্দ, বাবাকে তুমি কি করে সম্মত করালে?

সদানন্দ মৃদু হাসিল; বলিল, বললাম যে তোমার বিবাহ করতে ইচ্ছা আছে।

শুধু এই?

আবার কি?

আমি কি বাবাকে চিনি না?

সদানন্দ আবার হাসিল; বলিল, তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

জিজ্ঞাসা করছি যে কত টাকা দিতে হবে?

সে-কথা শুনে তোমার লাভ নাই।

সদানন্দ, এ যে পাপের ধন!

আশীর্ব্বাদ করব যেন তোমার জীবন চিরসুখে কাটে।

সময় হলে আমি ফিরিয়ে দেব।

দিও। বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া আসিয়া যে স্থানে ললনার বস্ত্র পড়িয়াছিল সে স্থানের মাটি তুলিতে লাগিল।

সারদা বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কি কর! সন্ধ্যাবেলা মাটি তোল কেন?

সদানন্দ খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, পাগলামি করছি।

বাস্তবিক বলিতে কি, সারদাচরণ তাহার কথার সহিত কাজের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইল না; তথাপি বলিল, পাগলামি করছ তা ত বলি নাই।

তুমি বলবে কেন, আমি বলছি।

না না, সত্য বল মাটি নিয়ে কি করবে?

আমি আজকাল শিবপূজা করি; বাড়িতে গঙ্গামাটি নাই তাই নিয়ে যাচ্ছি।

সারদাচরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ মাটি লইয়া একটা তাল পাকাইল, তাহার পর গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া সারদার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চল সারদা বাড়ি যাই।

তুমি ওসব কি করলে?

তা ত চোখেই দেখলে।

কই, শিবপূজার মাটি নিলে না?

না। আর শিবপূজা করব না।

কেন?

আর একদিন বলব।

তখন দুইজনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। বাটী আসিয়া সদানন্দ সে-রাত্রের মত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

রাত্রে আহার করিবার জন্য ছলনা, পিসিমা ক্রমে ক্রমে ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু সে দ্বার খুলিল না। ভিতর হইতে বলিল, আজ তাহার বড় শরীর খারাপ হইয়াছে। শুভদা দেখিতে আসিল, কিন্তু তখন সদানন্দ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া সে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকাল হইলে সে আবার উঠিল, মাঠে গেল, আহার করিতে আসিল, হাসিয়া গান গাহিতে লাগিল, নিত্যকর্ম্ম প্রতিদিন যাহা করে তাহাই করিতে লাগিল; কেহ বুঝিল না যে সে প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে; কাল যেমন ছিল, আজ ঠিক তেমনটি আর নাই। ক্রমে ১৬ই আষাঢ় ছলনার বিবাহের দিন আসিল। আজ সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মনেই উৎসাহ; সদানন্দর বসিবার অবকাশ নাই, হারাণ মুখুয্যের চীৎকারের শেষ নাই, পিসিমার চক্ষুজলের

অর্গল নাই—বাটীতে যে আসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিয়া জানাইতেছে যে, এমন সুখের দিনেও ললনার জন্য তাঁহার মনে একতিল সুখ নাই—বোধ হয় অনেকেই তাঁহার সহিত এ ব্যথা বুঝিতেছে; কেবল শুভদা আজ বড় শ্রান্ত, বড় ধীর।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অনেক বাদ্য বাজিল, অনেক লোক জমা হইল—তাহার পর শুভক্ষণে শুভলগ্নে ছলনাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

আজ গ্রামময় কৃপণ হরমোহনের সুখ্যাতির একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; শত্রুতেও মনে মনে স্বীকার করিল যে, হাঁ, মনটা দরাজ বটে!

মুখের সম্মুখে কেহ তাঁহার গুণগান করিলে, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বৃদ্ধ হরমোহন বলেন, কি আর করি বল, একটি ছেলে বই দুটি নয়, তার ওখানে বিবাহ করতে ইচ্ছা—আমি আর তাতে অমত কেন করব? আর গ্রামের মধ্যে আমরাই ওদের পালটি ঘর—প্রতিবাসীকে একটু দেখতেও হয়। সারদাচরণ এ-কথা শুনিয়া অলক্ষ্যে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

৮

অনেক কাজ ছিল, অনেক কষ্টে তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছে। এখন আরাম করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে বেশ লাগে, কিন্তু দুই-চারিদিন পরে সে আরামটা তেমন করিয়া উপভোগ করিতে পারা যায় না। নিতান্ত আলস্যভাবে নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া থাকিতেও কেমন ব্যাজার বোধ হয়। ছলনাময়ীর বিবাহ দিয়া, লুকাইয়া লুকাইয়া হরমোহনকে বেশ দু'পয়সা ঘুষ দিয়া হত্যাপরাধে ধৃত আসামীর খালাস পাওয়ার মত, বিছানায় পড়িয়া মনে মনে আনন্দে পাশ-বালিশ জড়াইয়া, এ-পাশ ও-পাশ করিয়া গড়াইয়া সদানন্দ দুই-চারিদিন নির্ব্বিবাদে কাটাইয়া দিল, তাহার পর বোধ হইতে লাগিল যে শয্যাটা একটু গরম, বালিশগুলো একটু শক্ত হইয়াছে, ঘরটার ভিতর একটু অধিকমাত্রায় অন্ধকার ঢুকিয়াছে, সদানন্দ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সমস্তদিন ধরিয়া হইতেছিল, তাহা তখনও শেষ হয় নাই; কালো কালো মেঘগুলো ছোটখাট বাতাসে দুই-চারি পা করিয়া মাঝে মাঝে সরিয়া দাঁড়াইতেছে বটে, কিন্তু জল বর্ষাইতে ছাড়িতেছে না—ছাড়িবেও না, সদানন্দ অন্ততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইল, তাহার পর মাথায় ছাতি দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ এ-পথ ও-পথ করিয়া, কাপড় ভিজাইয়া, এক-পা কাদা লইয়া হারাণচন্দ্রের বাটীর ভিতর আসিয়া খাড়া হইল। শুভদা বোধহয় রন্ধনশালায় ছিল, সদানন্দ সেদিকে গেল না; পিসিমাতা

সম্ভবতঃ পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে-খোঁজও সে লইল না। পা ধুইয়া এ-দিক ও-দিক চাহিয়া যে-ঘরে মাধবচন্দ্র শয়ন করিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেকদিন হইতে মাধবচন্দ্রকে আর দেখা হয় নাই, আজ তাহার কথা একটু কহিব। ললনা চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হইয়াছে। নিতান্ত বহুদর্শী বিজ্ঞের মত সকল বিষয়েই সে একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া মতামত প্রকাশ করে, যা তা খাইতে চাহে না, যা তা বিষয়ে বাহানা করে না, অনেক সময় প্রায় কথাই কহে না, নিঃশব্দে দার্শনিকের মত বালিশগুলা এক করিয়া হেলান দিয়া আপন-মনে বসিয়া থাকে, কেহ তাহার নিকট আসুক, আর না আসুক সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। আজও সেইরূপ বসিয়াছিল; সদানন্দ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলে সে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সদাদাদা, তুমি আমার কাছে আস না কেন?

আমার কত কাজ ছিল ভাই।

সব হয়ে গেছে?

হাঁ।

ছোটদিদি কবে ফিরে আসবে?

আর তিন-চারদিন পরে।

দেখ সদাদাদা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলা হয় না—

কেন?

তোমাকে কখন একলা পাই না, তাই হয় না।

সদানন্দ নিকটে বসিল; বলিল, একলা কেন মাধু?

চুপি চুপি তোমাকে বলতে দিদি বলে গিয়েছিল।

কে মাধু?

দিদি; বড়দিদি যে রাত্তিরে চলে গেল—তুমি তখন এখানে ছিলে না-কি-না তাই, তুমি ফিরে এলে তোমাকে বলতে বলে গিয়েছিল যে, দিদি চলে গেছে।

সদানন্দ আরো একটু কাছে আসিয়া, তাহার অঙ্গে হাত দিয়া বলিল, কেন গেল মাধু? কেউ গালাগালি দিয়েছিল?

কেউ না।

তবে কেন গেল?

আমিও যাব।

ছিঃ—

মাধব একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, আর কেউ জানে না। কেবল আমি জানি আর দিদি জানে। সে আগে গেছে—আমার জন্যে সব ঠিক করে আমাকে নিয়ে যাবে, সেখানে দু'জনে খুব সুখে থাকব। মাধবচন্দ্র তাহার মুখখানা অতিরিক্ত

প্রফুল্ল করিয়া আবার একটু হাসিল; তাহার পর ফিরিয়া বলিল, দিদি এসে নিয়ে যাবে।

সদানন্দ বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, কবে?

যবে আমার সময় হবে।

মাধব, এ-সব কথা তোমাকে কে শেখালে?

বড়দিদি।

সে তোমাকে নিয়ে যাবে বলেছিল?

হাঁ—

আর যদি না নিয়ে যায়?

কেন যাবে না? নিশ্চয় যাবে।

যদি না নিয়ে যায়, তা হলে তুমি একা যেতে পারবে কি?

মাধব একটু বিমর্ষ হইল, একটু ভাবিয়া দেখিল; তাহার পর বলিল, কি জানি।

সদানন্দও চুপ করিয়া রহিল। মাধব আবার কহিল, সদাদাদা, সেখানে একলা যাওয়া যায় কি?

যায়। না হলে তোমার দিদি গেল কি করে?

আমিও তবে যেতে পারব?

পারবে।

মাধব আবার একটু ভাবিল, পরে অধিক দুঃখিতভাবে কহিল, কিন্তু কেমন করে যাব—আমার গায়ে আর একটুও জোর নেই! সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে বলিতে লাগিল, দিদি যখন যায় তখন দিদির গায়ে খুব জোর ছিল, কিন্তু আমি কেমন করে যাব; এখন আমি একবার দাঁড়াতেও পারিনে—অত দূর কি যেতে পারব?

সদানন্দর চক্ষে জল আসিল; অন্ধকারে মাধব তাহা দেখিল না। সদানন্দ দেখিতে লাগিল যে মাধবের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, আর কিছুদিন—তাহার পর সব ফুরাইয়া যাইবে। সে ভাবিল শুভদার কথা, সে ভাবিল ললনার কথা, সে দেখিল, সে একটু ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছে, পাঁচজনকে জড়াইয়া লইয়া আর তেমন চিন্তাশূন্য আনন্দে দিনাতিবাহিত হয় না, কালীনামগুলা আর তেমন করিয়া গাওয়া হয় না, তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, তেমন করিয়া আনন্দ করিতে পারে না—সে সুখী ছিল অসুখী হইয়াছে, বিবাগী ছিল সংসারী হইয়াছে। চক্ষের জল মুছিয়া সদানন্দ আজ প্রথম মনে করিল যে, বাঁচিয়া থাকিয়া তেমন সুখ হয় না, যে জীবিত আছে তাহারই কষ্ট আছে, যে মরিয়াছে এ জ্বালার সংসারে সে বাঁচিয়াছে। সে-রাত্রে সদানন্দ অনেক ভাবিল; যাইবার সময় ললনা তাহাকে ভুলিয়া যায় নাই

সে কথা মনে পড়িল; মাধবচন্দ্র মরিতেছে, একথাও স্মরণ হইল; আর শুভদা—তাহার মনে হইল যে, ললনা মরিয়া তাহার যত দুঃখকষ্ট সমস্তই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে।

মাধবচন্দ্রের মনেও সে রাত্রে খুব সুখ ছিল না। মধ্য হইতে তাহার একটা দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিয়াছে। এতদিন সে নিশ্চিন্ত ছিল যে, সময় হইলে ললনা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু সদাদাদা একটু অন্যরূপ বলিয়াছে, তাহার শরীরে আর একটুও সামর্থ্য নাই, সে-স্থলে কেমন করিয়া সে অতদূর যাইতে পারিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অনেক রাত্রে সে নিশ্চয় করিল যে, তাহার দিদি কখন মিথ্যা বলিবে না—যথাসময়ে নিশ্চয় আসিবে। মাধবচন্দ্র তখন অনেকটা শান্তমনে নিদ্রা গেল।

৯

আরো কতদিন কাটিয়া গেল। ছলনা বাপের বাটী ফিরিয়া আসিল, পাড়ার মেয়েরা আর একবার নতুন করিয়া কন্যা-জামাতা দেখিয়া গেলেন, কত হাসি কত তামাসা গড়াইয়া গেল, হরমোহন নিজে এখানে আসিয়া সকলকে মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া বেয়ান-ঠাকুরাণীর নমস্কার গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, হারাণচন্দ্র কোমরে ফর্সা চাদর বাঁধিয়া বামুনপাড়ার প্রত্যেক দোকানে একবার করিয়া বসিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিলেন—এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

আজ মাধবচন্দ্রের পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শয্যার উপর ছটফট করিতেছে এবং পার্শ্বে, শিয়রে, পদতলে পিসিমাতা, কৃষ্ণঠাকুরাণী, ছলনা প্রভৃতি বসিয়া আছে। শুভদা এখানে নাই—সে রন্ধনশালায় বসিয়া কতক রাঁধিতেছে, কতক কাঁদিতেছে, সদানন্দ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে, আর হারাণচন্দ্র 'এই আসিতেছি' বলিয়া ঘণ্টা-তিন হইল বাহির হইয়াছেন, এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছেন; কৃষ্ণঠাকুরাণী মাধবের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় মনে মনে সময় গুনিতেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যার একটু পরে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন, তিনি আজ ছয়-সাত দিবস্ হইতে নিত্য আসিতেছেন, নিত্য দেখিতেছেন, পীড়া কিছুতেই কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে তাহা জানিতেন, বাঁচিবে না তাহাও বুঝিয়াছিলেন। আসিবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু সদানন্দের পীড়াপীড়িতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঘরে আসিয়া ডাক্তারে যাহা দেখে তাহা তিনি দেখিলেন, তাহার পর বাহিরে

আসিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, সদানন্দবাবু, আজ বেশ সাবধানে থাকবেন ; ছেলেটি বোধ হয় আজ রাত্রে বাঁচবে না।

সদানন্দও তাহা জানিত।

অনেক রাত্রে হারাণচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, চোরের ন্যায় কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের বৃত্তান্ত যতটা সম্ভব অবগত হইলেন, তাহার পর দ্বার ঈষৎ খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, এখন কেমন আছে?

কেহ কথা কহিল না। শুধু শুভদা বাহির হইয়া আসিল ; থাবার থালা সম্মুখে রক্ষা করিয়া নিকটে বসিল।

হারাণ বলিলেন, মাধু এখন কেমন?

বোধ হয় ভাল নয়।

ভাল নয়? একটু থামিয়া বলিলেন, আমার শরীরও ভাল নয়।

কি ভাবিয়া তিনি যে একথা বলিলেন, কি মনে করিয়া যে তিনি নিজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করিলেন তাহা বলিতে পারি না এবং ইহাতে সত্যাসত্য কতদূর ছিল তাহাও অবগত নহি—কিন্তু একথা শুভদার কানে প্রবেশ করিল না। হারাণচন্দ্র মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন ; স্ত্রীর নিকট শারীরিক অসুস্থতার কথা কহিয়া তাহার একটা স্নেহময় প্রত্যুত্তর না পাওয়া, তাঁহার নিকট এরূপ অস্বাভাবিক বোধ হইল যে, হারাণচন্দ্র আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করিলেন। তিনি নেশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই সেই সামান্য অপমানাঙ্কুর দুই-চারি মুহূর্তের মধ্যেই মস্তিষ্কের ভিতর বেশ ডালপালা ছড়াইয়া দিল। হারাণচন্দ্র বিরক্তভাবে থালা ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, আর খাব না—শেষে কি মরে যাব? হারাণচন্দ্র উঠিয়া আসিয়া আচমন করিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে শয্যায় যথারীতি শয়ন করিলেন ; মনে মনে বোধ হয় স্থির করিয়া লইলেন যে, তাঁহারও যথেষ্ট অসুখ হইয়াছে।

এদিকে শুভদা হাত ধুইয়া মাধবের নিকটে আসিয়া বসিল দেখিয়া কৃষ্ণঠাকুরাণী বলিলেন, হারাণ কোথায়?

তাঁর শরীর অসুস্থ হয়েচে—শুয়েছেন।

কৃষ্ণঠাকুরাণী একটু মৌন হইয়া রহিলেন ; তাহার পর মৃদু মৃদু বলিলেন, মানুষের মায়া-দয়া থাকে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জাও ত একটু থাকতে হয়।

রাসমণি একথা শুনিয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। কৃষ্ণঠাকুরণী অনেক মুমূর্ষুর পার্শ্বে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অনেক মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ হইল, মাধবের অল্প শ্বাস হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাধব কহিয়া উঠিল, বড় মাথা ধরেচে।

কৃষ্ণপিসিমাতা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া আবার কহিল, বড় পেট কামড়াচ্চে, বড় গা বমি বমি কয়ছে।

সকলে সকলের মুখপানে চাহিয়া দেখিল যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মনের কথা মুখের উপর পড়িতে চেষ্টা করিল।

পুনর্ব্বার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইল—সকলেই মৌন ম্লানমুখে শেষটার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কাতরভাবে মাধব বলিল, বড় তেষ্টা।

পিসিমাতা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। আগ্রহে মাধব সেটুকু সম্পূর্ণ পান করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধে পড়িয়া রহিল।

ক্রমে শ্বাস বাড়িয়া উঠিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিলেন; কৃষ্ণঠাকুরাণী নাড়ি দেখিতে জানিতেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত দেখিয়া সদানন্দকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এবার নীচে শোয়াতে হবে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

রাসমণির কর্ণে একথা প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি অস্ফুটে কাঁদিয়া উঠিলেন—আর দেখ কি সদানন্দ?

ছলনা কাঁদিয়া উঠিল, কৃষ্ণপিসিমাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাধবেরও প্রায়-অচেতন দেহ নীচে নামিয়া আসিল।

বহুক্ষণ পরে মাধব আর একবার হাঁ করিল—কৃষ্ণপিসিমাতা পূর্ব্বের মত তাহাতে আর একটু জল দিলেন। মাধব যেন একটু বল পাইল—একবার চক্ষু চাহিল, তাহার পর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, সদাদাদা,—দিদি এসেছে।

ছলনাময়ী নিকটে বসিয়াছিল, আজ সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই, শিহরিয়া সে জননীর আরো নিকটে ঘেঁসিয়া বসিল; রাসমণির সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আর কিছুক্ষণ পরে, মাধবচন্দ্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল, মাথা নাড়িতে লাগিল—প্রবল শ্বাস হইয়াছে; দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণঠাকুরাণী কাঁদিয়া বলিলেন, আর কেন? সময় হয়েচে—রাসমণি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—পরকালের কাজ কর—তুলসীতলা—

সকলেই তখন উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিলেন। চীৎকার শব্দে হারাণচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাধবকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইতেছে—তিনিও চীৎকার করিয়া পুত্রের শরীর তুলসীতলায় ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন—কাঁদিয়া ডাকিলেন, বাবা—মাধু—

সেও বোধ হয় গোঁ গোঁ করিয়া একবার কহিল, বা—বা!

১০

বিচিত্র হর্ম্ম্যে বিচিত্র কৌচের উপর অপূর্ব্ব সুন্দরী মালতী কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে। নিকটে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত সাইড্-বোর্ডের উপর রৌপ্য শামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে মালতী একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। যে কক্ষে মালতী বসিয়া আছে তাহা অতিরিক্ত গৃহসজ্জায় সজ্জিত। সমস্ত হর্ম্ম্যতল বহুমূল্য বিচিত্র কার্পেটে মণ্ডিত, দেওয়াল নানাবিধ লতা-পাতা ফুলে-ফলে চিত্রিত, তাহার উপর বহুবিধ তস্‌বির, বহুমূল্য অয়েলপেন্টিং, অলিওগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতিতে বিশেষ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আশে-পাশে বহুবিধ দেয়ালগিরি গৃহসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া লাল-নীল-সবুজ নানা বর্ণের আলোকখণ্ড ইতস্ততঃ ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড আয়না—আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া গৃহের উজ্জ্বলতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তৎসংলগ্ন মর্ম্মর-প্রস্তরের মেজ এবং শ্বেত-প্রস্তরের ঝরণা তদুপরি স্থাপিত রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে শ্বেত কৃষ্ণ পীত বর্ণের মনুষ্য-প্রতিকৃতি সে আলোকে জীবন্ত বোধ হইতেছে। এই রাজোচিত হর্ম্ম্যে মালতী—জীবন্ত স্বর্ণ-প্রতিমা—একাকী বসিয়া আছে। কত রূপে যে এ পার্থিব সৌন্দর্য্য সহস্র গুণ বৃদ্ধি করিয়া সে বসিয়া আছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ নয়নে সে শোভা দেখিবার জন্য সেখানে আর কেহ ছিল না, তাই মালতী আপন-মনে পুস্তক পাঠ করিতেছে। পাঠ আর ছাই করিতেছে; ছত্রের পর ছত্র সরিয়া যাইতেছে, পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে, কিন্তু এক বর্ণও মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে না। সে ইতিপূর্ব্বেই বোধ হয় কাঁদিতেছিল, কেননা শুষ্ক জলের দাগ এখনও তাহার কপোলের উপর প্রতীয়মান হইতেছে। এ সুখ-ভবনে সে কেন যে কাঁদিতেছিল তাহা জানি না, কিন্তু কাঁদিতেছিল তাহা নিশ্চয়; এবং সেই কান্নাই থামাইবার জন্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। মালতী নিরাভরণা, মালতী সামান্য বস্ত্র-পরিহিতা, মালতী কাঁদিতেছিল, মালতীর মনে সুখ নাই। পুস্তক বোর্ডের উপর বন্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল, নিঃশব্দে কৌচের বাজুতে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসিয়া রহিল। পুনর্ব্বার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল, এবার তাহা রোধ করিবার প্রয়াস করিল না। কাজেই একটির পর একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু কৌচের মখমল চাদরের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; অত পুরু গালিচার উপর পদশব্দ হয় না, কাজেই এ আগমন মালতী জানিতে পারিল না, সে যেমন কাঁদিতেছিল তেমনই কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরো একটু নিকটে আসিয়া

দাঁড়াইলেন, তাহার পর ডাকিলেন, মালতী!

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল; বলিল, এসো।

সুরেন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিলেন। তাহার দু'টি হাত নিজের হাতে লইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে কহিলেন, আবার কাঁদছিলে?

মালতী হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এইজন্য ইচ্ছা থাকিলেও 'না' বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কেন কাঁদছিলে?

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে তাহার হাত দুটি আরো একটু টিপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃখ এই যে, এত চেষ্টাতেও তোমাকে সুখী করতে পারলাম না, হৃদয়ের সহস্র কামনাতেও তোমার মন পেলাম না।

মালতী একটা উত্তর খুঁজিল, কিন্তু পাইল না, তা ছাড়া আরো একটা কাজ তাহার দ্বারা হইল না। ইতিপূর্ব্বে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যাহাই হোক আর কাঁদিবে না, কিন্তু অশ্রুর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিল না। তাহারা যেমন পড়িতেছিল তেমনই পড়িতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, কি করলে যে একজন সুখী হতে পারে তা মানুষে বুঝতে পারে না এবং দেবতারা পারেন কি-না তাও বলতে পারি না। তৃপ্তির জন্য, সুখের জন্য এ ভবন এমন করে সাজালাম, এ দেবী-প্রতিমা এ ভবনে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করলাম, কিন্তু সুখী হতে পারলাম কি? সুখের কথা ছেড়ে দিই—বোধ হয় আমার অসুখের মাত্রাই বুঝি হয়েচে। যাকে সুখী করতে এত করলাম তাকে একদিনের জন্যও সুখী দেখলাম না, তোমাকে পেয়ে অবধি ও-অধরে একতিলের জন্যও হাসির রেখা দেখলাম না, বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিতান্ত অধীরভাবে সে অশ্রু-মলিন মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন; বলিলেন, মালতী, কতদিন কেটে গেল, কিন্তু কিছুতেই কি তুমি প্রফুল্ল হবে না, কিছুতেই একবার হেসে চাইবে না?

মালতী হাত তুলিয়া চক্ষু মুছিল।

এ সৌন্দর্য্য যে কি, এ রূপে যে কত মুগ্ধ হয়েছি তা প্রকাশ করতে পারি না। মনের সাধে সাজাব বলে কত অলঙ্কার আনলাম, কত বস্ত্র সংগ্রহ করলাম, কিন্তু এক দণ্ডের তরেও তুমি পরলে না। মালতী! তুমি কি আমাকে দেখতে পার না?

মালতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর মস্তক স্থাপিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্র-নাথের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। আদর করিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া গদ-

গদ্গদ স্বরে কহিলেন, তুমি যে আমাকে দেখতে পার না তা বলি না, কিন্তু আমার আরও অনেক কথা মনে হয়—তুমি আমার অপরাধ নিও না—আমার যা মনে হয়—আজ তা বলে যাই—আমার বিশ্বাস তুমি যে পন্থা অবলম্বন করেচ, নীচ স্ত্রীলোকে আত্মসুখের জন্যই সে পন্থা অবলম্বন করে থাকে এবং বস্ত্রালঙ্কার ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য ভিন্ন তাদের সুখ যে আর কিসে আছে তা জানি না, কিন্তু তোমাকে তাদের মত বোধ হয় না, সেইজন্য বুঝতেও পারি না কি করলে তুমি সুখ পাবে। যদি তা হত তা হলে তুমি এতদিনে সুখী হতে, —বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ অল্পক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন; পরে ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, মালতী। তোমার স্বামী জীবিত আছেন কি?

মালতী ক্রোড়ের উপর মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার স্বামী জীবিত নাই।

তবে বল, তোমাকে বিবাহ করলে কী সুখী হও? বল—বল, আমি তাতেও কুণ্ঠিত নই।

এইবার মালতী গড়াইয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল, হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিল, তাহাতে মুখ লুকাইল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তুলিবার চেষ্টা করিলেন না, বুঝিলেন চক্ষের জলে তাহার পদদ্বয় সিক্ত হইতেছে, তথাপি উঠাইলেন না, বরং দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইয়া গেলেন।

বহুক্ষণ গত হইল; তাহার পর ম্লানভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ভগবান জানেন আমার কি হয়েচে। তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবেসেচি, কি ও অতুল রূপে উন্মত্ত হয়েচি তা বলতে পারি না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আমার আর নাই, ভালমন্দ বুঝে দেখবার ক্ষমতা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েচে। তোমার একটি কথার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বুঝি দিতে পারি। ঈশ্বর জানেন, তোমার মন পাবার জন্য মিথ্যা বলচি না, সত্যই বলচি; আমি আত্মবিস্মৃত হয়েচি—যা হবার হবে—তুমি একবার বল, তোমাকে বিবাহ করলেই যদি সুখী হও, তাই করব। জাত, কুল, মান, এত বড় বংশ, কিছুই মনে করব না। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ থামিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, তারপর মালতী, আমাদের মত মানুষের পরিষ্কার পথ পড়ে আছে—যখন সহ্য করতে পারব না, আত্মহত্যা করে নরকের পানে সোজা চলে যাব।

মালতী আর সহ্য করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ও-কথা তুমি ব'ল না। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছিলে, লজ্জা নিবারণ করেছিলে, দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলে—না হলে এখনও বোধ হয় বেঁচে থাকতাম না; আমি নীচ কুৎসিত; কিন্তু অকৃতজ্ঞ হতে পারব না। তোমার দয়া, তোমার স্নেহ এ-জীবনে কখন ভুলব না— এ সকলের প্রতিদান কি আমি এইরূপে দেব?

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিসে প্রতিদান হয় তা ঈশ্বর জানেন,

আমি জানি না। তোমাকে বলব কি, যে যন্ত্রণা, যে অন্তর্দ্দাহ আজ মাসাধিক কালের উপরও ভোগ করে আসচি; মনে দুঃখ করো না, কিন্তু বলতে লজ্জা হয় যে, এত অল্পদিনে স্ত্রীলোকের এরূপে দাস হয়ে পড়েচি; একজন—একজন—তুমি যেই হও—তুমি যেই হও—কিন্তু আমি ত স্বর্গীয় পিতৃপিতামহগণের বংশ-সম্মান লুপ্ত করতে সম্মত হয়েচি।

মালতী সেইরূপ ভাঙা ভাঙা স্বরে কহিল, আমি তোমার দাসীরও দাসী হওয়ার যোগ্য নই—আমি কে যে আমার জন্য এতই সবে—তোমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেবে? আমি আজন্ম দুঃখী—এত করুণা এ-জীবনে কখন পাই নাই। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, যদি শেষ হয়, ঈশ্বর করুন যেন এই আমার শেষ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তাহার পর পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই ত তুমি সুখ পাচ্ছ না।

মালতী চোখে আঁচল দিয়া কহিল, আমরা বড় দরিদ্র।

কিন্তু আমি ত দরিদ্র নই। আমার যা আছে, তোমারও ত তা আছে।

আমি নিজের কথা বলচি না।

তবে কার কথা? তোমার ত কেউ নাই!

ভগবান জানেন এখন আর কেউ আছে কিনা, কিন্তু যখন চলে এসেছিলাম তখন সব ছিল।

সে কি? নৌকাডুবি হয়ে—

সে সব মিছে কথা, নৌকাডুবি আদতে ঘটে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয় একবার মনে হইয়াছিল যে, এ-সকল ছলনা, না সত্য কথা? কিন্তু সে মুখে ছলনা সম্ভব না—সে চক্ষু, সে অশ্রুজলের মধ্যেও যে প্রতারণা, মিথ্যা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাঁহার তাহা বোধ হইল না। কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন, মালতী!

কি?

সব সত্য?

এবার মালতী মুখপানে চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইলেন, স্বহস্তে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, তবে সব কথা খুলে বল।

মালতী ধীরে ধীরে তখন তাঁহার জানুর উপর মাথা রাখিয়া কখন কাঁদিয়া কখন স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, জন্মাবধি দুঃখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েচি, কিন্তু আমাদের সব ছিল। পিতা আমার যথাসাধ্য দেখে-শুনে বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু

দুর্ভাগিনী আমি এক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হলাম—যাঁর সহিত বিবাহ হ'ল তাঁকে বোধ হয় একবারের অধিক দেখতেও পাই নাই। আমি বাপের বাটীতে ছিলাম, সেই অবধি পাঁচ বৎসর প্রায় সেইখানেই থাকলাম। পিতা আমাদের গ্রাম হলুদপুর হতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এক জমিদারের নিকটে কর্ম্ম করতেন। সামান্যই বেতন পেতেন, কিন্তু তাতেই আমাদের একরূপ দুঃখ-কষ্টে চলে যেত। এইসময় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তোমাদের বাড়িতে তখন কে কে ছিলেন?

সবাই ছিলেন—বাবা, মা, পিসিমা, আমরা দুই বোন, আর একটি ছোট ভাই। তার পর চুরির অপরাধে বাবার চাকুরি যায়—সেই অবধি নিত্য ভিক্ষা করে কোনদিন আমাদের আহার হ'ত, কোনদিন হ'ত না। মা সতীলক্ষ্মী ছিলেন—চেয়ে-চিন্তে যা মিলত তাতে অপরাপর সকলকে খাইয়ে মা প্রায় নিত্য উপবাসী থাকতেন; এমন একসঙ্গে তিনদিনও—এই সময় মালতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, বাবা কিন্তু এসব দিকে ফিরেও চাইতেন না। গাঁজা গুলি খেতেন, যেখানে সেখানে পড়ে থাকতেন—হয়ত বা চার-পাঁচদিন ধরে বাড়িতেই আসতেন না।

আমাদের ছোটভাই মাধব প্রায় একবৎসর হতে পীড়ায় ভুগছিল, চিকিৎসা ভিন্ন কিছুতেই আরোগ্য হতে পারছিল না, বোধ হয় এতদিনে সে আর বেঁচেও নেই—এ-সময়ে সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তাহার পর মালতী কৃষ্ণঠাকুরাণীর কথা বলিল, সদানন্দর কথা বলিল, শেষে বলিল ছলনার কথা। মালতী কহিল, ছলনার বিবাহের বয়স হ'ল, কিন্তু দরিদ্র বলে কেউ বিবাহ করতে চাইল না। বিবাহ না হলে, ব্রাহ্মণের ঘরে জাত যায়—আমাদের জাত যায় যায় হ'ল; মা আমার আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। পিতা ফিরেও চাইতেন না, শুধু ভরসা ছিল সদানন্দ, কিন্তু তিনিও তখন দেশে ছিলেন না—কাশীতে তাঁর পিসিমাতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পিতার চাকুরি যাবার পর হইতে ক্রমে ক্রমে এরূপে ছ'মাস কেটে গেল। পাড়া-প্রতিবেশীতে আর কত সাহায্য করবে? সদাদাদা কাশী যাবার সময় যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তাও ফুরিয়ে গেল—এ-সময়ের কথা আর বলতে পারি না—মালতী আবার কাঁদিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথও কাঁদিলেন; কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, আর কাজ নাই—অন্যদিন ব'লো।

মালতী চক্ষু মুছিয়া বলিল, আজই বলি। লোকে আমাকে সুন্দরী বলত, আমি ভাবতাম কলকাতায় গিয়ে উপার্জ্জন করব। একদিন রাত্রে গঙ্গার তীরে এলাম, মনে করলাম তীরে তীরে কলকাতায় যাব—তা হলে বড় কেউ দেখতে পাবে না,

কাকেও পথও জিজ্ঞাসা করতে হবে না। ঘাটে এসে দেখলাম অদূরে একটা প্রকাণ্ড নৌকা পাল ভরে যাচ্ছে, আমি সাঁতার জানতাম, নৌকা দেখে ভাবলাম নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে নৌকার হাল ধরে থাকব। শুনেছিলাম আমাদের দেশ হতে কলকাতা অধিক দূর নয়—তবে ঠিক জানতাম না যে কতদূর। ভাবলাম রাত্রিশেষে নৌকা নিশ্চয় কলকাতায় পৌছবে, আমিও তখন নেমে যাব। জলে পড়লাম, সাঁতার দিয়ে কিছুদূর এলাম - এই সময়ে কাপড়খানা হাতে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে গেল, আমিও প্রায় ডুববার মত হলাম, কিন্তু বহু ক্লেশে অবশেষে সেখানা খুলে ফেললাম, কিন্তু হাত হতে সেটা পিছলিয়ে কোথায় সরে গেল, এইসময় নৌকাখানাও কাছে এসে পড়ল ; আমার হাত-পাও ধরে গিয়েছিল—ভাবলাম আর ফিরে যেতে পারব না—তাই হালটা ধরে ফেললাম। নৌকা চলতে লাগল, আমিও সাহস করে তা ছাড়তে পারলাম না, ভয় হ'ল, তা হলেই ডুবে যাব। এইরূপে বহুদূর চলে এলাম। তখন আর ফিরে যাবারও উপায় ছিল না। অবশেষে স্থির করলাম, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করতে অনেক স্ত্রীলোকেই এসে থাকে, তাদের নিকট বস্ত্রও থাকে—ভিক্ষা করে একটা চেয়ে নেব—বিবস্ত্রা দেখলে স্ত্রীলোকের দয়া হবেই। তার পর সব তুমি জান।

সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, যেজন্য এত করলে এতদিনে তার কোন উপায় করেচ কি ?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তা জানি। আর তাই ভাবচি, যে মুখ ফুটে একটা কথা বলতে পারে না সে কোন্ সাহসে এতটা করেচে।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

মাসে মাসে কত টাকা হলে তাঁদের চলে ?

কুড়ি টাকা।

প্রতি মাসে সেখানে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠিয়ে দিও।

তুমি দেবে ?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন ; বলিলেন, দেবো ; আরো চাও আরো দেবো।

মালতী মনে মনে কহিল—এতদিনে তার জন্ম সার্থক হইল।

তার পরে আর একটা কাজ ক'রো—আমাকে বিবাহ ক'রো—কেননা নরাধম হ'লেও অত শুভ্র হৃদয়ে আমি কলঙ্কের ছাপ লাগাতে দেব না।

মালতী তাঁহার বুকের ভিতর মাথা নাড়িয়া অস্ফুটে কহিল, না—

কেন—না ? তুমি ভাবচ আমার জাত যাবে ; কিন্তু আমি এস্থানের জমিদার, আমার অনেক টাকা—যার টাকা আছে তার জাত শীঘ্র যায় না।

গোলমাল হবে।

হবে। কিন্তু তাও অনেকদিন স্থায়ী হবে না।

বংশ, কুল, মান, সম্ভ্রম?

মালতী! একদিনের জন্যও সে-সকল ভুলতে দাও—জগতে এসে অনেক দ্রব্য পেয়েচি—কিন্তু সুখ কখন পাই নাই; একদিনের জন্য আমাকে যথার্থ সুখী হতে দাও।

কথা শুনিয়া মালতীর ভিতর পর্য্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা চাপিল। ধীরে ধীরে বলিল, আমি তোমার নিকট চিরদিন থাকব।

ঈশ্বর করুন তাই হোক। তুমি চিরদিন থাকবে, কিন্তু আমি পারব কি? তুমি সংসার দেখ নাই, কিন্তু আমি দেখেচি। আমি জানি আমাকে বিশ্বাস নাই। যে প্রেমে তুমি চিরজীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবে, আমি হয়ত কোনদিন তা মাঝখানে ছিন্ন করে পালিয়ে যাব। মালতী! সময় থাকতে আমাকে বেঁধে ফেল।

মালতী ভাল করিয়া সমস্ত শুনিল, অনেকদিনের পর আর একবার স্থির হইয়া ভাবিয়া লইল—তাহার পর অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, বেঁধেছি, পার এ ছিন্ন করো। এর উপর আর বন্ধনের প্রয়োজন নাই।

তোমার নাই, কিন্তু আমার আছে।

থাকুক, কিন্তু বিবাহ হতে পারে না।

কেন, বিধবাকে কি বিবাহ করতে নাই?

বিধবাকে বিবাহ করতে আছে, কিন্তু বেশ্যাকে নাই।

সুরেন্দ্রনাথের সহসা সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—তুমি কি তাই?

নয় কি? নিজেই ভেবে দেখ দেখি।

ছি ছি!—ও-কথা মুখে এনো না—তোমাকে কত ভালবাসি।

সেইজন্যই মুখে আনলাম; না হলে হয়ত বিবাহ করতেও সম্মত হতাম।

মালতী!

কি?

সব কথা খুলে বলবে?

বলব। তুমি ভিন্ন আমার দেহ পূর্ব্বে কেউ কখনও স্পর্শও করে নাই, কিন্তু এক জনকে মনপ্রাণ সমস্তই মনে মনে দিয়েছিলাম।

তারপর?

জাত যাবার ভয়ে সে বিবাহ করলে না।

সে মন-প্রাণ ফিরিলে নিলে কিরূপে?

সে যেরূপে ফিরিয়ে দিল।

পারলে?

মালতী একটু মৌন থাকিয়া কহিল, পূর্ব্বেই বলেচি, আমি বেশ্যা—বেশ্যায় সব পারে।

উঃ—সে কি সদানন্দ ?

না—আর একজন।

তবে তুমি মানুষ চিনতে পার নাই—তাকে বল নাই কেন ? সে তোমাকে ভালবাসত।

সহসা মালতীর সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। সেই পাগলা ক্ষ্যাপা মুখখানা! মালতীর মনে পড়িল, সেই বৃষ্টির দিন ; সে সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে জল আনিতেছিল, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, ভিজিয়া জ্বর হইবার ভয়ে সদানন্দর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনে পড়িল, সেই প্রথম তাহার নিকট অর্থ-সাহায্য পাওয়া ; তাহার পর নিত্য হাতে গুঁজিয়া দেওয়া ; সেই কাশী যাইবার দিন ; সেই বালিশের নীচে একরাশ টাকা দেওয়া ; সেই আরো কত কি ! মনে পড়িল, দুঃখের সময় সেই সহানুভূতি। নিমিষে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু বাহিয়া পড়িবার পূর্ব্বে মালতী তাহা মুছিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কৌচের বাহুতে হেলান দিয়া চক্ষু মুছিয়া অন্য অনেক কথা ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, তার পর ?

কলিকাতায় যাচ্ছিলাম।

তার পর ?

দয়া করে পায়ে স্থান দিয়েচ।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া করিয়াছিলেন, উত্তর শুনিয়া তাহা বুঝিলেন। উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, মালতী, তুমি রত্ন। রত্ন কুস্থানে পেলেও গলায় পরতে হয়।

কে বললে ? যে রত্ন একজন গলায় পরে, অন্য হয়ত তা পায়ে রাখতেও ঘৃণা বোধ করে। তুমি আমাকে চরণে স্থান দিও—আমি রত্ন, তাতেই পরম সৌভাগ্য মনে করব।

সুরেন্দ্রনাথ অল্প হাসিলেন ; বলিলেন, মালতী, আমি ভাবতাম তুমি বোকা, কিন্তু তা তুমি নও—

মালতী অল্প হাসিল। দুঃখে কষ্টে আজ তাহার অধরে প্রথম হাসির রেখা দেখা দিল।

এই সময়ে বাহির হইতে দাসী বলিল, বাবু, অঘোরবাবুর জুড়ি বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন ; অঘোরবাবু ? কিন্তু এ বাগানবাড়িতে কেন ?

তিনি বলে পাঠিয়েচেন বড় দরকার।

সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, মালতী, এখন তবে আসি।

এস। কিন্তু অঘোরবাবু কে?

পরে শুনো।

অঘোরবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রো, তিনি কোথায় বিবাহ করেছেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া ফেলিলেন—কোন পরিচয় আছে নাকি?

বোধ হয় কতক আছে।

১১

জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতে হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে, কিংবা মানুষে সখ করিয়া কাঁদে কিংবা দায়ে পড়িয়া কাঁদে, অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পরে কাঁদিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখন পাইলাম না, না হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া একচোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। আবার ইহাতে বড় আশঙ্কার কথাও আছে, শুনতে পাই ইহাতে নাকি বুক-ফাটা-ফাটি কাণ্ডও বাধিয়া উঠে, অমনি শিহরিয়া শত হস্ত পিছাইয়া দাঁড়াই—মনে ভাবি এ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সহসা গিয়া পড়িব না। অদৃষ্ট ভাল নয়—কি জানি যদি পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে নিজের বুকখানাই ফাটাইয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হয়; এ-ইচ্ছার আমি ঐখানেই ইস্তফা দিয়াছি। তবে কৌতূহল আছে; যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে, আমি উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি; বিবর্ণ, শঙ্কিত-মুখে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি, বুঝি এইবার বা ইহার বুকখানা ফাটিয়া যাইবে দেখিতে পাইব, কিন্তু সে যখন অবশেষে চোখের জল মুছিয়া প্রশান্তভাবে উঠিয়া বসে তখন দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাই। তবে এমন ইচ্ছা করি না যে, তাদের বুকখানা ফাটিয়া যাক, কিন্তু দেখিবার ইচ্ছাও কি জানি কেন এ পোড়া মন হইতে একেবারে ফেলিয়া দিতে পারি না। আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে, মানুষ ভালবাসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার এ অশ্রু-বিসর্জ্জন ভগবান-পদপ্রান্তে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। আপনাকে ভুলিয়া যোগ্যা-

যোগ্য বিবেচনা না করিয়া, পরের চরণে তাহার মত আত্মবলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। লোকে হয়ত পাগল বলে, আমিও ত পূর্ব্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এরূপ পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেল, কবাট বন্ধ করিয়া মালতী ভূমে লুটাইয়া পড়িল, কত যে কাঁদিল তাহা বলিব না; বুঝি সে ভাবিয়া দেখিতেছিল, বাল্যকালের সে ভালবাসা আর এ ভালবাসায় কত প্রভেদ! মালতী আপনা হারাইয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার উপর গভীর কৃতজ্ঞতাও মিশিয়াছে। ছাই নিজের সুখেচ্ছা? তাহার বোধ হইল তাঁহার জন্য হাসিতে হাসিতে সে নিজের প্রাণটাও দিতে পারে।

মালতী বলিতে লাগিল, প্রাণাধিক তুমি—তোমার এক গাছি কেশের জন্য মরিতে পারি, তুমি আমার জন্য কলঙ্কিত হইবে! শুধু আমার জন্য পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিবে—তাহা তুমি সহিবে? আমি অজ্ঞাতকুলশীল, কেহ আমাকে জানে না, কেহ আমাকে চিনে না—আমার লজ্জা নাই, কিন্তু তুমি মহৎ—তোমার কলঙ্ক, তোমার লজ্জার কথা জগৎ-সুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে। লোকে বলিবে, তুমি বেশ্যা বিবাহ করিয়াছে, সমাজে তুমি হীন হইবে, মর্ম্মপীড়া অনুভব করিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। ঘাড় নাড়িয়া মালতী কহিল, তাহা হইবে না। এ বিবাহ কিছুতেই ঘটিতে দিব না।

মালতী স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল, অশ্রু মুছিয়া যুক্তকরে কহিল, ঠাকুর, তুমি জান, এ-জীবনে যত পাপ, যত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু সেদিনে ভুলিও না। জগতে আমার আর স্থান নাই, কিন্তু যদি কখনও সেদিন হয়, যদি কখন স্বামি-স্নেহ হারাইতে হয়—সেদিন তুমি আমাকে লইও—পতিতা হইলেও চরণে স্থান দিও।

সে-রাত্রের মত মালতী সেইখানেই পড়িয়া রহিল। পরদিন হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন না। সমস্তদিন মালতী পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। অনেক রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন, তাঁহার মুখ অপেক্ষাকৃত মলিন ও ক্লিষ্ট দেখিয়া মালতী কিছু শঙ্কিত হইল। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি হাসিয়া বলিলেন, মালতী, সারাদিন বুঝি পথ চেয়ে আছ?

রক্তিম-মুখে মালতী নিরুত্তর রহিল।

কি করি বল? একদিনের জন্যও ত মকদ্দমা মেটে না। যার যত আছে, কষ্টও তার ততখানি আছে।

মালতী বলিল, মকদ্দমা কর কেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন, বলিলেন, করি কেন? তা পরে বুঝবে। আগে

আমার হও—সমস্ত বিষয় নিজের মনে করতে শেখ, তার পর বুঝবে মোকদ্দমা করি কেন?

মালতী মৌন হইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, মালতী, সে-কথা ভেবেছিলে?

কোন্ কথা?

কোন্ কথা? কালকের কথা আজই ভুলে গেলে?

ভুলি নাই, মনে আছে।

তা ত থাকবেই, কিন্তু ভেবে দেখেছিলে কি?

দেখেছি। বিবাহ কিছুতেই হয় না।

হয় না? সে আবার কি?

সে-কথা ত পূর্ব্বেই বলেচি।

বলেচ আমার মাথা আর মুণ্ডু। বিবাহ আমি করবই।

আমি হতে দেব না। একমাসের উপর হ'ল এখানে এসেছি; যদি এতই মনে ছিল তবে পূর্ব্বে করলে না কেন? এখন সবাই জেনেছে তুমি মৃত জয়াবতীর স্থানে আর একজনকে কলকাতা হতে এনেছ।

সুরেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্ক হইলেন, বলিলেন, আমিও তা ভাবছিলাম, হোক গে—আমি—

তা হলে আমি বিষ খাব।

সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে-কথা পরে বোঝা যাবে। আপাতত এখন সাতদিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করব।

তবে সাতদিনের মধ্যেই আমাকে আর দেখতে পাবে না।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন, কোথায় যাবে?

যেখানে ইচ্ছা।

মরবে?

মরব না—কেন না মরতে আমি পারব না। তবে যে-পথে ভেসেছিলাম আবার সেই পথেই ভেসে যাব।

তবু বন্ধন পরবে না?

না।

সেরূপ দৃঢ় স্বর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, মালতী মিথ্যা বলিতেছে না, একটু চিন্তা করিলেন, পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি করবে? এ তোমাদের স্বধর্ম্ম! ভাল, তাই হোক।

মালতী এবার আর কোন উত্তর দিল না। মৌন মুখে এ তিরস্কার সহ্য করিয়া রহিল। বহুক্ষণ ধরিয়া কেহ কোন কথা কহিল না। পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছিলে?

মালতী তখন কাঁদিতেছিল—মাথা নাড়িয়া জানাইল যে পাঠান হয় নাই।

কেন পাঠাও নাই?

মালতী মৌন হইয়া রহিল। এবার তিনি বুঝিলেন যে মালতী কাঁদিতেছে। বলিলেন, হাতে টাকা ছিল না?

না।

কিছুই ছিল না?

না।

এতদিন এসেছে, হাতে কিছুই হয় নাই?

মালতী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না। সুরেন্দ্রনাথ এ প্রশ্ন বৃথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিজেই বেশ জানিতেন যে; তাহার নিকট কিছুই নাই। কিছুক্ষণ পরে হাত ধরিয়া নিকটে আনিলেন, পার্শ্বে বসাইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, সাধ করে এমন লক্ষীছাড়া হয়ে থাকলে আমি কি করব বল? একখানা কাপড় পরবে না, একটা অলঙ্কার অঙ্গে তুলবে না, কি প্রয়োজন, কি ভালবাস, তা কখন মুখ ফুটে বলবে না—আমি আর কি করব বল? তাহার পর পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। এ হতে যা ইচ্ছা পাঠিয়ে দিও—বাকী যা রইল, স্বচ্ছন্দে ব্যয় ক'রো, আর মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু চেয়ে নিও; অল্প হাসিয়া বলিলেন, টাকা জমাতে শিক্ষা কর।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ভুলো না—আজ টাকা পাঠিয়ে দিও।

কেমন করে দেব?

রেজেষ্ট্রী করে দিও।

আমি পারব না। তুমি আর কারো নাম করে পাঠিয়ে দাও।

কেন? ধরা পড়বার ভয় হয়?

হয়।

তবে আমার উকিল অঘোরবাবুকে বলে দিই। তিনি কলকাতায় থাকেন, সেখান হতেই পাঠিয়ে দেবেন।

সেই ভাল। কিন্তু যদি কেউ তাঁর নিকট সন্ধান নিতে আসে—তা হলে?

যেমন বুঝবেন সেইমত উত্তর দেবেন।

না। তাঁকে বারণ করে দিও যেন কোনরূপে তিনি তোমার নাম না প্রকাশ

করেন।

আচ্ছা তাই হবে

১২

জয়াবতী মরিয়াছে, কিন্তু তাহার মা বাঁচিয়া আছে। নারায়ণপুরের কিছু উত্তরে বাসপুর গ্রামে জয়াবতীদের বাটী। সেখানে জয়া ও তাহার জননী থাকিত। কেমন করিয়া যে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত তাহা তাহারাই জানিত। আর শুনিতে পাই গ্রামের দুই-চারিজন মন্দ লোকও তাহা জানে, কিন্তু আমাদিগের তাহা জানিয়া কোন লাভ নাই, শুনিতে বাসনাও নাই। যাক সে কথা। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, তাহার পর জানি না কি উপায়ে জয়াবতী নারায়ণপুরের জমিদার-বাবুর নিজ ভবনের একাংশে স্থান পাইল। যখন সে পাইল, তখন তাহার মাতাও আসিল; তখন দুইজনে ঘরকন্না পাতাইয়া দিল; কিন্তু জয়ার মার অদৃষ্ট ভাল ছিল না, তাই মাস-পাঁচেক যাইতে না যাইতেই মাতা-কন্যার কলহ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে এমন হইল যে, দু'জনে দু'সন্ধ্যা রীতিমত চীৎকার করিয়া উভয়ে উভয়ের মঙ্গল-কামনা এবং আশু সংসার-বন্ধন মুক্ত হইবার বিশেষ প্রার্থনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। এরূপেও দিন কাটিতে লাগিল, আরো ছয় মাস কাটিল। তাহার পর জয়ার মা প্রাসাদ-বাস-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিত্যক্ত পুরাতন ভবনে চলিয়া গেল। বোধ হয় তাহাকে সেখানে যাইতে নিতান্ত বাধ্য করা হইয়াছিল, কেননা যাইবার কালীন সে যেরূপ নির্ম্মমভাবে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে এবং কন্যা ও তাহার বাবুর কল্যাণ ভিক্ষা করিতে করিতে গিয়াছিল তাহা দেখিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে, ইচ্ছাসুখে সে এ আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সেই অবধি সুরেন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল যে, সে মাগী কিছুতেই আর এ-বাড়ি না ঢুকিতে পায়। কিন্তু ফল কিছুই হইত না। সে মাগী আবার আসিত, আবার প্রবেশ করিত। বহুবিধ গালি-গালাজ, শাপশাপান্ত, অশ্রুপাত, বুকে দারুণ চপেটাঘাত, মস্তকের কেশোৎপাটন এবং পরিশেষে ভৃত্যহস্তের 'অর্দ্ধচন্দ্র,' এই লইয়া জয়ার মাকে বাসপুরে ফিরিয়া যাইতে হইত। প্রতি দুইমাস একমাস ব্যবধানে ইহা নিশ্চয় ঘটিত। বোধ হয় ইহাতে ভিতরে ভিতরে তাহার কিছু লাভ ছিল, না হইলে শুধু এইগুলির জন্যই সে এত পরিশ্রম করিয়া এতদূরে আসিত না; সে যেরূপ চরিত্রের লোক ছিল তাহাতে এগুলি আর কোথায় অনেক কম ক্লেশ উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারিত। যাক এ-কথা, এমনও হইতে পারে যে, সে কন্যারত্নকে অতিশয় স্নেহ করিত, এইজন্য বিপথগামিনী হইলেও মায়া

কাটাইতে পারিত না—দেখিতে আসিত। এইরূপে চলিত। তাহার পর যখন সে শুনিল যে, জয়াবতী গঙ্গায় ডুবিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে তখন চীৎকার-শব্দে বাসপুরের অর্দ্ধেক গ্রামবাসীকে আপনার বাটীর সম্মুখে একত্র করিয়া ফেলিল।

বাসপুরে অধিকাংশই ছোটলোকের বাস, সেজন্য অধিকাংশই চাষা-ভূষা লোকের বাটীর বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, আধবয়সী, যুবতী প্রভৃতি দর্শকবৃন্দে জয়ার মার দাওয়া দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল। তখন সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে, বাক্‌শক্তিহীন হইয়া এ কাহিনী শুনিল যে, জয়াবতীর গ্রাম-জোড়া জাহাজখানা প্রায় পাঁচশত দাসদাসীর সহিত কলিকাতার অতল জলতলে মগ্ন হইয়াছে।

তখন জয়ার মা বলিল, যারা দেখেচে, তারা বলেচে যে অত বড় জাহাজ কলকতায় সহরে নেই।

একজন বৃদ্ধা প্রত্যুত্তরে বলিল, তা ত নেই-ই।

একজন আধবয়সী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, কত দাম ছিল?

আর বাছা দামের কি আর লেখা-জোখা আছে?

সে চুপ করিল।

জয়ার মা কহিল, নিজে লাটসাহেব পর্য্যন্ত দেখতে এসেছিল।

যুবতীরা কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল।

নিজে লাটসাহেব পর্য্যন্ত কেঁদে সারা—বাছাকে সবাই ভালবাসত কিনা!

এইখানে জয়ার মা চোখের কোণে অঞ্চলটা রগড়াইয়া লইল। আর শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই মনে মনে প্রার্থনা করিল যে, কি সুকৃতি-বলে পরজন্মে জয়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করা যায়।

জয়ার রূপের কি আদি-অন্ত ছিল? সাক্ষাৎ দুর্গা-প্রতিমে—আহা; কিবা নাক, কিবা চক্ষু, কি ভুরুর ছিরি, কি গড়ন-পেটন, কোনখানে একতিল খুঁত ছিল কি?

যুবতীরা চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, এমন কি দুইজন আধবয়সীও স্বীকার করিল যে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বাবু কি কম ভালবাসতেন? যখন যা বলেচে তখ‍্ই তা পেয়েচে। অত বড় রাজাতুল্য লোকের নজরে পড়া কি সোজা কথা!

এ-কথা মনে মনে প্রায় সকলেই স্বীকার করিল।

আমিও আর বেশিদিন বাঁচব না—এ শোক কি বরদাস্ত হবে?

ইহাতে কাহারও হয়ত সন্দেহ ছিল, কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কেহ ছাড়িল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর কি হ'ল?

তিনি ভাল আছেন; আলাদা জাহাজে ছিলেন কি না তাই রক্ষা পেয়েচেন।

দু'জনে কি তবে আলাদা জাহাজে ছিল?

তা ছিল বই কি, না হলে কুলুবে কেন? লোকজন ত সঙ্গে কম যায়নি।

তাদের কি হ'ল?

আহা! সবাই ডুবেচে।

সে বেলাটা এমনই কাটিল; 'সন্ধ্যা হয়, ঘরকন্নার কাজ পড়ে আছে', 'কি আর করবে বল? তবে এখন আসি'; বলিয়া সকলেই একে একে প্রস্থান করিল। জয়ার মাও একটা যা-তা করিয়া সিদ্ধ পাক করিয়া লইয়া সকাল সকাল দ্বার বন্ধ করিল, আর যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া প্রতিবাসিনীগণের অন্তঃকরণে সেই গ্রামজোড়া জাহাজ আর লাটসাহেব কান্নার কথা জানাইয়া দিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্রই জয়ার মা নারায়ণপুর অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িল। ক্রমে সে নারায়ণপুরে প্রবেশ করিল। সেই পথ, সেই ঘাট, সেই বৃক্ষের শ্রেণী, সেইসব—সমস্ত পরিচিত। জয়ার মার মনে পড়িল যে, এই পথ দিয়াই সে চলিত, আবার এই পথ দিয়াই বক্ষে আঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত। আর সে নাই, তেমন ঝগড়া আর কখনো হইবে না, তেমন করিয়া বুক পিটিতেও আর পাইবে না। শত বেদনায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, সহস্রগুণ চীৎকারে তাহা প্রশমিত করিতে করিতে জয়ার মা চলিল। যাহারা বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তাহাকে শতকর্ম্ম ফেলিয়াও অন্ততঃ একবার জানলার নিকট আসিতে হইল। ক্রমে সুরেন্দ্রবাবুর অট্টালিকা ঐ সম্মুখে। জয়ার কত স্মৃতি তাহাতে মাখান আছে; জয়ার মা আকুলভাবে ক্রন্দনের তোড় আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সম্মুখের গেট দিয়া পূর্ব্বে সে ঢুকিতে পাইত না; কারণ বাবুর নিষেধ ছিল, কিন্তু এমন ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় সে ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিয়া পড়িল যে, দারওয়ান-দিগের তাহাকে বাধা দিতে কিছুতেই সাহস হইল না। সকলেই প্রায় দশহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্রবাবু তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, চীৎকার শব্দে বুঝিলেন জয়ার মা ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল। আসিয়াই সে জয়াবতীকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য অন্ধভাবে এক আবেদন করিয়াই নিকটে উপবেশন করিল, তাহার পর আর এক আবেদন, কথা শেষ না হইতেই পুনঃ পুনঃ শত সহস্র আবেদন, ভিক্ষা প্রার্থনা, কৈফিয়ৎ তলব ইত্যাদি নানাপ্রকারে সুরেন্দ্রনাথকে একেবারে বিহ্বল করিয়া ফেলিল; তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী মস্তক ঠোকন, দারুণ বক্ষাঘাত ও সমুষ্টি কেশাকর্ষণ প্রভৃতি আর যাহা ঘটিল তাহা সম্যক বিস্তারিত বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

সর্ব্বশেষে জয়ার মা এই বলিয়া শেষ করিল যে, তাহার আর একটি পয়সাও থাইতে নাই, এবং দয়া না করিলে হয় সে অনাহারে মরিবে, না হয় এইখানে গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহার জয়াবতী যেখানে গিয়াছে সেইখানেই যাইবে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, যা হবার হয়েচে, এখন কি হলে তোমার চলে?

জয়ার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল, বাবা, আমার সামান্যতেই চলবে—আমি বিধবা, কেউ নাই—কত আমার আর লাগবে?

তবু কত টাকা চাও?

পনের টাকা মাসে পেলেই আমার চলে।

তাই পাবে। যতদিন বাঁচবে, মাসে মাসে কাছারি হতে ঐ টাকা নিয়ে যেও।

তখন জয়ার মা অনেক আশীর্ব্বাদ করিল, অনেক প্রীতিপদ কথা কহিল, তাহার পর প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর তেমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল না, বরং আরো অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। জয়াবতী মরিয়াছে, মা হইয়া সে অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু কিছু সুবিধাও হইয়াছে, যাইবার সময় জয়ার মা এ-কথা মনে করিতে ভুলিল না।

জয়ার মা সুরেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একেবারে চলিয়া গেল না। যেখানে দাসদাসীরা থাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পরিচিত দাসদাসী অনেকেই ছিল, জয়ার মার দুঃখে তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিল, দুই-একজন কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ার মা অনেক গল্প করিল, সুরেন্দ্রবাবুর দয়ার কথাও প্রকাশ করিল; কিন্তু কথায় কথায় ক্রমশঃ যখন সে শুনিল যে, তাহার জয়াবতীর স্থানে আর একজন সদ্য অভিসিক্ত হইয়া আসিয়াছেন, এবং বাবু তাহাকেও বহু সমাদরে বাগানবাটীতে স্থান দিয়াছেন, তখন জয়ার মা অন্য আকৃতি ধারণ করিল। চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল; স্থান কাল বিবেচনাহীন হইয়া সেইখানেই বাগান-বাটীর অধিকারিণীর উদ্দেশ্যে বহুবিধ হীনবাক্য গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রন্দনের ধ্বনি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অদম্য উৎসাহে নবীন করিয়া পুনরায় সেই কেশাকর্ষণ, সেই বুক-চাপড়ানি। দাসদাসীরা ভীত হইল; শান্ত হইবার জন্য অনেক বুঝাইল, শেষে বাবুর ভয় পর্য্যন্ত দেখাইল, রাগ করিয়া বাবু টাকা বন্ধ করিয়া দিবেন তাহাও বলিল, কিন্তু জয়ার মা বহুক্ষণাবধি তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। পরিশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া জয়ার মার হস্ত হইতে বহু ক্লেশে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

পথে আসিয়া জয়ার মা বাগানবাটী অভিমুখে চলিল। কন্যাশোক তাহার চতুর্গুণ উথলিয়া উঠিয়াছে, হিংসানল পঞ্জরে পঞ্জরে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল; তাহার কন্যাকে এ মাগী ডুবাইয়া দিয়া বলপূর্ব্বক সে স্থান অধিকার

করিয়া বসিয়াছে। গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে তখন জয়ার মা বাগানবাটীতে প্রবেশ করিল। যে দাসী সম্মুখে পড়িল তাহার পানে ক্রোধকষায়িত নয়নে চাহিয়া বলিল, সে ডাইনি কোথা?

সে বেচারা নূতন লোক, ভয়ে ভয়ে পিছাইয়া বলিল, ঐ হোথা।

সে যেমন প্রশ্ন করিয়াছিল, তেমনি উত্তর পাইল। সেও প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, জয়ার মাও উত্তরের অর্থ বুঝিতে পারিল না। আর একবার তাহার পানে সেইরূপ চাহিয়া বলিল, কোথা?

সে অঙ্গুলি হেলাইয়া যথেচ্ছা একটা দিক দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। জয়ার মা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখানে কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু এ কি শোভা! কি আসবাব, কি বহুমূল্য সাজ-সজ্জা! সে পূর্ব্বে সুরেন্দ্রবাবুর বাটীতে অনেকদিন ছিল, সেখানে বহু দ্রব্য দেখিয়াছে, কিন্তু এমন কখনও দেখে নাই। যত দেখিতে লাগিল, তত ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সমস্তই জয়াবতীর হইত, আর সেভাবে—হয়ত কোন সময়ে তাহারই বা হইতে পারিত না কি? এইরূপে মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে সে একটা কক্ষে একজন স্ত্রীলোকের দেখা পাইল। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দেখিয়া জয়ার মা একজন পরিচারিকা স্থির করিল; ডাকিয়া কহিল, ওলো, তোদের গিন্নী কোথায়? অস্বাভাবিক কর্কশবচনে সে ফিরিয়া চাহিল। জয়ার মা দেখিল তাহার সামান্য বস্ত্র, গায়ে অলঙ্কারের নামমাত্র নাই, মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; কর্কশ কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল; বলিল, তুমি কে গা?

আমি এইখানে থাকি।

তুমি কতদিন এসেচ?

প্রায় একমাসের কিছু অধিক।

তোমাদের গিন্নী কোথায়? তুমি বুঝি তারি সঙ্গে এসেচ?

স্ত্রীলোকটা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাঁর সঙ্গে কিছু প্রয়োজন আছে কি?

প্রয়োজন আমার ঢের আছে। সেই ডাইনি হারামজাদীর মুণ্ডুটা আজ চিবিয়ে খাব। বলিতে বলিতে তাহার সেই পূর্ব্বভাব, সেই রুক্ষ মুখশ্রী, সেই অমানুষিক চোখের ভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল—জানিস আমি কে? আমি জয়ার মা, আমাকে দেশশুদ্ধ চেনে। হারামজাদী ডাইনী আমার মেয়েকে খেয়েচে—আজ আমি তাকে খাব—খাব—(দন্তে দন্তে ঘর্ষণ) খাব—খাব—খাব—সব শেষ করে তবে যাব।

স্ত্রীলোকটি রুদ্ধশ্বাসে সে আলৌকিক ভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

ওরে হারামজাদী তোকে খাব (বক্ষে চপেটাঘাত)—ওরে আবাগি—শতেক খোয়ারি—ছেনাল—ডাইনি (মস্তকের কেশাকর্ষণ) তোকে খাব—তোকে খাব—

তোকে খাব—মা-কালীর পায়ে বুক চিরে রক্ত দেব—আর এমন মাথা খুঁড়ে হাড় দেব (ভূমিতলে মস্তক ঠোকন)—ওরে আবাগি এমনি করে—এমনি করে (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ)—কই কোথা সে ?

যাহার উদ্দেশে এত হইতেছিল, সেই সুমুখে বসিয়াছিল ; জয়ার মা কিন্তু তাহা জানিত না, জানিলে বোধহয় সেদিন কিছু একটা ঘটিয়া যাইত।

মালতী নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, আপনি চুপ করুন—

আমি চুপ করব? তুই হতভাগী সে-কথা বলবার কে? আমার মেয়েকে খেয়েচে, আর আমি চুপ করে থাকব ? (পুনরায় ভূমিতলে মস্তকাঘাত)

মালতী বুঝিল, অত মোটা কার্পেট না থাকিলে জয়ার মা সেদিন আস্ত মাথা লইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিত না। কহিল, তিনি আজ এখানে নাই।

এখানে নাই ?

না।

আমি কিন্তু এক পাও এখান থেকে নড়ব না—হারামজাদীকে দেখব, খাব—তবে যাব।

মালতী অল্প হাসিয়া বলিল, যাবেন কেন? স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন। কিন্তু অনেক বেলা হ'ল, খাওয়া-দাওয়া ত এখনও আপনার হয় নাই ?

খাওয়া-দাওয়া ? তা তখন একেবারেই করব।

আহা, মেয়ের শোক ? মার প্রাণ যে কি করচে তা আমি জানি।

জয়ার মা ঈষৎ নরম হইল, বলিল, তাই বুঝে দেখ বাছা।

তা কি আর বুঝিনে। কিন্তু কি করবেন বলুন—মুখেও ত কিছু দুটো দিতে হয়, পোড়া পেট ত আর মানে না।

তা সত্যি কথা।

তাই বলচি, এখানেই দুটো যোগাড় করে দিই—

দিবি ? তা দে বাছা।

আহা ! জয়াদিদি আপনার কথা কত বলতেন।

বলত ? তা বলবে বৈকি ! তুই তাকে দেখেচিস ?

আহা—কতদিন একসঙ্গে এলাম—তাঁকে আর দেখিনি ?

তুই বুঝি তার সঙ্গে ছিলি ?

হাঁ, তিনি আমাকে আমার দেশ থেকে তুলে নিয়েছিলেন। কত কথা বলতেন—তার মধ্যে আপনার কথাই বেশী হ'ত।

তা হবে বৈকি ! সে আমার তেমন মেয়ে ছিল না।

তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।

আহা, অমন মেয়েও মরে ! কিন্তু তোদের এ ডাইনী কোত্থেকে উঠল ?

কলকাতা থেকে।

মাগী বুঝি বাবুকে ওষুধ করেচে ?

শুনতে পাই।

কিন্তু আমি তার ওষুধ করা ভেঙে দেব।

দিও—মাগী যেমন—তেমনি শোধ দিয়ে তবে যেয়ো।

তা যাব। মাগী মন্তর-তন্তর কিছু জানে ?

মন্তর-তন্তর ? শুনতে পাই কামিখ্যে থেকে শিখে এসেছিল। মানুষকে ভেড়া করে রাখতে পারে। এই বাবুকে এমনি করেচে যে, ইনি উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন।

জয়ার মার মুখখানা কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্ক-মুখে বলিল, তা মন্তর-তন্তর আমিও জানি।

জানবে না কেন ? তা আজ দুপুরবেলা যখন আসবে তখন দেখিয়ে দেব।

বাণ মারতে জানে ?

জানে বৈকি !

কখন আসবে ?

দুপুরবেলা।

জয়ার মা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল যেন দুপুর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ কিন্তু আমার ঢের বরাত আছে—আজ তবে এখন যাই, কাল আসব। জয়ার মা উঠিয়া দাঁড়াইল।

না, না, আজ এখানে খেয়ে-দেয়ে যান।

বড় দেরি হবে যে।

কিছুই দেরি হবে না।

তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির নে মা। তোর নামটি কি বাছা ?

আমার নাম মালতী।

আহা বেশ নাম।

জয়ার মা তখন নীচে আসিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু আহার করিয়া লইল। মালতী নিকটে বসিয়া দেখিল যে, জয়ার মার আহার তেমন সুবিধা হইল না, উঠিয়া বলিল, তবে এখন যাই মা।

একটা কথা আপনাকে এখনো বলা হয়নি—জয়াদিদির কাছে আমি দশ টাকা ধার নিয়েছিলাম—তা তিনি নেই, এখন আপনি যদি দয়া করে আমাকে ঋণমুক্ত করেন।

জয়ার মা ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি করি?

সেই দশ টাকা আপনি নিন।

আমাকে তুমি দেবে?

হ্যাঁ। মালতী উপর হইতে দশ টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিল।

জয়ার মা অনেকক্ষণ ধরিয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বাছা, তুমি নিশ্চয়ই ভদ্দরঘরের মেয়ে।

মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি দুঃখী লোক।

জয়ার মার চোখের কোণে একটু জল আসিল। বলিল, তা হোক, তবুও তুই ভদ্দরের মেয়ে না হলে—এই দেখ না কেন—তা সত্যি কথাই বলি, আমার জয়ার হাতে এত টাকা ছিল, কিন্তু মা বলে দশ টাকা কখন একসঙ্গে এমন করে হাতে তুলে দেয়নি। জয়ার মা চোখের কোণ মুছিল।

আমরা দুঃখী লোক, কিন্তু ধর্ম্ম ত আছেন।

আছেন; কিন্তু সবাই কি তা জানে?

তা হোক—কাল তবে আসবে?

হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ আসব বৈকি।

আমাদের ঠাকরুণকে তোমার কথা আজ তবে বলে রাখব কি?

হ্যাঁ—তা—না তা আর বলে কাজ নেই। কামরূপ হইতে শিক্ষা করা 'বাণ-মারা' বিদ্যাটা জয়ার জননীর মনে বড় শান্তি দিতেছিল না, মালতী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

জয়ার মা শুষ্ক হইয়া বলিল, তবে এখন আসি, মাঝে মাঝে তোর কাছে আসব এখন।

এসো।

১৩

এ-কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ খুব হাসিয়া বলিলেন, তবে তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেল?

মালতী বলিল, ঝগড়া হবে কেন, বরং বেশ ভাব হয়ে গেল।

তবে ভাব করে নিয়েছ?

নিয়েচি।

কিন্তু ওর নিজের মেয়ের সঙ্গে কখন বনতো না। চিরকাল ঝগড়া ছিল।

তা শুনেচি।

কি করে।

নিজেই মনের দুঃখে আমাকে কিছু কিছু বলেচে। মন-দুঃখের কারণটা কিন্তু মালতী খুলিয়া বলিল না।

প্রথমে বাড়িতে ঢুকেই বুঝি তোমাকে খুব গালাগালি দিয়েছিল?

মালতী হাসিয়া বলিল, আমাকে দেয়নি। যে ডাইনীকে তুমি কলকাতা থেকে এনেচ তাকেই দিয়েছিল।

সে ডাইনি ত তুমিই।

আমি কেন হব? আমি ত কলকাতা থেকে আসিনি।

তা হোক, তবু ত তুমিই সে।

আমাকে সে চিনতেও পারেনি। একটা দাসী মনে করেছিল।

সুরেন্দ্র ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলিলেন, তা ছাড়া অপরে আর কি মনে করতে পারে?

আমিও সেইজন্যে আজ বেঁচেচি—না হলে বোধ হয় আমাকে আস্ত রাখত না।

মেরে ফেলত?

বোধ হয়।

তার পর?

আমি বললাম, সে মাগী এখানে নেই। তাতে বললে যে, সে এলেই তাকে খেয়ে ফেলবে।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিতে লাগিলেন।

তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে ওষুধ করেচে কি না; আমি বললাম, বোধ হয় করেচে, না হলে বাবু উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন কেন?

আমি বুঝি তাই করি?

কর না কি?

আচ্ছা তা দেখচি; তার পর?

তার পর জিজ্ঞাসা করলে যে, সে মন্তর-তন্তর জানে কি না, আমি বললাম, খুব জানে, কামরূপ থেকে শুনতে পাই শিখে এসেচে। বললে, আমিও জানি, কিন্তু বুঝতে পারলাম মনে মনে ভয় পেয়েচে। জিজ্ঞাসা করলে, বাণ মারতে পারে? আমি বললাম, পারে।

সুরেন্দ্রবাবু এবার খুব জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তখন বুঝি পালিয়ে গেল?

হাঁ।

আর কখন এখানে আসবে না?

আসবে বৈ কি। কিন্তু তোমার সে ডাইনের কাছে আসবে না—আসে ত

আমার কাছে আসবে।

যার কাছে ইচ্ছা আসুক, কিন্তু এখন তুমি আমার কাছে এস। কাছে আসিলে হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, মালতী, আর কতদিন এমন করে কাটাবে? এমনধারা বেশ চোখে আর দেখা যায় না।

মালতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, গয়না পরলে কি রূপ বাড়বে?

তোমার রূপের সীমা নাই—যার সীমা নাই তাকে বাড়ানো যায় না, কিন্তু আমার তৃপ্তির জন্যেও অন্ততঃ—

গয়না পরতে হবে?

হাঁ।

পরতে পারি, কিন্তু আগে বল আমাকে গয়না পরাতে তোমার জেদ কেন?

যদি বলি, তা হলে মনে দুঃখ পাবে না?

কিছু না।

তবে বলি শোন; তোমার এ নিরাভরণা মূর্ত্তি বড় জ্যোতির্ম্ময়—স্পর্শ করতেও সময়ে সময়ে কি কেন একটা সঙ্কোচ এসে পড়ে—দেখলেই মনে হয় যেন আমার পাপ-গুলা ঠিক তোমারি মত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। তোমাকে বলতে কি—তোমার কাছে বসে থাকি, কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভয় আমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছে না বলে মনে হয়। আমি তেমন সুখ পাই না—তেমন মিশতে পারি না; তাই তোমাকে অলঙ্কার পরিয়ে একটু ম্লান করে নেব।

মালতী নিঃশব্দে আপনার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল, প্রকাণ্ড দর্পণে তাহা পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও দেখিল। মনে হইল সে বুঝি যথার্থ-ই বড় উজ্জ্বল, বড় জ্যোতির্ম্ময়ী; মনে হইল পুণ্যের অতীত স্মৃতি এখনও বুঝি সে দেহ ছাড়িয়া যায় নাই, পবিত্রতার ছায়াখানি এখনও সে-দেহে বুঝি ঈষৎ লাগিয়া আছে। রাত্রে সহসা নিস্তব্ধ কক্ষে মালতীর ঈষৎ ভ্রম জন্মিল—সে দেখিল, সম্মুখে মুকুরে এক কলঙ্কিত দেবীমূর্ত্তি আর পার্শ্বে জীবনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথের অকলঙ্ক দেবমূর্ত্তি!

বিস্ময়ে আনন্দে মালতী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রনাথ মোহন নটবর-বেশে মালতীর মন্দিরে দেখা দিলেন। গলায় মোটা মোটা ফুলের গোড়ে; জুঁই, বেলা, বকুল, কামিনী প্রভৃতি পুষ্পের একরাশি মালা কণ্ঠ ও বুক ভরিয়া আছে, একহস্তে ফুলের তোড়া, অপর হস্তে মখমল-মণ্ডিত সুন্দর সুগঠন একটা বাক্স; পরিধানে পট্টবস্ত্র, পায়ে জরির জুতা;

হেলিয়া দুলিয়া একেবারে মালতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিল, আজ আবার এ কি?

কি বল দেখি?

তা জানি না।

সুরেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তুমি পূজা কর?

করি।

তবে তোমার বাড়িতে নিশ্চয়ই চন্দন আছে; চন্দন এনে আমাকে সাজিয়ে দাও—আজ আমার বিবাহ!

কার সঙ্গে?

আগে সাজাও, তার পরে শুনো।

মালতী নীচে হইতে চন্দন ঘষিয়া আনিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া বলিল, এখন বল!

তা এখনো বুঝতে পার নি!

তাহার পর গলদেশ হইতে পুষ্পমালা খুলিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহাকে পরাইলেন, মখমল বাক্স হইতে নানাবিধ রত্নজড়িত অলঙ্কার বাহির করিয়া যথাস্থানে যথাক্রমে নিবেশ করিলেন—মালতী জন্মে কখন সেই রূপ দেখে নাই, বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল—সব শেষ করিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, তোমাকে বিবাহ করলাম, এতদিনে তুমি আমার স্ত্রী হলে; আর কোথাও পালাতে পারবে না—যে মালা আজ পরালাম, জন্ম-জন্মান্তরে তা আর খুলতে পারবে না।

উভয়ের চক্ষেই জল আসিল, উভয়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর অশ্রু মুছাইয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, এখন বাড়ি চল—আপনার সংসার আপনি বুঝে নাও—আশীর্ব্বাদ করি এ-জীবনে চিরসুখী হও।

মালতী প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষের জল আজ তাহার বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। শতবার মুছিল, শতবার চক্ষু তিতিয়া উঠিল—কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। সুরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়া বলিলেন, মালতী, আজ পিতা-মাতার কথা মনে হচ্ছে?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

যা ইচ্ছা ছিল তাতে তুমি নিজেই বাদ সাধলে। মনে করেছিলাম, আর এমন করে থাকব না, তোমাকে যখন পেয়েছি তখন প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করব, আর একবার সংসারী হ'ব, তোমার পিতামাতাকে এখানে আনব—লোকে তখন যাই বলুক না কেন—আমি নিজে সুখী হব। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সে আশা এখন দুরাশা।

এখন বাড়ি যাবে?

মালতী বলিল, কোথায়?

যেখানে তোমার বাড়ি—যেখানে আমি থাকি।

এটা কি আমার বাড়ি নয়?

তবে কি সেখানে যাবে না?

না।

আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম।

১৪

দুঃখের দিন দেরি করিয়া কাটে সত্য, কিন্তু তথাপি কাটে, বসিয়া থাকে না। মাধবের মৃত্যুর পর শুভদার দিনও তেমনি করিয়া অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন বর্ষা ছিল, আকাশে মেঘ ছিল, পথে ঘাটে কাদা-পাঁক পিছল ছিল - এখন তাহার পরিবর্ত্তে শরৎকাল পড়িয়াছে। সে মেঘ নাই, সে কাদা-পাঁক পিছল নাই—পথ-ঘাট খট খট করিতেছে। কখন দুই একখণ্ড মেঘ উদ্দেশ্যহীন ভাবে আকাশ বহিয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছে। তখন প্রকৃতির নিত্য ম্লান মুখ, নিত্য চোখে অশ্রু ছিল—এখন সে-সব আর নাই। কখন কখন সে-মুখ ঈষৎ মলিন হয়, দুই-একফোঁটা চোখে জলও আসে দেখিতে পাই, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসে। অতীতের স্মৃতি-জড়িত দুখের শেষ ক্রন্দনটুকুর মত গগনের কোন অনির্দ্দেশ্য কোণ হইতে 'গুড় গুড়' করিয়া কখনো কখনো কাঁদিয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহাতে আর গভীরতা নাই। একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না, একথা প্রকৃতি সতীও যেন কতক বুঝিয়াছে। পরিবর্ত্তন ভিন্ন সংসার চলে না। একথা সকলেই বুঝেন—বুঝে না কেবল শুভদার সৃষ্টিকর্ত্তা! জন্মিয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত! শুভদা এ কথা মনে করিয়া দেখে - আর দেখে শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী। পাড়ার পাঁচজন দেখে - শুভদা ঘাট হইতে স্নান করিয়া যাইতেছে, জলের কলসী কাঁকে লইয়া ধীর মন্থর-গমনে চলিয়া যাইতেছে, গৃহকর্ম্ম করিতেছে—কিন্তু নিত্য ক্ষীণ, নিত্য বিষাদময়ী;

বর্ষীয়সীরা বলে, ছুঁড়ী আর বাঁচবে না—আহা!

সমবয়সিনীরা বলে, এমন অদৃষ্ট যেন শত্রুরও না হয়—আহা!

পিছনে 'আহা আহা' সবাই বলে, কিন্তু সম্মুখে একথা বলিতে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। সকলেই যেন বুঝিতে পারে, এ 'আহা'টা শুভদার সম্বন্ধে খাটে না।

আর একটা অন্য কিছু—যাহা জগতে নাই, যাহা এ পর্য্যন্ত কেহ কখন প্রয়োগ করে নাই—প্রয়োগ করিবার অবকাশও আসে নাই—এমন একটা শব্দ খুঁজিয়া পাইলে যেন বলিবার মত কতকটা হয়। তাহা কেহ কিছু বলে না—শুভদা আসিলে চুপ করিয়া থাকে। স্নান করিবার সময় গঙ্গার ঘাটে ছেলেমেয়েরা জল ছিটায়, গোলমাল করে, হাস্য-কলরবে প্রৌঢ়াদিগের শিবপূজার মন্ত্র ভুলাইয়া দেয়, এমনি অনেক উৎপাত করিতে থাকে, কিন্তু শুভদা যখন নিঃশব্দে ঘাটের সর্ব্বশেষপ্রান্তে কলসী নামাইয়া নিতান্ত অস্পর্শীয়া নীচ জাতীয়ার ন্যায় সসঙ্কোচে জলে নামে, তখন বালকবালিকারাও বুঝিতে পারে যে, এখন আর গোলমাল করিতে নাই, জল ছিটাইতে নাই—এখন চুপ করিয়া শান্তশিষ্ট হইয়া জননীর বা আর কাহারো আপনার লোকের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সে চলিয়া যায়, তখনও কিন্তু তাহারা পূর্ব্বভাব শীঘ্র ফিরিয়া পায় না।

শুভদা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দুঃখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে তাহার বিরক্তি বোধ হয়, সে-সব পুরাতন কথা আলোচনা করিতে লজ্জা করে। বাড়িটা আজকাল সম্পূর্ণ নির্জ্জন হইয়াছে ; ছলনা শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, রাসমণি প্রায় সমস্ত দিন বাটী আসেন না। আর হারাণ মুখুয্যে! তা সে আজকাল ভাল ছেলে হইয়াছে। নিত্য দু'বেলা বাটী আসে, দুই আনা চারি আনা পূর্ব্বের মতো কর্জ্জ চাহিয়া লয়—আবার চলিয়া যায়। শুভদা সমস্ত দুপুরটা রান্নাঘরের মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যা হয়—আবার ওঠে, ঘাটে যায়, প্রদীপ জ্বালে, রন্ধন করে—যত্ন করিয়া একথালা অন্ন বাড়িয়া স্বামীর জন্য রাখিয়া দেয়, সদানন্দকে আহার করায়। আবার সকাল হয়, আবার বিকাল হয়, আবার রাত্রি আসে।

নিত্য যেমন হয় তেমনি শুভদা আজও দ্বিপ্রহরের পরে রন্ধনশালায় শুইয়াছিল। বাহিরে পুরুষকণ্ঠে একজন ডাকিল, মাঠাকরুণ!

শুভদা শুনিতে পাইল, কিন্তু কথা কহিল না। মনে করিল বুঝি আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছে।

সে আবার ডাকিল, বলি মাঠাকরুণ! কেউ বাড়ি আছেন কি?

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কে?

আমি পিয়ন। চিঠি আছে।

শুভদা বড় বিস্মিত হইল—চিঠি কে লিখিবে? কাছে গিয়া বলিল, দাও।

অমনি পাবেন না মাঠাকরুণ, এখানা রেজিষ্টী চিঠি—শ্রীশুভদা দেবীর নামে, তাঁর সই দিতে হবে।

শুভদা রেজেষ্টী অর্থ তেমন বুঝিল না—বলিল, দাও—আমারই নাম শুভদা।

পিয়ন চিঠি বাহির করিল, স্বতন্ত্র একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কহিল, সই দিন।

শুভদা লিখিতে জানিত—বলিল, কালি কলম দাও!

পিয়ন মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, কালি কলম আমি পাব কোথায়? আপনার বাড়ি, বাড়িতে কালি কলম নাই!

শুভদা বলিল, দেখি। তাহার পর উপর নীচে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া ললনার একটা অর্দ্ধভগ্ন দোয়াত পাইল। কালি শুকাইয়া গিয়াছে—জল দিয়া কোনরূপে একরকম করিয়া কালি প্রস্তুত হইল—কিন্তু কলম কোথায়?

হঠাৎ শুভদার মাধবের দপ্তরের কথা মনে পড়িল। উপরের ঘরে এক কোণে একটা ছোট চৌকির উপর বসিয়া মাধব ও ছলনা পাঠ অভ্যাস করিত—ললনা তাহাদের শিক্ষক ছিল। শুভদা উপরে আসিয়া দেখিল—এককোণে সেই চৌকির উপর তেমনিভাবে একটি ছোট কালিলিপ্ত দপ্তর ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডে জড়িত পড়িয়া আছে। শুভদা এদিকে বহুকাল আসে নাই, বহুকাল এদিকে চাহে নাই। এটা ললনার ঘর; ললনা মরার পর পর্য্যন্ত আজ সে প্রথম এ-ঘরে প্রবেশ করিল। দপ্তরখানি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে খুলিল—একখানি ভগ্ন শ্লেট, একখানি অর্দ্ধেক বোধোদয়, একটা ধারাপাত, দুটো কঞ্চির কলম, একটা মুখভাঙা শরের কলম, ছোট ছোট দুটি শ্লেট পেন্সিল, পুরাতন পত্রিকা হইতে কর্ত্তিত গোটা-পাঁচেক ছবি—টপ্ করিয়া একটা মস্ত বড় জলের ফোঁটা শ্লেটের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কলম লইয়া শুভদা আবার সেগুলি তেমনি সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। কারণ এগুলি মাধবের বড় যত্নের দ্রব্য তাহা সে জানিত।

নীচে আসিয়া শুভদা পত্র গ্রহণ করিল। ঘরে গিয়া খুলিয়া দেখিল, একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট। নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে; পিয়নকে ডাকিতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু পিয়ন ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে। বৌমানুষ, চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না; কাজেই নোট লইয়া ফিরিয়া আসিল। শুভদা মনে করিয়াছিল, আর একটু পরে সে আপনিই আসিবে; কিন্তু তাহা হইল না। সেদিনও আসিল না। কিংবা পরদিনও আসিল না। তখন শুভদা এ-কথা সদানন্দকে জানাইল। সদানন্দ দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ভুল হয় নাই। এ-গ্রামে আপনার নামে আর কেউ নাই—হারাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী—তখন এ আপনারই বটে, কিন্তু কলকাতায় কে আপনার আছে?

কলকাতায় আমার কেউ নাই।

পরদিন সদানন্দ ডাকঘরে সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, অঘোরনাথ বসু, উকিল, কলকাতা হতে এ টাকা পাঠিয়েছেন।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, ও নামের কাকেও চিনি না।

তবে?

তুমি উপায় কর।

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, উপায় কি করব? টাকা যদি না নেওয়া মত হয়, তা হ'লে ফিরিয়ে দিন।

বাবা, যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতে পাই নাই, তখনো বোধ হয় এ টাকা নিতাম না। এখন কি দুঃখে টাকা নেবো? এ আমার টাকা নয়, তুমি ফিরিয়ে দাও।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ কহিল, আমি কলকাতায় গিয়ে সন্ধান নেব। এ টাকা এখন আপনি রেখে দিন—যদি ফিরিয়ে দেবার হয় ফিরিয়ে দেব।

তুমি টাকা সঙ্গে নিয়ে যাও—মত অমত নাই—একেবারে ফিরিয়ে দিও। সম্ভব, তিনি আর কারো বদলে আমাকে পাঠিয়েছেন।

যা হয় সেখানে গিয়ে স্থির করব।

তাই ক'রো।

১৫

আপনার প্রশস্ত কাছারি-ঘরে উকিলবাবু শ্রীঅঘোরনাথ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। সম্মুখে টেবিলের অপর পার্শ্বে নারায়ণপুরের সুরেন্দ্রনাথবাবু বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর একরাশি মকদ্দমার কাগজপত্র রহিয়াছে; ব্যস্তভাবে দুইজনে তাহারি তদ্বির করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, অঘোরবাবু, বোধ হয় এ মকদ্দমা আমি জিততে পারব না।

এখনো কিছুই বলা যায় না।

বলা বেশ যায়। ঠিক বুঝচি মকদ্দমা হারতেই হবে।

কিন্তু হাইকোর্টের উপরেও ত বিচারালয় আছে।

আছে, কিন্তু ততদূর যাবার ইচ্ছা নাই।

তবে কি মালপুরের বিষয়টা ছেড়ে দেবেন?

না দিয়ে আর উপায় কি!

বিস্তর আয় কমে যাবে।

হাঁ, প্রায় অর্দ্ধেক কমবে।

অঘোরবাবু মৌন হইয়া রহিলেন। মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কারণ তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে; সুরেন্দ্রবাবুর অনুমানই কালে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। এইসময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, বাইরে একজন আপনার সহিত দেখা

করতে চান।

অঘোরবাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, কে?

চিনি না। দেখে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

তবে বল্‌ গে যা এখন আমার সময় নেই।

কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তিনি যেতে চান না—বলেন বড় দরকার আছে।

অঘোরবাবু আরো একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু সুরেনবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, এ-ঘরেই ডেকে পাঠাব কি?

ক্ষতি কি?

ভৃত্যকে তিনি সেইরূপ অনুমতি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে শিখা, কিন্তু কপালে ফোঁটা তিলক প্রভৃতি কিছুই নাই। অর্দ্ধময়লা উত্তরীয় বসন, সাদা থান পরিধানে, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা উঠিয়াছে; দুইজনেই চাহিয়া দেখিলেন। অঘোরবাবু বলিলেন, বসুন।

ব্রাহ্মণ অদূরে চৌকির উপর স্থান গ্রহণ করিয়া বলিলেন, উকিল বাবু অঘোরনাথ বসু মহাশয়ের—

আমারই নাম অঘোরনাথ।

তবে আপনার নিকটেই প্রয়োজন আছে। যা বলবার এইখানেই বলব কি?

স্বচ্ছন্দে বলুন।

তিনি তখন উত্তরীয়-বস্ত্র হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, এ টাকা শুভদা দেবীকে কি আপনি পাঠিয়েছিলেন?

অঘোরবাবু তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, হাঁ, আমিই পাঠিয়েছিলাম।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হলুদপুরে হারাণ মুখুয্যের বাটীতে শুভদা দেবীকে?

হাঁ, তাই বটে।

কেন?

মনিবের হুকুম।

মনিব কে?

অঘোরবাবু সুরেন্দ্রবাবুর পানে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তা বলতে নিষেধ আছে।

তবে এ টাকা ফিরিয়ে নিন। যাঁকে এটা পাঠিয়েছিলেন, তিনি গ্রহণ করবেন না, আপনাকে তিনি চেনেন না। এবং সম্ভবতঃ আপনার মনিবকেও চেনেন না। আমাকে এখানে সমস্ত সংবাদ নিয়ে নোটখানা ফিরিয়ে দেবার জন্ত পাঠিয়েছেন।

আমরা মনে করেছিলাম আপনি বুঝি ভ্রম করে একজনের স্থানে আর একজনের নাম লিখে ফেলেছিলেন।

অঘোরবাবু হাসিলেন, বলিলেন, এতটা ভ্রম উকিলের হয় না।

না হোক, কিন্তু এখন প্রতিগ্রহণ করুন।

তাও পারি না—মনিবের হুকুম ব্যতীত কিছুই করব না।

তবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে সংবাদ নেবেন, আমি অন্যদিন এসে দিয়ে যাব। তিনি উঠিতেছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আপনা হইতে বলিলেন, মহাশয়ের নাম?

আমার নাম সদানন্দ চক্রবর্ত্তী।

সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন; কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, আপনি এখানে কোথায় আছেন?

কোথায় থাকব তা এখনো স্থির করি নাই, বরাবর এখানেই চলে এসেছিলাম এবং সম্ভবতঃ আজই ফিরে যাব।

সুরেন্দ্রনাথ আঘোরবাবুকে বলিলেন, এখন যাই, রাত্রে আবার আসব। তাহার পর সদানন্দর পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে।

বলুন।

এখানে নয়। আমার বাসা নিকটেই, আপত্তি না থাকে ত চলুন সেখানেই যাই, সমস্ত বলব।

সদানন্দর তাহাতে আপত্তি ছিল না; তখন দুইজনে গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে সদানন্দ কহিল, এর পূর্ব্বে আপনাকে কখন দেখেছি বলে মনে হয় না—কিন্তু—কিন্তু আপনি আমাকে কখনো দেখেছিলেন কি?

না, দেখি নাই। কিন্তু আপনাকে জানি!

কিরূপে?

বাসায় চলুন—সেখানেই বলব।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমিও ব্রাহ্মণ, বেলাও অধিক হয়েছে—আপনি এখানে আহার করলে ক্ষতি কি?

কিছু না।

তাহার পর আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, শুভদা দেবী দরিদ্র নয় কি?

দরিদ্র বটে; তাই ব'লে—

বুঝেছি। তাই বলে দান নেবেন কেন?

কতক তাই বটে। বিশেষ দাতার নাম না জানতে পারলে—

কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? যে দান করেছে, সে-ই বলছে, ভুল-প্রমাদ কিছুই ঘটে

নাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছে।

কে দান করেছে?

ধরুন, এখন অঘোরবাবুই—

অঘোরবাবুর কি অধিকার আছে।

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কিন্তু দান করতে সকলেরি অধিকার আছে।

থাকতে পারে, কিন্তু সকলেই গ্রহণ করে কি?

করে না; কিন্তু যার চলে না সে?

সদানন্দ ঈষৎ বিরক্ত হইল; বলিল, শুভদা দেবীর এরূপ ভিক্ষা না নিলেও চলে।

আজকাল বোধ হয় চলে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে চলত কি?

সে-কথার প্রয়োজন কি? আর আপনি এত জানলেন কিরূপে?

আমি অনেক কথা জানি। হারাণবাবু উপার্জ্জন করেন না—অধিকন্তু আনুষঙ্গিক নানা দোষ আছে—যে আপনার স্ত্রী-পুত্র পরিবার প্রতিপালন করে না, তার সংসার পরের সাহায্য ব্যতীত চলে কি?

সদানন্দ কিছু গোলমালে পড়িল, উপস্থিত কোনরূপ উত্তর করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন, হারাণবাবু এখন কি করেন?

কিছু না।

বুঝেছি। আপনার সাহায্যে তবে তাঁর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়?

ভগবান সাহায্য করেন—আমি দরিদ্র।

ছলনার বিবাহ হয়েছে?

হয়েছে।

কোথায়? কার সঙ্গে?

আমাদের গ্রামেরই—সারদাচরণ রায়ের সঙ্গে।

মাধব কেমন আছে?

সে বেঁচে নাই—অনেকদিন মারা গিয়াছে।

আহা! তার বড় মেয়েটি এখন কোথায়!

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় কিরূপ? সেও ত বেঁচে নাই।

বেঁচে নাই? মরল কিরূপে?

গঙ্গায় আত্মহত্যা করেছিল।

কেমন করে জানলেন? মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল কি?

মৃতদেহ ভেসে উঠে নাই, কিন্তু তার পরিধেয় বস্ত্র গঙ্গাতীরে পাওয়া গিয়েছিল—তাতেই বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে।

সে-বিষয়ে আর কারো সন্দেহ নাই ?

কিছুমাত্র না।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন ; তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আচ্ছা, মনে করুন, যদি এ-টাকা সে-ই পাঠিয়ে থাকে ?

কে ? ললনা ?

ললনা কে ? তার নাম কি ললনা ছিল ?

হাঁ।

আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম, ললনাই বটে। ললনা, ছলনা দুই বোন—না ?

হাঁ।

মনে করুন দেখি, যদি সে এ-টাকা পাঠিয়ে থাকে ?

যে মরেছে, সে ?

হাঁ, সে-ই। গঙ্গাতীরে তার বস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল বলেই যে সে মরেছে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। এখন যদি সে-ই পাঠিয়ে থাকে ?

সদানন্দ বড় বিহ্বল হইল ; কিছুক্ষণ অধোবদনে ভাবিয়া বলিল, সে বেঁচে নাই ; বেঁচে থাকলে পত্র লিখত ?

পত্র লিখতে যদি তার লজ্জা বোধ হয় ?

আমি ললনাকে জানি। লজ্জার কাজ কখনো সে করবে না—জীবিত থেকে কখনো আত্মগোপন করবে না ?

সে মরে নাই—বেঁচে আছে ; সেই-ই টাকা পাঠিয়েচে এবং প্রতি মাসে পাঠাবে।

সদানন্দ আপনার কপাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, আপনার নাম ?

সুরেন্দ্রনাথ রায়।

নিবাস ?

নারায়ণপুর।

আপনি হারাণবাবুর এত কথা কি করে জানলেন ?

ললনা বলেছে।

ললনা বলে কেউ নাই—সে মরেছে।

মরে নাই—সে সুখে আছে।

সে স্বর্গে গিয়েছে—

সুরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিলেন, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান—

আমি যাই—

দাঁড়ান—আর দুটো কথা—

যদি কখনও দেখা হয় বলবেন, সদাদাদা তাকে অনেক অনেক আশীর্ব্বাদ করেছে—

তাঁর মাকে বলবেন—

হাঁ—বলব স্বর্গে গিয়েছে।

সদানন্দ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আর ফিরিল না—আর বসিল না।

সে চলিয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণাবধি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে হইলে বোধ হয় এখন হাসিতেন, কিন্তু আজ চক্ষুকোণে জল আসিয়া পড়িল। এইসময় বাহিরে ভৃত্য ডাকিয়া বলিল, বাবু, গাড়ি সাজাবো?

হাঁ, সাজাও। ছিঃ ছিঃ—এমন বিষও মানুষ ইচ্ছে করে খায়!

১৬

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তথাপি মালতী আপনার কক্ষে বসিয়া "সীতার বনবাস" পড়িতেছে। অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক চোখ মুছিয়াছে, তথাপি পড়িতেছে! আহা! বড় ভাল লাগে—কিছুতেই ছাড়া যায় না!

এইসময় বাহিরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বড় মোটা গলায় কে ডাকিল, ললনা!

মালতী শিহরিয়া উঠিল—হাতের "সীতার বনবাস" নীচে পড়িয়া গেল।

ললনা!

মালতীর বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল, কে?

এবার হাসিতে হাসিতে সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, ললনা!

তুমি?

হাঁ, আমি; কিন্তু তুমি ধরা পড়েছ। নাম জাল করেছিলে কেন?

কৈ?

আবার মিছে কথা? তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া বলিলেন, সমস্ত শুনে এলাম! ললনা ছিলে—মালতী হয়ে বসেছ।

কোথায়?

কলকাতায়।

কলকাতায় আমাকে ত কেউ জানে না।

সেখানে কেউ তোমাকে জানে না বটে, কিন্তু যে জানে সে হলুদপুর হ'তে এসেছিল।

কে?

তোমার সদাদাদা সেই নোট ফিরিয়ে দিতে অঘোরবাবুর নিকট এসেছিলেন।

নোট ফিরিয়ে দিতে ?

হাঁ—

সদাদাদা ?

সে-ই !

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, কথা কও না যে ?

সদাদাদা কেমন আছেন ?

ভাল আছেন। তোমার মা ভাল আছেন—তাঁর অবস্থা এখন আর মন্দ নয়, তাই তোমার দান গ্রহণ করবেন না। সদানন্দবাবু তাঁদের অবস্থা এখন ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আমার নাম ললনা—সে-কথা কেমন করে জানলেন ?

সদানন্দ বলেছেন। তাঁরা সকলে জানেন তুমি জলে ডুবে আত্মঘাতী হয়েছ।

মালতী নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু আমি বলেছি যে তুমি বেঁচে আছ এবং সুখে আছ।

তা কেন বললে ?

তবে কি মিথ্যা বলব ? তুমি বেঁচে আছ, আর আমার বোধ হয় সুখেও আছ —সুখে নাই কি ?

আছি, কিন্তু সে-কথা কি সদানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল ?

না ; আমি আপনি বলেছি এবং তোমার মাকেও একথা বলতে বলেছি !

আমি টাকা পাঠিয়েছিলাম—তাও বলেছ কি ?

বলেছি।

তুমি আমার মাথা খেয়ে এসেচ। সে পাগল, একথা গ্রামময় বলে বেড়াবে। যদি তাদের নিকট মরেই ছিলাম, তবে কেন বাদ সেধে আবার বাঁচালে ?

সুরেন্দ্রনাথ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিলেন ; তাহার পর বলিলেন, যাকে তোমরা পাগল মনে করতে, সে স্বাভাবিক, একতিলও পাগল নয়। হয়ত সে কখন পাগল ছিল, কিন্তু সেদিন তার ফুরিয়ে গিয়েছে। তার দ্বারা হলুদপুরে তুমি কখন বাঁচবে না। তুমি যখন আত্মগোপন করেছ, সে কখন তা প্রকাশ করবে না।

কেমন করে জানলে ?

জেনেছি ! যখন তোমার জীবিত থাকার কথা তোমার মাকে জানাতে বললাম, বললে, ললনা লজ্জার কাজ কখন করবে না, আত্মগোপন কখন করবে না—সে বেঁচে নাই, মরেছে। আমি বললাম, সে সুখে আছে। সে বললে, সে স্বর্গে গিয়েছে। আমি বললাম, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান। বললে, আমি যাই—যদি কখন

তার দেখা পান, বলবেন, সদাদাদা তাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করেছে। মালতী, আমি ঠিক বুঝেছিলাম; যে বিষ আমি খেয়েছি—সে বিষ সেও খেয়েছে। আমার সুধা হয়েছে—তার প্রাণহন্তারক হয়েছে।

মালতী অধোবদন হইয়া শুনিতেছিল; বড় কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু লজ্জা করিতেছিল।

আর একটা সুখবর—তোমার ছলনার বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

মালতী মুখ তুলিয়া বলিল, হয়েচে? কোথায়, কার সহিত?

ঐ গ্রামেই। সারদাচরণ-না কে—তার সহিত।

মালতী বুঝিতে পারিল। মনে মনে তাহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিল, বিবাহ করে তো সে-ই করবে, তা কতকটা জানতাম।

কেমন করে জানলে? পূর্ব্বে হতে কি কথাবার্ত্তা ছিল?

না—কথাবার্ত্তা কিছুই ছিল না—তবে আমি একসময়ে ছলনাকে বিবাহ করতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তখন পিতার ভয়ে বিবাহ করতে স্বীকৃত হন নাই, পরে আমি মরেচি—এই ভেবে দয়া করে বোধ হয় বিবাহ করেচেন।

পিতার ভয় কেন?

তিনি অতিশয় অর্থপিপাসু লোক। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়ে কিছু অর্থলাভ করবেন।

তা বদলাল কেন? তোমার পিতা নিশ্চয়ই অর্থ দিতে পারেন নাই।

সম্ভব। মালতী মনে ভাবিল, যে ভালবাসায় তুমি ধরা দিয়েছ, সারদাচরণের সেই ভালবাসায় সারদাচরণের পিতাও ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিল না।

মালতী চিন্তা করিবার আজ অনেক দ্রব্য পাইয়াছে, তাই বেশী কথা কহিতে ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু মনে পড়িল মাধবের কথা। বলিল, মাধব—তার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে?

সে ভাল আছে।

মালতীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সে-রাত্রে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে জাগিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিল। ভাবিল, সদানন্দ আসিয়াছিল—টাকা ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল; আর তাহাদের প্রয়োজন নাই। আমিও আর পাঠাইব না। তারপর মনে করিল—সারদাচরণ? পূর্ব্বে শত ধন্যবাদ দিয়াছিল, এখন সহস্র ধন্যবাদ তাহাকে মনে মনে দিল—মনে মনে বলিল, তুমি আমার অপরাধ লইও না, তখন তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আর কখন তোমাকে হয়ত দেখিতে পাইব না, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন এ দয়া ভুলিব না। অন্তরে চিরদিন তোমাকে ভক্তি করিয়াছি, চিরদিন করিব।

সে খুঁজিয়া দেখিল, সারদার অস্পষ্ট ছায়া এখনও সে-হৃদয় হইতে পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায় নাই, আজ আরো স্পষ্টিকৃত হইল। মনে মনে বলিল, স্বামী বলেন—সে সদানন্দ; কিন্তু সে সারদা!

১৭

এদিকে সদানন্দ ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথটা সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল। পথে যে-কেহ ডাকিয়া বলিল, দাদাঠাকুর, কোত্থেকে? দাদাঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ। —কোথায় গেছলে? সদানন্দ দাঁড়াইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাড়ি যাচ্চি। তাহার হালের গরু ততক্ষণে একজনের বেগুন-ক্ষেতে ঢুকিয়াছে; সে গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, সদানন্দও পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। সে গরু ফিরাইয়া আনিয়া আপনা-আপনি বলিল, ক্ষেপার মনটা আজ দেখচি বড় ভাল নয়, বেশ লোকটি!

রামুমামা নন্দ ময়রার দোকান-ঘরের চৌকাঠে ঠেস দিয়ে তামাক খাইতেছিলেন, এক-পা ধূলা সদানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, ও সদানন্দ, চার-পাঁচদিন তোমাকে দেখিনি, ছিলে কোথায়?

সদানন্দ না ফিরিয়া পশ্চাৎদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ওখানে।

কোথায়? বামুনপাড়ায়?

হুঁ।

এতদিন ধরে।

হুঁ। সদানন্দ হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

রামুমামা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দূর, কি যে বলে কিছু বোঝা যায় না।

সদানন্দ সে-কথা শুনিল না বা শুনিতে পাইল না, একেবারে শুভদার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নোটখানা নিকটে রাখিয়া বলিল, কোন সন্ধান হ'ল না।

শুভদা বলিলেন, তবে মিথ্যে ক্লেশ পেলে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

শুভদা আবার বলিল, তবে এ-টাকা নিয়ে কি করব?

আপনার যা ইচ্ছা। টাকা আপনার ইচ্ছা হয় বিলিয়ে দিন, না হয় রেখে দিন, যদি কখন সন্ধান পাওয়া যায়, ফিরিয়ে দেবেন।

শুভদা অগত্যা তাহা বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিল।

সদানন্দ বলিল; হারাণকাকা কোথায় ?

শুভদা পার্শ্বের ঘর দেখাইয়া বলিল, শুয়ে আছেন।

কোথাও যান নাই ?

গিয়েছিলেন—এইমাত্র ফিরে এসেছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বড় ঝড়বৃষ্টি করিয়া আসিল। শুভদা সকাল সকাল রন্ধনাদি শেষ করিয়া লইল। হারাণবাবু আহারাদি করিয়া বলিলেন, কিছু পয়সা দাও।

আজ আর কোথাও যেও না; আকাশে মেঘ করে আছে, রাত্রে যদি জল হয় ?

হ'লেই বা।

তা হ'লে ফিরে আসতে কষ্ট হবে।

কিছু না। আজ অনেক কাজ আছে, যেতেই হবে।

কাজ যাহা ছিল শুভদা তাহা জানিত। তথাপি কহিল, আজ একাদশী; ঠাকুরঝির আবার অসুখ হয়েচে—অঘোরে পড়ে আছেন।

হারাণ তাহা শুনিলেন না। ট্যাঁকে পয়সা গুজিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, তালি-দেওয়া চটি-জুতা লইয়া কোঁচা গুঁজিয়া জল-কাদার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন। শুভদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, স্বভাব!

সে যথার্থ-ই অনুমান করিয়াছিল; রাত্রি একপ্রহর না হইতেই আবার বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আজকাল প্রতি রাত্রে শুভদার অল্প অল্প জ্বর হইত; কিন্তু এ-কথা কাহাকেও বলা দূরে থাক্, সে একরূপ নিজেকেই জানিতে দিত না। রাত্রে যখন শীত করিয়া জ্বর আসিত, শুধু তখনই মনে পড়িত।

বৃষ্টি-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল; হাতের নিকটে যাহা পাইল তাহাই টানিয়া গায়ে দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে শুভদার তন্দ্রাবোধ হইল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত-শরীরে তন্দ্রার মোহে শুভদার বোধ হইল, কে যেন দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া জীর্ণ অর্গলটা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার পরেই খট্ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সে চক্ষু চাহিয়া সেই আলোকে দেখিল, একজন লোক কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, তাহার হস্তে বংশের যষ্টি, সমস্ত বদন ও অঙ্গ মসীলিপ্ত, তাহার উপর শাদা শাদা চুনের ফোঁটা। শুভদা শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কে গো।

চুপ! সে বজ্রগম্ভীরস্বরে শুভদা আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সে বার-দুই ঠক্ ঠক্ করিয়া লাঠির আওয়াজ করিয়া শয্যার নিকটে আসিয়া কহিল, তোর বাক্সের চাবি দে। গলাটা বড় মোটা, ভারী। হঠাৎ শুনিলে মনে হয় বুঝিবা সে চেষ্টা করিয়া এরূপ মোটা গলায় কথা কহিতেছে।

শুভদা কথা কহিল না।

সে আবার সেইরূপ স্বরে লাঠিটা আর একবার সানের উপর ঠুকিয়া বলিল, চাবি দে, না হলে গলা টিপে মেরে ফেলব।

এবার শুভদা উঠিয়া বসিল, বালিসের নীচে হইতে চাবির থোলো লইয়া নিকটে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলিল, আমার বড় বাক্সের ডান দিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, তাই নিও—বাঁ দিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে, তাতে যেন হাত দিও না। যেরূপ শান্তভাবে সে কথাগুলি বলিল, তাহাতে বোধ হয় না যে, আর তাহার তিলমাত্রও ভয় আছে।

চুনকালি-মাখা পুরুষ চাবি লইয়া বড় বাক্স খুলিল, বাম দিকে মোটে হস্তনিক্ষেপ করিল না, ডান দিকের খোপ হইতে নোট লইয়া ট্যাকে গুঁজিয়া ফেলিল। শুভদার কথামত সে যেরূপ স্বচ্ছন্দে বাক্স খুলিল এবং ডান দিকের খোপের সন্ধান করিয়া লইল তাহাতে বোধ হয় যেন এ-সকল তাহার বিশেষ জানা-শুনা আছে।

সে চলিয়া যাইবার সময় শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, মৃদু মৃদু কহিল, নোটে বোধ হয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে—একটু সাবধানে ভাঙিও।

পণ্ডিত মশাই

পণ্ডিত মশাই

১

কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, এখন সে-সব কথা স্মরণ করিলেও, সে লজ্জায় দুঃখে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে দু'বছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, মেয়েটিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়; কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা-মায়ের দুর্নাম উঠে, তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্ব্বার বিবাহ দেয়।

কুসুমের মা দুঃখী হইলেও অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিল। সেও রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কণ্ঠী-বদল ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন। তবে ইনি কে, কোন গ্রামে বাড়ি, তাহা একা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না, কুঞ্জও না। তাহার মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কণ্ঠী-বদল ব্যাপারটা সত্য, কিংবা শুধুই রটনা, তাহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না। এত কাণ্ড কুসুমের সাত বৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়। সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে এই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী,—তাহার দেহে রূপ ধরে না। তেমনই গুণ, তেমনই কর্ম্মপটুতা, আবার লেখাপড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি তাহাকে বে-মানান্ দেখাইত না।

এদিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে; তাহার বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধুতি-চাদর এবং কুসুমকে পাঁচ ভরি সোনা ও একশ' ভরি রূপার অলঙ্কার দিতে স্বীকৃত। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা কুসুম সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সে কথা কানেও তোলে না। কেন তাহা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা নাই। ভাই-বোন্ যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতেই কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্রে হর পণ্ডিতের পাঠশালে লিখিয়াছে, খেলধুলা করিয়াছে। আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গী-সাথী। তাই এসব প্রসঙ্গেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে

বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্য-সখীদের অনেকেই তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথির সিন্দূর ঘুচাইয়া আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর-গঙ্গাজল, কেহ সেই মহাপ্রসাদ। ছি, ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এ গ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, দিদি, রাজি হ'। ধরতে গেলে বৃন্দাবনই তোর আসল বর।

কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেরাল পেয়েছ যে, যা-ইচ্ছে হবে, তাই করবে? এই বিয়ে, এই কণ্ঠী-বদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠি-বদল; যাও, ওসব আমার সুমুখে তুলো'না। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী মরেচে, আমি বিধবা।

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে সে কেমন যেন থতমত খাইয়া যায়। তথাপি সে ভাবে আর একরকম করিয়া। সে বড় দুঃখী। এই দু'খানি কুটীর এবং তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র এক-খানি আম-কাঁঠালের বাগান ছাড়া আর তাহার কিছু নাই। অতএব, নগদ এতগুলি টাকা এবং এত জোড়া ধুতি-চাদর তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও, এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কণ্ঠী-বদল তাহাদের সমাজে 'চল' আছে, তাই তাহার মা, ও-কাজ করিয়া গিয়া-ছিল; কিন্তু সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন—কুসুমের স্বামী—যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন কেন যে কুসুম এত বড় সুযোগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছে না, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পায় না। শুধু সমাজের ফৌজদার ও ছড়িদারের মত লইয়া কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে, তারপর এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া একেবারে রাজরাণী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত! এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামায় ঘুন্‌সি, মালা, চিরুণী, কৌটা, সিন্দুর, তেলের মশলা, শিশুদের জন্য ছোট-বড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সূচের কারুকার্য্য, ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়। সমস্তদিন বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোন্‌টির হাতে আনিয়া দেয়। ইহার দ্বারা কেমন করিয়া কুসুম মূলধন বজায় রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না—পারিবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে বৃন্দাবনের সহিত দেখা; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং

কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়িতে ধরিয়া আনিল ; হাত-পা ধুইতে জল দিল এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খাতির করিল। দ্বি-প্রহরে তাহার মা নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা কুঞ্জকে পরিতুষ্ট করিয়া আহার করাইলেন, এবং এত রৌদ্রে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া, হাত-পা ধুইয়া, মুড়ি-মুড়্‌কি চিবাইতে চিবাইতে সেইসব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষে কহিল, হাঁ, একটা গেরস্থ বটে! বাগান, পুকুর, চাষবাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই ;—মা-লক্ষ্মী যেন উথ্‌লে পড়ছেন।

কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া, বৃন্দাবনের মা কি রাঁধিয়াছিলেন এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল, খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রৌদ্দুরে বেরুলে মাথা ধ'রে অসুখ করবে।

কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাহ'লে দাদা বুঝি সারাদিন এই কর্ম্মই ক'রেছ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ?

তাহার দাদাও সহাস্যে জবাব দিল, কি করি বল বোন্! ছেড়ে না দিলে তো আর জোর করে আসতে পারিনে?

কুসুম কহিল, তা'হলে ও গাঁয়ে আর কোন দিন যেও না।

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না ; জিজ্ঞাসা করিল, যাব না কেন?

পথে দেখা হলেই ত ধরে নিয়ে যাবে? তারা বড়লোক, তাদের ক্ষতি নেই ; কিন্তু আমাদের তাহ'লে ত চল্‌বে না দাদা!

ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুণ্ণ হইল।

কুসুম তাহা বুঝিতে পারিয়া, হাসিয়া বলিল, সে-কথা বলিনি দাদা—সে-কথা বলিনি ; দু'একদিনে আর কি লোক্‌সান হবে। তা নয় ; তবে তারা বড়মানুষ আমরা দুঃখী ; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশী মেশামিশি ক'রে?

কুঞ্জ জবাব দিল, আমি তাদের ঘরে ত যেচে যাইনি কুসুম!

তা যাওনি বটে ; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা?

তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা করিস তারাও ত সব বড়লোক, তবে যাস্ কেন?

কুসুম দাদার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, তাদের সঙ্গে ছেলে-বেলা থেকেই খেলা করি ; তা ছাড়া তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়! এখানে আমাদের লজ্জা নেই ; কিন্তু ওদের কথা আলাদা।

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, সেখানেও লজ্জা নেই। মা-লক্ষ্মী তাঁদের দয়া

করেছেন, দু'পয়সা আছে সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক্ অহঙ্কার নেই—সবাই যেন মাটির মানুষ! বৃন্দাবনের মা আমার হাত দু'টি ধরে যেমন করে—

কথাটা শেষ হইল না, মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আবার সেইসব পুরানো কথা! মায়ের নামে ওরা যে এত বড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাদা বুঝি ভুলে বসে আছ!

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তারা একটা কথাও তোলেনি। বদ্ লোকে হিংসে ক'রে বদ্নাম দিয়েছিল।

কুসুম কহিল, তাই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল;—কেমন?

কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাবন বেচারীর একটুও দোষ ছিল না। বরং তার বাপের দোষ ছিল।

কুসুম একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিল, যার দোষই থাক দাদা—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি একশবার সেই সব কথা তুলে? আমি পারিনে আর তর্ক করতে।

কুঞ্জ প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুষ্টস্বরেই বলিল, তুই ত তর্ক করতে পারিস্নে; কিন্তু আমাকে যে সব দিক দেখ্তে হয়! আজ আমি ম'লে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস্?

কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ গম্ভীর-মুখে কহিতে লাগিল, আমি আমাদের মুরুব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেচি, তোর শাউড়ী নলডাঙার বুড়ো বাবাজীর মত পর্য্যন্ত জেনে এসেচে। সবাই খুশী হয়ে মত দিয়েচে, তা জানিস্?

কুসুমের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে, জানি বই কি! বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কণ্ঠী-বদলের কথা লইয়া, তাহাদের সমাজে আলোচনা চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানাজানি চলিতেছে,—এ-সংবাদ তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল; কিন্তু এ-ভাব চাপা দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, এ-বেলা কি খাবে দাদা?

কুঞ্জ বোনের মনের ভাব বুঝিল, সেও মুখ ভারি করিয়া বলিল—কিছু না। আমার ক্ষিদে নেই।

কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু তাহাও সম্বরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া তামাকটা নিঃশেষ

করিয়া হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া ডাক দিল, কুসুম !

কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে সিলাই করিতে বসিয়াছিল—সাড়া দিল, কেন ?

বলি, রাত্তির হচ্ছে না ? রাঁধবি কখন্ ?

কুসুম তথা হইতে জবাব দিল, আজ আর রাঁধবো না।

কেন ? তাই জিজ্ঞেস করচি।

কুসুম চেঁচাইয়া বলিল, আমি একশ বার বকতে পারিনে।

বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চেঁচাইয়া বলিল, জ্বালাতন করিস্‌নে কুসি! অমনধারা করলে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাব, তাবলে দিচ্ছি।

যাও—এক্ষুনি যাও। বাড়ির মধ্যে আমি হাড়ি-ডোমের মত, অমন করে হাঁকা-হাঁকি করতে দেব না। ইচ্ছা হয় যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাও গে।

কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, পোড়ারমুখী, তুই ছোট বোন হয়ে বড় ভাইকে তাড়িয়ে দিস ?

কুসুম বলিল, দিই। বড়ো বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি ?

বোনের মুখের পানে চাহিয়া কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল, কিসে যা ইচ্ছে তাই করলুম শুনি ?

কেন তবে আমাকে না বলে ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে ?

কেন—তাতে দোষ কি হয়েচে ?

কুসুম তীব্রভাবে বলিল, দোষ হয়েচে ? ঢের দোষ হয়েচে। আমি মানা ক'রে দিচ্চি, আর তুমি ওখানে যাবে না।

কুঞ্জ বড় ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, কহিল, তুই কি বড় বোন্ যে আমাকে হুকুম করবি ? আমার ইচ্ছে হলেই সেখানে যাব।

কুসুম তেমনি জোর দিয়া বলিল, না, যাবে না। আমি শুনতে পেলে, ভাল হবে না, বলে দিচ্চি দাদা !

এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, যদি যাই, কি করবি তুই ?

কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—আমাকে রাগিও না বল্‌চি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বলচি।

কুঞ্জ শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, তোর ভয়ে সরে যাব ? যদি না যাই, কি করতে পারিস্ তুই ?

কুসুম জবাব দিল না ; প্রদীপের আলোটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া,

সিলাই করিতে বসিল।

আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'। নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমি একটু জোরে কথা কইলেই—বলিয়া কুঞ্জ থামিল; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া গিয়া হুঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া, গলায় সুর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, আমি যখন বড়, আমি যখন কর্ত্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে। বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোর গলায় হাঁকিয়া কহিল,—চাইনে আমি কারো কথা। একশবার 'না-না' শুনতে আমি চাইনে! আমি যখন কর্ত্তা—আমার যখন বাড়ি—তখন আমি যা ব'লব তাই—বলিয়া সে সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল।

কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল; বলিল, বসে বসে কোঁদল করবে, না যাবে এখান থেকে?

ছোট বোনের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সুমুখে বড় ভাইয়ের কর্ত্তা সাজিবার সখ উড়িয়া গেল। তাহার গলা দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনিভাবে বলিল, দাদা, যাবে কি না?

এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই; চি চি করিয়া বলিল,—বললুম ত, তামাকটা সেজে নিয়েই যাচ্চি।

কুসুম হাত বাড়াইয়া, দাও আমাকে, বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিটখানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, সেটা হুঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্যাকরাদের দোকানে যাচ্চ ত?

কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কুসুম সহজভাবে বলিল, তাই যাও। কিন্তু বেশী রাত ক'র না, আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না।

কুঞ্জ হুঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

২

সেদিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যুক্তি মাত্র করে নাই। সত্যই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উথলাইয়া পড়িতেছিল, অথচ সেজন্য কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলেবেলায় নিজের চেষ্টায় বাঙলা লেখা-পড়া শেখে এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন; বৃন্দাবন একমাত্র সন্তান হইলেও, এইসব অনাসৃষ্ট কার্য্যে পুত্রকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডী-মণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে সে নিজের ইংরেজী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন; তাই কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামে কেহই জানিতে পারে নাই—'বেন্দা বোষ্টম' ইংরাজী শিখিয়াছিল। বছর-পাঁচেক পূর্ব্বে, স্ত্রী-বিয়োগের পর, সে এই লেখাপড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত, সকালে গৃহকর্ম্ম, বিষয়-আশয় দেখিত; এবং দুপুরবেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত। বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, যেজন্য বিয়ে করা তা আমাদের আছে, আর আবশ্যক নেই মা।

মা কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না। এমনই করিয়া বছর-দুই কাটিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ির সুমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম নদী হইতে স্নান করিয়া কলস-কক্ষে ঘরে ফিরিতেছিল, সে তখন সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ-গ্রামের সব বাড়িই সে চিনিত; সুতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিল।

এক সন্তান হইলে মাতাপুত্রে যে সম্বন্ধ হয়, বৃন্দাবন ও জননীর মধ্যে সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, সে কি হয় বাবা? তাদের যে দোষ আছে!

বৃন্দাবন জবাব দিল, তা' হউক মা, তবু সে তোমার বৌ। যখন বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে-কথা ভাবনি কেন?

মা বলিলেন, সে-সব কথা তোমার বাবা জানতেন। তিনি যা ভাল বুঝেছিলেন —করে গেছেন।

বৃন্দাবন অভিমানভরে কহিল, তবে তাই ভাল মা। আমি যেমন আছি তেমনিই থাকি; আমার বিয়ের জন্য তুমি আর পীড়াপীড়ি ক'রো না। বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল হয় নাই—কুসুমকে কোনমতেই সম্মত করান যায় নাই। কুসুমের এত দৃঢ় আপত্তির দুটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ,—সে তাহার নিরীহ, অসমর্থ ও অল্পবুদ্ধি ভাইটিকে একা ফেলিয়া আর কোথাও গিয়াই স্বস্তি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কোনরূপ সামাজিক ক্রিয়া না করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পাইত, হয়ত এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন দাদার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত না। কিন্তু ঐ যে আবার কি-সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, তাহার নিজের বাল্যজীবনের বিস্তৃত ঘটনা, আরও কত কি ব্যাপারের উল্লেখ হইবে, চেঁচামেচি উঠিবে, পাড়ার লোক কৌতূহলী হইয়া দেখিতে আসিবে, তাহার সঙ্গিনী-দের সকৌতুক-দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে উঁকিঝুঁকি মারিবে, শেষে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সোজা ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিবে, হাড়ি-ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া গেল। ছি ছি, এ-সব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে-সব ভদ্রকন্যাদের সহিত সেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, একসঙ্গে একভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র হইলেও আচার-ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোট এ-কথা সে মনে ঠাঁই দিতেও পারে না।

কাল সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিন্দুকের চাবিটা সে দাদার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সরোষে বলিয়াছিল, আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবে না। আজ প্রভাতে নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া দেখিল, দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামাটিও নাই। কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েচে। কল্য-কার ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্যই সে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু কুসুম যাহা

অনুমান করিল তাহা নহে, সে ত্রুটি আর একটা। খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। ঘর-দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া, জল আনিয়া, তবে দাদার জন্য রাঁধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ ভাত খাইয়া ফেরি করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা-আহ্নিকে বসিত। যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছ, গোটা-কয়েক মল্লিকা ও যুই-এর ঝাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিত্য-পূজার ফুল যোগান দিত। ফুল তুলিয়া সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া, সবেমাত্র পূজায় বসিয়াছে,—এমন সময় সদরে কয়েকখানা গো-যান আসিয়া থামিল, এবং পরক্ষণেই একটি প্রৌঢ়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইঁহাকে আর কখনও দেখে নাই, কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, ইনি যেই হ'ন, স্বজাতি।

প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, তুমি আমাকে চেন না মা, তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কই?

কুসুম জবাব দিল, তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরতে বোধকরি দেরি হবে।

আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, দেরি হবে কি গো! কাল সে তার ভগিনী-পতিকে, আরো চার-পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগ্নে হয়—সবাইকে খেতে বলে' এলো—আমিও তাই আজ সকালে বললুম, বৃন্দাবন, গরুর গাড়িটা ঠিক করে আনতে বলে দে বাছা; যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্ব্বাদ করে আসি।

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম বুঝিল ইনি শাশুড়ী। তিনি আসনে বসিয়া, হাসিয়া বলিলেন, কাল খাওয়া-দাওয়ার পর বৃন্দাবন তামাসা করে বললে—আমি এমনিই হতভাগা যে, কুঞ্জদা বড় ভাইএর মত হয়েও, কোনদিন ডেকে এক ঘটি জল পর্য্যন্ত খেতে বললেন না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে—কুঞ্জনাথ হাসতে হাসতে তাই সকলকে নেমতন্ন ক'রে এল—তারা সবাই এল বলে।

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তাঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বৌমা, কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু ব'লে যায়নি!

কুসুম ঘোমটার ভিতর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন, সে বলিয়াই গিয়াছে। তাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তবু ভালো,—তারপর কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, ভয় হয়েছিল,—আমার পাগ্‌লা ছেলেটা বুঝি সব ভুলে বসে আছে! তবে বোধ করি, সে কিছু কিন্‌তে-টিন্‌তে গেছে, এক্ষুনি এসে পড়বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির।

বৃন্দাবন কুঞ্জদা বলিয়া একটা হাঁক দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটি ছেলে—ইহারাই মামাতো ভাই।

তাহার মা বলিলেন, কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা, ঘরের ভিতরে একটা সতরঞ্চি পেতে দাও বাছা—ওরা বসুক।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া, কলি-কাটা হাতে লইয়া তামাক আনিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, ও থাক। তামাক আমরা কেউ খাইনে।

কুসুম কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া এইবার রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ অকস্মাৎ একি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিস 'বাড়ন্ত' হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে স্নানে যাইবার পূর্ব্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ অপরাধ করার পরে, ছোট বোন্‌কে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত যে, সচরাচর মানুষ দুষ্ট মনিবকেও এত করে না। যে বড়লোকদের ঘরে শুধু খাইয়া আসিবার অপরাধে কুসুম এত রাগ করিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায় সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখ ফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস কুঞ্জ কোনমতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই।—পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে, এবং কিছুতেই সে রাত্রির পূর্ব্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াই কুসুম আশঙ্কায় অস্থির

হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সবচেয়ে বিপদ হইয়াছিল, যে সিন্দুকটির ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটি-কয়েক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ হাতেও একটি পয়সা নাই।

এমন নিরুপায়ভাবে মিনিট-পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে; বাস্তবিক, সমস্ত দোষ ত তাহারই। কেন সে তাহার নির্ব্বোধ নিরীহ ভাইটিকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এইসব পরিহাস করিল!—উনি কে যে, দাদা ওকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে?

এই তিন বৎসর কত ছলে, কত উপলক্ষে বৃন্দাবন এ-দিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের মন পাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কতদিন সকাল-সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে বাটীর সম্মুখের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে;—জানে বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে!

কুসুম কাঠের মূর্ত্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী; এখন সে কি উপায় করিবে?

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া, ছেলেদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে-ছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলের চোখ ঘরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি রান্নাঘরের ভিতরে কুসুমের উপর পড়িল—চোখাচোখি হইল, মনে হইল, সে সঙ্কেতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের এক অংশের জন্য তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ড উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। সে বুঝিল, ইহা চোখের ভুল, ইহা অসম্ভব!

দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে—এ হইতেই পারে না। বৃন্দাবন অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখাচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানেই চাহিল। ঠিক তাই! কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল।

দ্রুতপদে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলে আমাকে?

কুসুম তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলিল, হুঁ।

বৃন্দাবন আরো একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কুসুম একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, ভারি চাপা গলায় বলিল, কচ্চি জিজ্ঞেস তোমাকে, আমাদের মত দীনদুঃখীকে জব্দ করে, তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরী বাড়বে?

হঠাৎ এ কি অভিযোগ! বৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম অধিকতর কঠোরভাবে বলিল, জান না, আমাদের কি ক'রে দিন চলে? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাসা করতে গেলে? কেন এত লোক নিয়ে খেতে এলে?

বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, এই নালিশের কি জবাব দিবে; কিন্তু স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশী বিচলিত হয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, শেষে সহজ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কোথায়?

কুসুম বলিল, জানিনে। আমাকে কোনো কথা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।

বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে খেতে দেবার কিছু নেই না কি?

কিছু না; সব ফুরিয়েচে, আমার হাতে টাকাও নাই।

বৃন্দাবন কহিল, এ-গাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমাকে একটা গামছা দাও,—আমি একেবারে স্নান করে ফিরে আসব। মা জিজ্ঞেস করলে ব'লো আমি নাইতে গেছি।—দাঁড়িয়ে থেকো না—যাও।

কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গামছা আনিয়া হাতে দিল।

সেই মাথায় জড়াইয়া লইয়া বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, কুঞ্জদার তুমি বোন্ হও, তাই সে পালাতে পেরেছে; আর কিছু হলে বোধ করি এমন করে ফেলে যেতে পারত না।

কুসুম চুপি চুপি জবাব দিল, সবাই পারে না বটে, কিন্তু কেউ কেউ তাও বেশ পারে। বলিয়াই সে বৃন্দাবনের মুখের প্রতি আড়-চোখে চাহিয়া দেখিল, কথাটা তাহাকে বাস্তবিক কিরূপ আঘাত করিল।

বৃন্দাবন যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এ ভুল হয়ত একদিন ভাঙতেও পারে। ছেলেবেলায় তোমার মায়ের অন্যায়ের জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্যেও তেমনই আমার দোষ নাই। যাক, এ-সব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও—রাঁধ্‌বার যোগাড় কর গে।

রাঁধ্‌বার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা কেটে রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয় বল, তাই দিই গে।

বৃন্দাবন দু-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া এ-কথার জবাব না দিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলতে পার, আমাকে

তা সইতেই হবে; কিন্তু রাগের মাথায় তোমার শাশুড়ীঠাকরুণকে যেন কটু কথা শুনিয়ে দিও না। তিনি অল্পেই বড় আঘাত পান।

কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, আমি জন্তু নই, আমার সে বুদ্ধি আছে।

বৃন্দাবন কহিল, সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশী তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম! মা স্নান করেই চলে এসেচেন, এখনও পূজা-আহ্নিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, আগে সেই যোগাড়টা করে দাও গে। আমি চললুম।

যাও, কিন্তু কোথাও গল্প করতে বসে যেও না যেন।

বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, না। কিন্তু দেরি ক'রে বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্চে। আর একদিনের আশা দাও ত আজ না হয় শীগ্‌গির ক'রে ফিরে আসি।

সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া কুসুম রান্নাঘরের ভিতরে যাইতেছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, আশ্চর্য্য। একবার মনে হ'ল না যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনই শাসন করে এসেচ—ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য্য বাঁধন কুসুম।

কুসুম দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, সে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে যাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথাবার্ত্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্বন্ধে এক নূতন আনন্দে এক নূতন তৃষ্ণায় সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

৩

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটী ফিরিবার সময় বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু-গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বলতে পারিনে। সুখী হও মা! বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে এক জোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া সহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

আজিকার সমস্ত আয়োজন কুসুম গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নির্ব্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইহাতেই তাঁহার হৃদয় আশায়

আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রূ-বধূতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল না মা, পাগ্‌লা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাটীতে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজিও করিতেছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল। সেই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়াই ইহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে বেদীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল এবং কিছুক্ষণ মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই একবার মায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, অমন আবছায়ায় বসে কেন মা?

মা সস্নেহে বলিলেন, তা হোক। আয়, তুই আমার কাছে এসে একটু বোস্।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল।

তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোনদিন সে ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল; যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্রহৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন, এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়াছিল।

খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মা-মরা আমার একফোঁটা বংশধরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক পা নড়তে পারিনে, তাই, আজ মনে হচ্ছে বৃন্দাবন, আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বোঝা নামিয়েচে। তাকে শীগ্‌গীর ঘরে আন্ বাছা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটি নিই—দিন কতক কাশী-বৃন্দাবন করে বেড়াই।

আজ বৃন্দাবনের অন্তরেও আশা ও বিশ্বাসের এমনি স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ-হাস্যে কহিল, সে আসবে কেন মা?

মা নিঃসন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, আসবে বৈ কি! সে এলে তবে ত আমার ছুটি

হবে। আমারই ভুল হয়েছে বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে যাইনি। আসবার সময় নিজের হাতে বালা দু'গাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলুম, বৌমা পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়ালেন। তখন বুঝেছি, আমার মাথার ভার নেমে গেছে। তুই দেখিস্ দিকি, প্রথম যেদিন একটা ভাল দিন পাব, সেইদিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনব।

বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এসে তোমার বংশধরটিকে দেখবে ত?

মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, দেখবে বৈকি! সে ভয় আমার নেই।

কেন নেই মা?

মা বলিলেন, আমি সোনা চিনি বৃন্দাবন। অবশ্য খাঁটি কি-না, এখন বলতে পারিনে, কিন্তু পেতল নয়, গিলটি নয়, এ-কথা তোকে আমি নিশ্চয় বলে দিলুম। তা নইলে আমার এমন সংসারে তাকে আনবার কথা তুলতুম না। হাঁরে বৃন্দাবন, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা কন?

কোনদিন নয় মা। তবে আজ বোধ করি বিপদে পড়েই,—বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া চুপ করিল।

মা একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনই। মানুষ বিপদে পড়লেই তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়েমানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায়নি, তোকেই জানিয়েচে।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী করা, বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, সে বেশ লোক, পাড়া-শুদ্ধ নেমন্তন্ন করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল—তার পর যা হয় তা হোক্।

বৃন্দাবনও নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, শুনলুম, বৌমাকে সে ভারি ভয় করে—বড় ভাই হয়েও ছোট ভাইটির মতই আছে। এক-একজন রাশভারি মানুষ আছে বৃন্দাবন, তাদের ভয় না করে থাকার জো নেই—তা বয়সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই, যে ভার দিলে ভার সইতে পারবে। তবেই ত আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া তখনি বলিয়া উঠিলেন, একটি দিনের দেখায় তাকে কি যে ভালবেসেচি, তা আমি তোকে মুখে বলতে পারব না—সারা সন্ধ্যেবেলাটা কেবল মনে হয়েছে, কতক্ষণে ঘরে নিয়ে আসব, আবার কতক্ষণে দেখব।

বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল, সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কুঞ্জদার কথা কি বলছিলে মা ?

মা বলিলেন, হাঁ, তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে তুই গোপালকে গাড়ি আনতে বলে দিস্, আমি একবার নলডাঙ্গায় যাব। ওখানে গোকুল বৈরাগীর মেয়েকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখতে শুনতেও মন্দ না, তা ছাড়া—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, তা ছাড়া ঐ এক মেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয়-আশয় রেখে মরেচে, না মা ?

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, সে-কথা সত্যি বাছা। কুঞ্জর পক্ষে সবচেয়ে দরকার। নইলে, বিয়ে করলেই ত হয় না, খেতে পরতে দেওয়া চাই। আর মেয়েটিই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কালো, কিন্তু মুখশ্রী আছে। যাই হোক, দেখি কাল কি করে আসতে পারি।

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, আমিও দিন-ক্ষণ দেখাই গে মা! তুমি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে ফিরবে না, সে নিশ্চয় জানি।

কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেনা-পাওনার কথা, খাওয়ানো-দাওয়ানোর কথা সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্নে বৃন্দাবনের জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

তখন চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নামতা আবৃত্তি করিতেছিল, বৃন্দাবন একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর-গাড়ি সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিশুপুত্র চরণ গাড়ি হইতে নামিয়া চেঁচামেচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, মাতুলানী পছন্দ করিতে সেও আজ পিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, কবে দিন স্থির করে এলে মা ?

এই মাসের শেষে আর দিন নেই, তুই ভিতরে আয়—অনেক কথা আছে; বলিয়া তিনি হাসিমুখে চলিয়া গেলেন।

তাঁর নিজের ঘরে বৌ আসিবে, এই আনন্দে তাঁর বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া ঐ একটি দিনে ঘরকন্নায় গৃহিণীপনায় কুসুমকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়া-

ছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর-সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ-ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইবেন—এইসব সুখস্বপ্নের কাছে আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া, বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাইতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালের ছুটি দিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল সেদিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল, উপোস করে ভাবলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পরের ভাবনা পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।

মা বলিলেন, সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে তামাসা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকাকড়ি, না আছে লোকজন, আমাকে সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখলুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে কিছুতেই রাজি হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক বাবা, তোমার কথাই হচ্ছিল, এস ব'স। হঠাৎ এ-সময়ে যে?

বাস্তবিক গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ি আসার এটা সময় নয়।

কুঞ্জনাথ বাড়ি ঢুকিয়াই এ-রকমের সম্বর্দ্ধনা পাইয়া প্রথমটা থতমত খাইল। তারপর অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল, আচ্ছা কুঞ্জদা, টের পেলে কি করে? রাতটাও কি চুপ করে থাকতে পারলে না, না হয় কাল সকালে এসেই শুনতে?

মা একটু হাসিলেন। কুঞ্জ কিন্তু এদিক দিয়াও গেল না; সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বোন নয় ত, যেন দারোগা!

বৃন্দাবন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল; মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা কিছু বলে পাঠিয়েছেন বুঝি?

কুঞ্জ সে-প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা মা, তোমার এ কি-রকম ভুল? ধর কুসুমের চোখে না পড়ে যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা হলে কি সর্ব্বনাশ হ'ত বল ত?

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি কুঞ্জদা?

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া কুঞ্জ নিজেকে হাল্কা করিতে চাহিল না; তাই, বৃন্দাবনের প্রশ্ন কানেও তুলিল না। মাকে বলিল, আগে বল কি খাওয়াবে, তবে বলব।

মা এবার হাসিলেন, বলিলেন, তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ি, কি খাবে বল ?

কুঞ্জ কহিল, আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েচে আগে বল ?

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, কৈ, কিছুই ত হারায়নি !

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হো-হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, পরে নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া একজোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, তা হলে এটা তোমাদের নয় বল ? বলিয়া মহা আহ্লাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা, যাহা কাল এমনই সময়ে পরমস্নেহে স্বহস্তে তিনি পুত্রবধূর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্ব্বাদ সে নির্ব্বোধ কুঞ্জর হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন একমুহূর্ত্ত সেদিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে একফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পাণ্ডুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের বুকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিমেষে সামলাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ ও শান্তভাবে বলিল, মা, আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান আমাদের জিনিস আমাদেরই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতের বালা, সাধ্য কি মা যে-সে পরে ? কুঞ্জদা, চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ, তাই মহা-আহ্লাদে অসময়ে এতটা পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা তাহার খাওয়া-দাওয়ার পরে যখন কুসুম ম্লানমুখে বালা-জোড়াটি হাতে করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল, দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গিয়ে দিয়ে আসতে হবে—তখন আনন্দের আতিশয্যে সে তাহার মলিন মুখ লক্ষ্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

ঘোর-প্যাঁচ সে বুঝিতে পারে না, তাহার বোনের কথা সত্য নয়,—মানুষ মানুষকে এত দামী জিনিস দিতে পারে, কিংবা দিলে আর একজন তাহা গ্রহণ করে না—ফিরাইয়া দেয়, এ-সব অসম্ভব কাণ্ড তাহার বুদ্ধির অগোচর। তাই সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই হারানো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া তাঁহারা কিরূপ সুখী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিবেন—এইসব।

কিন্তু কৈ, সে রকম ত কিছুই হইল না ? যাহা হইল, তাহা ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না ; কিন্তু এত বড় একটা কাজ করিয়াও মায়ের মুখের একটা

ভাল কথা, একটা আশীর্ব্বচন না পাইয়া তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বরং বৃন্দাবন তাহাকে যেন তাঁহার সুমুখ হইতে বাহিরে তাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা লজ্জাকর অনুভূতি তাহাকে ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে লজ্জিত বিষণ্ণ-মুখে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা কহিল না। বাক্যালাপ করিবার অবস্থা তাহার নহে—তাহার বুকের ভিতরটা তখন অপমানের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। অপমান তাহার নিজের নয়—মায়ের।

নিজের ভাল-মন্দ, মান-অপমান আর ছিল না। মৃত্যু-যাতনা যেমন আর সর্ব্বপ্রকার যাতনা আকর্ষণ করিয়া একা বিরাজ করে, জননীর অপমানাহত বিবর্ণ মুখের স্মৃতি ঠিক তেমনিই করিয়া তাহার সমস্ত অনুভূতি গ্রাস করিয়া, একটিমাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে কহিল, বৃন্দাবন, আজ তবে যাই ভাই।

বৃন্দাবন বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল, যাও, কিন্তু আর একদিন এস।

কুঞ্জ চলিয়া গেল, বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা, কি ভবিষ্যতের কল্পনাই এক নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল! এখন কি উপায়ে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে—কাছে গিয়া কোন সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করিবে!

আবার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত নির্ম্মূল করিয়া দিয়া তাহার উপবাসী, শান্ত, সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল—সে তাহার স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে!

৫

কাল একটি দিনের মেলা-মেশায় কুসুম তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে যেমন চিনিয়াছিল, তাঁহারাও যে ঠিক তেমনি চিনিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

যাঁহারা চিনিতে জানেন, তাঁহাদের কাছে এমন করিয়া নিজেকে সারাদিন ধরা দিতে পাইয়া শুধু অভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় তাহার স্ফীত হইয়া উঠে নাই, নিজের অগোচরে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বাঁধন আজ আপনার হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বালা-জোড়াটি যখন ফিরাইয়া দিতে দিল, এবং নিরীহ কুঞ্জনাথ মহা উল্লাসে বাহির হইয়া গেল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সেই ক্ষত-বেদনা

তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার এই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাদের নিকট কত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কিরূপ ভয়ানক মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজিবে, এবং তাহার সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহাদের কি হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুঞ্জ বাড়ি ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের সুমুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কুসি, আলো জ্বালাসনি রে?

কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই দিই দাদা। কখন এলে?

এই ত আসচি, বলিয়া কুঞ্জ সন্ধান করিয়া হুকা-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখনো প্রদীপ সাজানো হয় নাই, অতএব, সেইসব প্রস্তুত করিয়া আলো জ্বালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লইয়া দাদা চলিয়া গিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ রাত্রেও ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গম্ভীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল, একটি কথাও কহিল না। যে লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সহসা আজ এত মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা কি, এবং কতদূরে গিয়াছে ইহাই জানিবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, দাদাকে তাঁহারা অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোট-খাটো অপমান তাহার দাদা ধরিতে পারে না, এবং পারিলেও এতক্ষণ মনে রাখিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতেছিল, কুসুম আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তা'হলে কার হাতে দিয়ে এলে দাদা?

কুঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আবার কার হাতে, মার হাতে দিয়ে এলুম।

কি বললেন তিনি?

কিচ্ছু না, বলিয়া কুঞ্জ বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ফেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, তোর শাশুড়ীঠাকরুণ কি এক-রকম যেন হয়ে গেছে কুসুম। অমন জিনিস হাতে দিয়ে এলুম, তা একটি কথা বললে না। বরং বৃন্দাবনকে ভাল বলতে হয়, সে খুশী হয়ে বলতে লাগল, সাধ্য কি মা, যে-সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে! আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে

দিলেন—ও কি রে?

কুসুমের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না। এ-কথা তিনি বললেন?

হ্যাঁ, সে-ই বললে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা ছাড়া তিনি কোথায় নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন, তখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি—এমন করে আমার পানে চেয়ে রইলেন যে, কি দিলুম, কি বললুম, তা যেন বুঝতেই পারলেন না। বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া ধামা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন-চারদিন গত হইয়াছে, রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া কুঞ্জ পরশু ও কাল মুখ ভার করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এইমাত্র ভাই-বোনে তুমুল কলহ হইয়া গেল।

কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ পুড়ে যায়, ও পুড়ে যায়, আজকাল মন তোর কোথায় থাকে কুসী?

কুসীও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, আমি কারো দাসী নই—পারব না রাঁধতে—যে ভাল রেঁধে দেবে তাকে আনো গে।

কুঞ্জর পেট জ্বলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না। হাত নাড়িয়া বলিল, তুই আগে দূর হ, তখন আনি কি না দেখিস্‌। বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল।

সেইদিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এত বড় সুযোগ সে ত্যাগ করিল না।

দাদার অভুক্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমনি খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া রান্নাঘরের চৌকাটে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকান্না শুরু করিয়া দিল।

বেলা বোধ করি তখন দশটা, ঘণ্টাখানেক কাঁদিয়া কাটিয়া শ্রান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোখ মিলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জদা' 'কুঞ্জদা' করিয়া ডাকিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া বছর-ছয়েকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু। কুসুম শশব্যস্তে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সুন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্রপথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এ যে তাহারই স্বামীরই সন্তান, তাহা সে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু যেন সহস্র

বাহু হইয়া উহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষপিঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, তথাপি সে সাড়া দিতে, পা বাড়াইতে পারিল না, পাথরের মূর্ত্তির মত একভাবে পলক-বিহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল।

আজ সকালে নিজের কাজে সে এইদিকে আসিয়াছিল এবং কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গো-যান সজ্জিত দেখিয়া তাহার পুত্র চরণ পূর্ব্বাহ্নেই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সেও-সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল, কেউ বাড়ি নেই নাকি?

তথাপি সাড়া নাই।

চরণ কহিল, জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া ধমক দিল, না, পায়নি, যাবার সময় নদীতে খাস্।

সে বেচারা শুষ্কমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কুসুম লজ্জার প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের সুমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা অতি সহজেই কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে বোধ করি কোনমতেই সুমুখে আসিতে পারিত না। সে একবার এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিল, তারপর একখানি ক্ষুদ্র আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া, কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতার ক্রোড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়া জানিত।

এদিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। একেই ত এইমাত্র সে ধমক খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়গায় হঠাৎ কোথা হইতে কে বাহির হইয়া এমন ছোঁ মারিয়া কোনদিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই।

কুসুম ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর কিছুক্ষণ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবলবেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, ছিঃ বাবা, আমি যে মা হই।

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোনমতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না, কিন্তু আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বুঝি আর কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই। বুক যেন তাহার ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এত বড় অনধিকার সংসারে কার আছে? চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল ততই তাহার বঞ্চিত, তৃষিত মাতৃ-হৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তার নিজের ধন জোর করিয়া, অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু চরণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি নদীতেই জল খাইত। এই স্নেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধ করি অনেক সুসহ হইতে পারিত। কহিল, ছেড়ে দাও।

কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, মা বল, তা হলে ছেড়ে দেব।

চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা' হলে ছেড়ে দেব না, বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া, চুমা খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল, মা না বললে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না!

চরণ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, মা।

ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাহির হইতে বৃন্দাবন কহিল, তোর জল খাওয়া হ'ল রে চরণ?

চরণ কাঁদিয়া বলিল, ছেড়ে দেয় না যে।

কুসুম চোখ মুছিয়া ভাঙা-গলায় কহিল, আজ চরণ আমার কাছে থাক্!

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, ও থাকতে পারবে কেন? তা ছাড়া এখনও খায়নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল, না, ও থাকবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

মন খারাপ কেন?

কুসুম সে-কথার উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, গাড়ি ফিরিয়ে দাও, বেলা হয়েচে, আমি নদী থেকে চরণকে স্নান করিয়ে আনি। বলিয়া কোনরূপ প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গামছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল।

বাটীর নীচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, জল দেখিয়া চরণ খুশী হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহাতে নামিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। ঘাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল, এবং উপর হইতে হাঁটু-জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া স্নান সারিয়া, কোলে চড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতাপুত্রে বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়া গিয়াছে।

ছেলে কোলে করিয়া কুসুম সুমুখে আসিল। মুখ তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত। মাথার আঁচল ললাটে স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। যাইবার সময় সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের আভাসমাত্রও সে-মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সদ্য-বিকশিত গোলাপের মত ওষ্ঠাধর চাপা-হাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা একেবারে নাই। সহজভাবে কহিল, এবার তুমি যাও, স্নান করে এস।

তারপরে ?

খাবে।

তারপরে ?

খেয়ে একটু ঘুমোবে।

তারপরে ?

যাও, আমি জানিনে। এই গামছা নাও—আর দেরি ক'র না, বলিয়া সে সহাস্যে গামছাটা গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বৃন্দাবন গামছা ধরিয়া ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটা অতি দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে মোচন করিয়া শেষে কহিল, বরং তুমি বিলম্ব করো না। চরণকে যা হোক দুটো খাইয়ে দাও—আমাদের বাড়ি যেতেই হবে।

যেতেই হবে কেন ? গাড়ি ফিরে গেলে মা বুঝতে পারবেন ?

ঠিক সেইজন্যেই গাড়ি ফিরে যায় নি, একটু আগে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

সংবাদ শুনিয়া কুসুমের হাসিমুখ মলিন হইয়া গেল। শুষ্কমুখে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তা' হলে আমি বলি, মায়ের অমতে এখানে তোমার আসাই উচিত হয়নি।

তাহার গূঢ় অভিমানের সুর লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন হাসিল, কিন্তু, সে হাসিতে

আনন্দ ছিল না। তার পরে সহজ ভাবে বলিল, আমি এমন হয়ে মানুষ হয়েচি কুসুম, যে, মায়ের অমতে এ বাড়িতে কেন, এ-গ্রামেও পা দিতে পারতুম না। যাক, যে-কথা শেষ হয়ে গেছে, সে-কথা তুলে কোন পক্ষেরই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না, যাও আর দেরি করো না, ওকে খাইয়ে দাও গে। বলিয়া বৃন্দাবন ফিরিয়া গিয়া আসনে বসিল।

কুসুম চোখের জল চাপিয়া মৌন-অধোমুখে ছেলে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে পিতা-পুত্রে গাড়ি চড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া চলিল, তখন পথে চরণ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, মা অত কাঁদছিল কেন?

বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তোর মা হয় কে বলে দিলে রে?

চরণ জোর দিয়া কহিল, আমার মা-ই ত হয়—হয় না?

বৃন্দাবন ও কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই থাকতে পারিস্ তোর মার কাছে?

চরণ খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, পারি বাবা।

আচ্ছা, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ ফিরাইয়া গাড়ির একধারে শুইয়া পড়িল, এবং রৌদ্রতপ্ত স্বচ্ছ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন অপরাহ্ণ-বেলায় কুসুম নদীতে জল আনিবার জন্য সদর দরজায় শিকল তুলিয়া দিতেছিল, একটি বার-তের বছরের বালক এদিকে-ওদিকে চাহিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তুমি কুঞ্জ বৈরাগীর বাড়ি দেখিয়ে দিতে পার?

পারি, তুমি কোথা থেকে আসচ?

বাড়ল থেকে। পণ্ডিত মশাই চিঠি দিয়েচেন, বলিয়া সে মলীন উত্তরীয়ের মধ্যে হাত দিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

কুসুমের শিরার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, উপরে তাহারই নাম। খুলিয়া দেখিল, অনেক লেখা—বৃন্দাবনের স্বাক্ষর।

কি কথা লেখা আছে তাহাই জানিবার উন্মত্ত-আগ্রহ সে প্রাণপণে দমন করিয়া ছেলেটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি পণ্ডিত মশাই কাকে বলছিলে? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে?

ছেলেটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, পণ্ডিত মশাই দিলেন।

কুসুম পাঠশালার কথা জানিত না, বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিল, তুমি চরণের বাপকে চেন?

চিনি—তিনিই ত পণ্ডিত মশাই।

তাঁর কাছে তুমি পড়?

আমি পড়ি, পাঠশালে আরো অনেক পোড়ো আছে।

কুসুম উৎসুক হইয়া উঠিল এবং তাহাকে প্রশ্ন করিয়া এ সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়া লইল। পাঠশালা বাটীতে প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না, পণ্ডিত মশাই নিজেই শ্লেট পেন্‌সিল প্রভৃতি কিনিয়া দেন, যে-সকল দরিদ্র ছাত্র দিনের বেলায় অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে, এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ খাইয়া কলরব করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। দুইজন বয়স্ক ছাত্র পাঠশালে ইংরাজী পড়ে, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইয়া কুসুম ছেলেটিকে মুড়ি, বাতাসা প্রভৃতি দিয়া বিদায় দিয়া চিঠি খুলিয়া বসিল।

সুখের স্বপ্ন কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়া ভাঙিয়া দিল। পত্র তাহাকেই লেখা বটে, কিন্তু একটা সম্ভাষণ নাই, একটা স্নেহের কথা নাই, একটু আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত নাই। অথচ, এই তার প্রথম পত্র। ইতিপূর্ব্বে আর কেহ তাকে পত্র লেখে নাই সত্য, কিন্তু সে তার সঙ্গিনীদের অনেকেরই প্রেমপত্র দেখিয়াছে—তাহাতে ইহাতে কি কঠোর প্রভেদ! আগাগোড়া কাজের কথা। কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা। এ-কথা বলিতেই সে কাল আসিয়াছিল। বৃন্দাবন জানাইয়াছে, মা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহিবেন। সব দিক দিয়াই এ বিবাহ প্রার্থনীয়, কেন না, ইহাতে কুঞ্জনাথের এবং সেই সঙ্গে তাহারও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ঘুচিবে। এই ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

একবার শেষ করিয়া সে আর একবার পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার অক্ষরগুলো তাহার চোখের সুমুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া কোনমতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাদের এতবড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও আনন্দের আভাস জানাইতে পারিল না।

৬

মাস-খানেক হইল, কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনও জ্বর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ, গৃহদেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার জো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ-ছয়দিন ছিল। মনের মত নূতন মা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিবাহ না হইতেই সে যে সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিবার উপক্রম করিতেছিল। দাদাকে সে ভালমতেই চিনিত, ঠিক বুঝিয়াছিল দাদা শাশুড়ীর পরামর্শে এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া ঘর-জামাই হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে মাথায় টোপর পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথায় আর ধামা বহিতে চাহিল না। নলডাঙার লোক শুনিলে কি বলিবে? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া, বাহিরে পথের ধারে একটা চালা বাঁধিয়া সে মণিহারীর দোকান খুলিয়া বসিল। এক পয়সাও বিক্রী হইল না। অথচ, এই একমাসের মধ্যেই সে নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন-চারিবার শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করিল। পূর্ব্বে কুঞ্জ কুসুমকে ভারি ভয় করিত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বসে, না হয়, কোথায় সরিয়া যায়—সমস্তদিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম প্রমাদ গনিল। তাহার যে কয়েকটি জমানো টাকা ছিল; তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলিল না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং ঝিমায়। লোক জুটিলে শ্বশুরবাড়ির গল্প এবং নূতন বিষয়-আশয়ের ফর্দ্দ তৈয়ার করে।

সেদিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বার্নিশ-করা জুতায় তেল মাখাইয়া চকচকে করিতেছিল, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, আবার আজও নলডাঙায় যাবে বুঝি?

কুঞ্জ 'হুঁ' বলিয়া নিজের মনে কাজ করিতে লাগিল।

খানিক পরে কুসুম মৃদুস্বরে কহিল, সেখানে এই ত সেদিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটার খবর পাইনি, বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

কুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া কহিল, তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। সে ভাল আছে।

কুসুমের রাগ হইল। কিন্তু, সংবরণ করিয়া বলিল, ভালই থাক্। তবু একবার দেখে এসোগে, শ্বশুরবাড়ি কাল যেয়ো।

কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল—কাল গেলে কি হবে? সেখানে একটি পুরুষ মানুষ পর্য্যন্ত নেই। ঘর-বাড়ি বিষয়-আশয় কি হচ্চে, না হচ্চে—সব ভার আমার মাথায়—আমি একা-মানুষ কতদিক সাম্‌লাব বল্ ত?

দাদার কথার ভঙ্গিতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, পারবে সাম্‌লাতে দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও—কি জানি কেন, সত্যিই তার জন্যে বড় মন কেমন কচ্ছে।

কুঞ্জ জুতা-জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া অতি রুক্ষস্বরে কহিল, আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসেনি কেন, এতই কি সে আমার চেয়ে বড়লোক যে, একবার আসতে পারলে না, শুনি ?

কুসুমের উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শান্তভাবে বলিল, তাঁর জ্বর হয়েছিল।

হয়নি। নলডাঙ্গায় বসে মা খবর শুনে বললেন, মিছে কথা, চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কাজ নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর দিতে পারেন, তা জানিস্ ? নেমকহারাম আর কা'কে বলে, একেই বলে। আমি তার মুখ দেখতেও চাইনে। বলিয়া কুঞ্জ গম্ভীরভাবে রায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল।

কুসুম বজ্রাহতের মত কয়েকমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, নেমকহারাম তিনি। নুন তাঁকে সেইদিন বেশী করে খাইয়েছিল, যেদিন ডেকে এনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার, এ বোধ করি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই, সে যেন শুনিতেই পাইল না, এইরকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম পুনরায় কহিল, যা তুমি তোমার বিষয়-আশয় বলচ, সে কা'র হত ? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে ?

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কে কার বিয়ে দিয়ে দেয় ? মা বললেন, ফুল ফুটলে কেউ আটকাতে পারে না। বিয়ে আপনি হয়।

আপনি হয় ?

হয়ই ত।

কুসুম আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছি, ছি, এ-সব কথা যদি তাঁহারা শুনিতে পান! শুনিলে, প্রথমেই তাঁহাদের মনে হইবে, এই দুই ভাই-বোন এক ছাঁচে ঢালা!

মিনিট-কুড়ি পরে নূতন জুতার মচ্ মচ্ শব্দ শুনিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবে ?

কাল সকালে।

আমাকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় করে না ? লজ্জা হয় না ?

কেন, এখানে কি বাঘ-ভালুক আছে যে তোকে খেয়ে ফেলবে ? আমি সকালেই ত ফিরে আসব, বলিয়া কুঞ্জ শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া জলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

৭

অনুতপ্ত দুষ্কৃতকারী নিরুপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ঠিক তেমনি মুখের চেহারা করিয়া বৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর মা, হুকুম দাও আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সারা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।

মা ঠাকুর-ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি করবি ?

তোমার দাসী আনব। যে চরণকে দেখবে, তোমার সেবা করবে, আবশ্যক হলে এই ঠাকুর-ঘরের কাজ করতেও পারবে। হুকুম দেবে ত মা ? প্রশ্ন করিয়া বৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত-দৃষ্টিতে জননীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মা এবার বুঝিলেন। কারণ, স্বজাতি ভিন্ন এ ঘরে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি তুই সত্যি সত্যি বলছিস্ বৃন্দাবন ?

সত্যি বই কি মা! ছেলেবেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান , কিন্তু বড় হয়ে তোমার সামনে কখন ত মিথ্যে বলিনি মা।

আচ্ছা, ভেবে দেখি, বলিয়া মা একটু কাজে মন দিলেন।

বৃন্দাবন সুমুখে আসিয়া বলিল—সে হবে না মা। তোমাকে আমি ভাবতে সময় দেব না। যা হোক একটা হুকুম নিয়ে এ-ঘর থেকে বার হব বলে এসেছি, হুকুম নিয়েই যাব।

কেন ভাবতে সময় দিবিনে ?

তার কারণ আছে মা! তুমি ভেবে-চিন্তে যা বলবে, সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের হুকুম হবে না। আমি ভালমন্দ পরামর্শ চাইনে—শুধু অনুমতি চাই।

মা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু একদিন যখন অনুমতি দিয়েছিলুম, সাধা-সাধি করেছিলুম, তখন ত শুনিস্‌নি বৃন্দাবন ?

তা জানি। সেই পাপের ফলই এখন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ নত করিল।

সে যে এখন শুধু তাঁহাকেই সুখী করিবার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, এবং ইহা কাজে পরিণত করিতে তাহার যে কিরূপ বাজিবে, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মার চোখে জল আসিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, এখন থাক্ বৃন্দাবন, দু'দিন পরে বলব।

বৃন্দাবন জিদ করিয়া কহিল, যে কারণে ইতস্ততঃ করছ মা, তা দু'দিন পরেও হবে না। যে তোমাকে অপমান করেছে, ইচ্ছে হয়, তাকে তুমি ক্ষমা করো, কিন্তু আমি করবো না। আর পারিনে মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে বাঁচি।

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, অনুমতি দিলুম।

এ নিশ্বাসের মর্ম্ম বৃন্দাবন বুঝিল, কিন্তু সেও আর কথা কহিল না। নিঃশব্দে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া, পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পণ্ডিত মশাই, আপনার চিঠি, বলিয়া এক ছাত্র আসিয়া একখানা পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি বৃন্দাবন?

জানিনে মা, দেখি, বলিয়া বৃন্দাবন অন্যমনস্কের মত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কাটাকুটি নাই, বর্ণাশুদ্ধি নাই, উপরে শ্রীচরণকমলেষু পাঠ লেখা আছে, কিন্তু নীচে দস্তখত নাই। কুসুমের হস্তাক্ষর সে পূর্ব্বে না দেখিলেও, তৎক্ষণাৎ বুঝিল ইহা তাহারই পত্র।

সে লিখিয়াছে—দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিনিতে পারিবে না। কেন, তাহা অপরকে কিছুতেই বলা যায় না, এমনকি, তোমাকে বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হইতেছে। তিনি আবার আজিও শ্বশুরবাড়ি গেলেন। হয়ত, কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন, কারণ বলিয়া গিয়াছেন, এখানে বাঘ-ভালুক নাই, একা পাইয়া আমাকে কেহ খাইয়া ফেলিবে, এ আশঙ্কা তাঁহার নাই। তোমার অত সাহস যদি না থাকে, আমার চরণকে দিয়া যাও।

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুসুম উনানে জল ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহা জ্বলে নাই। সারাদিন অভুক্ত। ভয়ে ভাবনায় সহস্রবার ঘর-বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রহিল না এবং এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বাটীতে সমস্ত রাত্রি নিজেকে নিছক একাকী কল্পনা করিয়া যখন বারংবার তাহার গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল, এমনি সময়ে বাহিরে চরণের সুতীক্ষ্ণ-কণ্ঠের মাতৃ-সম্বোধন শুনিয়া তাহার জল-মগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তার মুখ নিজের

মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পরে কুঞ্জনাথের নূতন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ চরণ, তোমার বাবা কি কচ্ছেন ?

চরণ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুঁটুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমি ভুলে গেছি মা, বাবা তোমাকে দিলেন।

কুসুম হাতে লইয়া বুঝিল, ইহাতে টাকা আছে।

চরণ কহিল, দিয়েই বাবা চলে গেলেন।

কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে চলে গেলেন রে ?

চরণ হাত তুলিয়া বলিল, ঐ যে হোথা থেকে।

এ পারে এসেছিলেন তিনি ?

চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এসেছিলেন ত।

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই যেদিন দ্বিপ্রহরে তিনি একবিন্দু জল পর্য্যন্ত না খাইয়া চরণকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সে-ও রাগ করিয়া দ্বিতীয় অনুরোধ করিল না, বরং শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, তখন হইতে আর একটি দিনও তিনি দেখা দিলেন না। আগে এই পথে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল, এখন সে প্রয়োজন একেবারে মিটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মিটিতে পারে, অন্তর্যামী জানেন, সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা কাটাইতেছে। পথে গরুর গাড়ির শব্দ শুনিলেও তাঁহার শিরায় রক্ত কিভাবে উদ্দাম হইয়া উঠে এবং কি আশা করিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দাদার বিবাহের রাত্রে আসিলেন না, আজ আসিয়াও দ্বারের বাহির হইতে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার সেদিনের কথা মনে পড়িল। দাদা যেদিন বালা ফিরাইতে গিয়া তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল, ভগবান তাহাদের জিনিস তাহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

অবশেষে সত্যই এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! নিজে আঘাত দিতে ত বাকী রাখে নাই। বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, মাকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণকালের নিমিত্ত সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না, সেদিন এত বড় দুর্মতি তাহার কি করিয়া হইয়াছিল! যে সম্বন্ধ সে চিরদিন প্রাণপণে অস্বীকার

করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারি বিরুদ্ধে তাহারই সমস্ত দেহ-মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তর্ক করিতে লাগিল; কেন, একি আমার নিজের হাতে গড়া সম্বন্ধ যে, আমি 'না-না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে! তাই যদি যাইবে, সত্যই তিনি যদি স্বামী নন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার; তাঁহারি উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু একটি দিনের দুটো তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্ত্তায়, একটি বেলার অতি ক্ষুদ্র একটুখানি সেবায় এত ভালবাসা আসিল কোথা দিয়া? সে জোর করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল—কখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারে না, এ আমি যে কোন শপথ করিয়া বলিতে পারি। মা শুধু অপমানের জ্বালায় আত্মহারা হইয়া এই দুরপনেয় কলঙ্ক আমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মনে মনে বলিল, মা মরিয়াছে, সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হইবার আর পথ নাই, কিন্তু আমি যাই বলি না কেন, তিনি নিজে ত জানেন, আমিই তাঁর ধর্ম্মপত্নী, তবে কেন তিনি আমার এই অন্যায় স্পর্দ্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্প পা দিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না? অস্বীকার করিবার, প্রতিবাদ করিবার আমি কেহ নয়, কিন্তু তাহা মানিয়া লইবার অধিকার তাহারও ত নাই।

হঠাৎ তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেই বক্ষলগ্ন চরণের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল—কি মা?

কুসুম তাহাকে বুকে চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, কাকে বেশি ভালবাসিস্ বল্ ত চরণ? তোর বাবাকে, না আমাকে?

চরণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমাকে মা।

বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ?

হ্যাঁ, দেবো।

তোর বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি ত?

হ্যাঁ, দেবো।

কোন অবস্থায় কি দিতে হইবে, ইহা সে বোঝে নাই, কিন্তু কোন অবস্থাতেই নূতন মাকে তাহার অদেয় কিছুই নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুসুমের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চরণ ঘুমাইয়া পড়িলে, চোখ মুছিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ভয় কি! আমার ছেলে আছে, আর কেহ আশ্রয় না দিক, সে দেবেই!

পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরে মাতাপুত্র নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল, একটা প্রৌঢ়া নারী প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছেন, এবং কুঞ্জনাথ সবিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শাশুড়ী। শুধু কৌতূহলবশে জামাতার কুটীরখানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র কন্যা-রত্নকে কোনদিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কি-না!

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার সিক্ত বসনে যৌবন-শ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর্দ্র এলো চুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার বামকক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ঘটি। সংসারে এমন মাতৃমূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে তখন অবাক্ হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। কুঞ্জনাথও হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, এই কুসুম বুঝি?

কুঞ্জ খুশী হইয়া কহিল, হাঁ মা, আমার বোন।

সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকানো, তাই কুসুম সেইখানেই ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়ের দেখাদেখি চরণও প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন, এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, আমি চরণ। ঠাকুরমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে মামাবাবুর মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

কুসুম সস্নেহে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, ছি, বাবা, বলতে নেই। মামীমাকে দেখতে গিয়েছিলুম বলতে হয়।

কুঞ্জর শাশুড়ী বলিলেন, বেন্দা বোষ্টমের ছেলে বুঝি? একফোঁটা ছোঁড়ার কথা দেখ!

দারুণ বিস্ময়ে কুসুমের হাসি-মুখ এক মুহূর্তে কালি হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তার পর ঘড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ একি ব্যাপার হইয়া গেল!

কুঞ্জ নির্বোধ হইলেও শাশুড়ীর এত বড় রুক্ষ কথাটা তাহার কানে বাজিল, বিশেষ ভগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান

করিয়া সে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে বুঝিয়াছিল, কুসুম ইহাকে আর কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাশুড়ীও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপ বলা তাঁহারও অভিপ্রায় ছিল না। শুধু শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রান্নাঘর হইতে কুসুম গোকুলের বিধবার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরনে থান কাপড়, কিন্তু গলায় সোনার হার, কানে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাজু—নিজের শাশুড়ীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

দাদার সহিত তাহার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, কি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্বন্ধে হইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

তিনি পান এবং দোক্তাটা কিছু বেশী খান। সকাল হইতে শুরু করিয়া সারা-দিনটাই সেটা ঘন ঘন চলিতে লাগিল। স্নানান্তে তিলক-সেবা অনুষ্ঠানটি নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই দুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ছোট আর্শিটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া আসেন নাই।

কুসুম নিত্য পূজা সারিয়া, রাঁধিতে বসিয়াছিল, তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিকে ওদিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, কই গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলক-সেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?

কুসুম সংক্ষেপে কহিল, আমি ওসব করিনে।

করিনে বললে চলবে কেন? লোকে তোমার হাতে জল পর্য্যন্ত খাবে না যে।

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তাহলে আলাদা রান্নার যোগাড় করে দি?

আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুম—কিন্তু পরে খাবে না ত।

কুসুম জবাব দিল না।

কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চরণ কখন এল কুসুম?

কাল সন্ধ্যার সময়।

কুঞ্জর শাশুড়ী কহিলেন, এই শুনি, বেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে ত!

কুঞ্জ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় শুনলে মা?

মা গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, আমার আরও চারটে চোখ-কান আছে। তা সত্যি কথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাহাঁটি করলে তবু তোমার বোন রাজি হ'ল না। লোকে নানা কথা বলবেই ত। পাড়ায় পাঁচজন ছেলে-ছোকরা আছে, তোমার বোনের এই সোমত্ত বয়স; এমন কাঁচা-সোনার রঙ—লোকে বলে, মন না

মতি, পা ফস্‌কাতে, মন টলতে কতক্ষণ বাছা ?

কুঞ্জ সায় দিয়া বলিল, সে ঠিক কথা মা।

কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, তুমি এখানে বসে কি করছ দাদা! উঠে যাও।

কুঞ্জ থতমত খাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার শাশুড়ী উষ্ণ হইয়া বলিলেন, দাদাকে ঢাকলেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়বে না বাছা ? এই যে তুমি নদীতে চান করে, ভিজে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও দেখলে মুনির মন টলে কি-না, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি ?

কুসুম চেঁচাইয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনো না—যাও এখান থেকে।

তাহার চীৎকার ও চোখ-মুখ দেখিয়া কুঞ্জ শশব্যস্তে উঠিয়া পলাইল। কুসুম উনান হইতে তরকারির কড়াটা দুম্ করিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জর শাশুড়ী মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা; এই সহায়-সম্বলহীন মেয়েটা তাঁহাকে যে হতভম্ব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

৮

কেন, তাহা না বুঝিলেও সেদিন দাদার শাশুড়ী যে বিবাদ-সঙ্কল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কুসুমের সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া, তাহার বলার মর্ম্মটা ঠিক এই রকম শুনাইল, যেন বৃন্দাবন একসময়ে গ্রহণেচ্ছু থাকা সত্ত্বেও কুসুম বিশেষ কোন গূঢ় কারণে যায় নাই। সেই গূঢ় কারণটি সম্ভবতঃ কি, তাহা তাঁহার ত অগোচর নাই-ই, বৃন্দাবন নিজেও আভাস পাইয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ইঙ্গিতই কুসুমকে অমন আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি অমন করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাওয়াটা তাহারো যে ভাল কাজ হয় নাই, ইহা সে নিজেও টের পাইয়াছিল।

কুঞ্জর শাশুড়ী সেদিন সারাদিন আহার করেন নাই, শেষে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক ঘাট-মানায় রাত্রে করিয়াছিলেন। তাঁহার মান রক্ষার জন্য কুঞ্জ সমস্তদিন ভগিনীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল, কিন্তু রাগারাগি, মান-অভিমান সমাপ্ত হইবার পরেও তাহাকে একবার খাইতে বলে নাই। পরদিন বাটী ফিরিবার পূর্ব্বে, কুসুম প্রণাম

করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইলে কুঞ্জর শাশুড়ী কথা কহেন নাই। এবং জামাইকে উপলক্ষ করিয়া কহিয়াছিলেন, কুঞ্জনাথকে ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি দেখতে হবে, এখানে বোন আগলে বসে থাকলেই ত আর চলবে না!

কুসুমের দিক হইতে এ কথার জবাব ছিল না; তাই সে নিরুত্তর অধোমুখে শুনিয়া গিয়াছিল। সত্যই ত! দাদা এ-দিক ও-দিক দু'দিক সামলাইবে কি করিয়া?

তখন হইতে প্রায় মাস-দুই গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কুঞ্জকে তাহার শাশুড়ী যেন একেবারে ভাঙিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এখন প্রায়ই সে এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না। কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে? শুধু যদি সে জানিত, সংসারে ইহারাই এরূপ হয়, এতটা পরিবর্ত্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি, তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত না। ভাই-বোনের সে স্নেহ নাই, এখন কলহও হয় না। কলহ করিতে কুসুমের আর প্রবৃত্তি হয় না, সাহসও হয় না। সেদিন, এক রাত্রি বাড়িতে একা থাকিতে সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, এখন কত রাত্রিই একা থাকিতে হয়। অবশ্য, দুঃখে পড়িয়া তাহার ভয়ও ভাঙিয়াছে।

তথাপি এ-সব দুঃখও সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে। রহিয়া রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও বোধ করি দাদা একবার কাঁদিবে না—একফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে দাদার এই নিষ্ঠুর ত্রুটি সে তখনি নিজের চোখের জল দিয়া স্খালন করিয়া দিতে ঘরে দোর দিয়া বসে, আর সেদিন দোর খোলে না। হৃদয় বড় ভারাতুর হইয়া উঠিলে চরণের কথা মনে করে। শুধু সেই 'মা মা' করিয়া যখন-তখন ছুটিয়া আসে, এবং কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তাহারি হাতে একদিন সে অনেক সঙ্কোচ এড়াইয়া বৃন্দাবনকে একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে যে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। কারণ যে প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম পথ চাহিয়া রহিল তাহা ত আসিলই না দু'ছত্র কাগজে-লেখা জবাবও আসিল না। শুধু আসিল কিছু টাকা। বাধ্য হইয়া, নিরুপায় হইয়া কুসুমকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া

বাহিরে আসিতে কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ কি যে হইল, মৃদু-কণ্ঠে বলিয়া বসিল, এক্ষনি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না, দুটো খেয়ে যাও না?

কুঞ্জ ঘাড় ফিরাইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, যা ভেবেচি তাই। অমনি পেছু ডেকে বসলি?

দায়ে পড়িয়া কুসুম অনেক সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু এই অকারণ মুখ-বিকৃতিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গেল, সে পাল্টা মুখ-বিকৃত করিল না বটে, কিন্তু অতি কঠোর-স্বরে বলিল, তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মরবে না। না হলে, আজ পর্য্যন্ত যত পেছু ডেকেচি, মানুষ হলে মরে যেতে।

আমি মানুষ নই?

না। কুকুর-বেড়ালও নও—তারা তোমার চেয়ে ভাল—এমন নেমক্‌হারাম নয়, বলিয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কুঞ্জ মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরের দরজা তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল। সেই খোলা পথ দিয়া ঘণ্টাখানেক পরে বৃন্দাবন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কুঞ্জর ঘর তালা-বন্ধ, কুসুমের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ—রান্নাঘর খোলা। মুখ বাড়াইতেই একটা কুকুর আহার পরিত্যাগ করিয়া 'কেঁউ' করিয়া লজ্জা ও আক্ষেপ জানাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কতক রান্না হইয়াছে, কতক বাকী আছে—উনান নিবিয়া গিয়াছে। চরণ চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে সু-উচ্চ মাতৃ-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিজের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ি ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ডাকে কুসুম দোর খুলিয়া বাহির হইতেই তাহার অশ্রু-কষায়িত দুই চোখের শান্ত বিপন্ন দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রেই বৃন্দাবনের বিস্ময়-বিহ্বল জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া, একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণ মায়ের মুখের-দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা কাঁদচে বাবা!

বৃন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ডেকে

পাঠিয়েছিলে কেন ?

কুসুম তখনও নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, জবাব দিতে পারিল না।

বৃন্দাবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি ?

কুসুম রুদ্ধ-স্বরে কহিল, মরে গেছে।

আহা, মরে গেল! কি হয়েছিল ?

তাহার গম্ভীর স্বরে যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল, এই দুঃখের সময় কুসুমকে তাহা বড় বাজিল। সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ. তামাসা ক'রো না। দেহ আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, এখন ওসব ভাল লাগে না। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েচি বলে কি এমনি করে তার শোধ দিতে এলে? বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চাপা-কান্না বৃন্দাবন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু ইহা তাহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে পাঠিয়েচ কেন ?

কুসুম চোখ মুছিয়া ভারি গলায় কহিল, না এলে আমি বলি কাকে? আগে বরং নিজের কাজেও এ-দিকে আসতে যেতে, এখন ভুলেও আর এ-পথ মাড়াও না।

বৃন্দাবন কহিল, ভুলতে পারিনি বলেই মাড়াইনে, পারলে হয়ত মাড়াতুম। যাক, কি কথা ?

এমন করে তাড়া দিলে কি বলা যায় ?

বৃন্দাবন হাসিল। তার পরে শান্তকণ্ঠে কহিল, তাড়া দিইনি, ভালভাবেই জানতে চাচ্ছি। যেমন করে বললে সুবিধে হয়, বেশ ত তুমি তেমনি করেই বল না।

কুসুম কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে আমি অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি—আমি চুল এলো করে, পথে-ঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই, এ-কথা কে রটিয়েছে ?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বৃন্দাবন ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, আমি। তারপরে ?

তুমি রটাবে এমন কথা আমি বলিনি, মনেও ভাবিনি, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, কিন্তু সেদিন বলেওছিলে, ভেবেওছিলে। আমি বড়লোক হয়ে শুধু তোমাদের জব্দ করবার জন্যেই মাকে নিয়ে ভাইদের নিয়ে খেতে এসেছিলুম—সেদিন পেরেচি, আজ আর পারিনে? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড়নি!

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েচে। তখন তোমাকে আমি চিনতে পারিনি।

এখন পেরেছ ?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, একটা কুকুর রান্না-ঘরে ঢুকে তোমার হাড়ি-কুঁড়ি রান্না-বান্না সমস্ত যে মেরে দিয়ে গেল।

কুসুম কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া জবাব দিল, যাক্ গে। আমি ত খাবো না—আগে জানলে রাঁধতেই যেতুম না।

আজ একাদশী বুঝি ?

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, জানিনে। ও-সব আমি করিনে।

কর না ?

কুসুম তেমনি অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন সস্নিগ্ধস্বরে বলিল, আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন ?

পুনঃ পুনঃ আঘাতে কুসুম অধীর হইয়া উঠিতেছিল। উত্যক্ত হইয়া কহিল, করিনে আমার ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্ব্বনাশ করতে চায় না, সেইজন্যে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হয়েছে, কিন্তু সত্যি বলচি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করচে।

বৃন্দাবন কহিল, সেটা ক'রো না। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দাদার ব্যবহার অসহ্য হল কেন ?

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, সে আর এক মহাভারত—তোমাকে শোনাবার আমার ধৈর্য্য নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে দেখতে শুনতে পারবেন না, তাঁর শাশুড়ির হুকুম নেই। খেতে-পরতে দেওয়া বন্ধ করেচেন; চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হ'তো। এখন আমি—সহসা সে থামিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিল, আর বলা উচিত কি না; তারপর বলিল, এখন আমি তোমার সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই একদিন একদণ্ডও ওখানে আর থাকতে চাইনে।

বৃন্দাবন সহাস্যে প্রশ্ন করিল, তাই থাকতে ইচ্ছে নেই ?

কুসুম একটিবার চোখ তুলিয়াই মুখ নিচু করিল। এই সহজ সহাস্য প্রশ্নের মধ্যে যতখানি খোঁচা ছিল, তাহার সমস্তটাই তাহাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করিল।

বৃন্দাবন বলিল, চরণ তার মায়ের ভার নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু কোথায় থাকতে চাও তুমি।

কুসুম তেমনি নতমুখেই বলিল, কি করে জানব ? তাঁরাই জানেন।

তাঁরা কে? আমি?

কুসুম মৌনমুখে সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবন কহিল, সে হয় না। আমি তোমার কোন বিষয়েই হাত দিতে পারিনে। পারেন শুধু মা। তুমি যেমন আচরণই তাঁর সঙ্গে করে থাক না কেন, চরণের হাত ধরে যাও তাঁর কাছে—উপায় তিনি করে দেবেনই। কিন্তু তোমার দাদা?

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল, বলচি ত আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু, কি করে আমি দিনের বেলায় পায়ে হেঁটে ভিক্ষুকের মত গ্রামে গিয়ে ঢুকব?

বৃন্দাবন বলিল, তা জানিনে, কিন্তু পারলে ভাল হ'ত। এ-ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখতে পাইনে।

কুসুম ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আমি যাব না।

খুশি তোমার।

সংক্ষিপ্ত সরল উত্তর। ইহাতে নিহিত অর্থ বা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নাই। এতক্ষণে কুসুম সত্যই ভয় পাইল।

বৃন্দাবন আর কিছু বলে কি না, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত সে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া, রহিল, তাহার পর অতিশয় নম্র ও কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু এখানেও আমার যে আর দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাইনে, কেননা নিজের অনিষ্ট করে পরের ভালো না করতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু তুমি ত অমন করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?

বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বেলা হ'ল। চরণ, তুই থাকবি, না যাবিরে? থাকবি? আচ্ছা থাক্। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো। আমার বিশ্বাস, ও-বাড়িতে ওর হাত ধরে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার খুব মস্ত অপমান হ'তো না। যাক চললুম, বলিয়া পা বাড়াইতে কুসুম সহসা চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ সমস্ত বুঝলুম! আমার এত বড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাড়িয়ে উঠে জবাব দিলে, বেলা হ'ল চললুম, আমি কত নিরাশ্রয় তা স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলে না, তখন তোমাকে বলবার বা আশা করবার আর কিছুই নেই। তবু আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?

বৃন্দাবন ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিনি, বরং তুমিই নিতে অস্বীকার করেছ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি যে দুর্ম্মতি হয়েছিল, মার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছি, অন্তর্যামী

জানেন, সে দুঃখ আমার মনেও যাবে না—তাই, আমার মা, স্বামী পুত্র, ঘরবাড়ি সব থাকতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়। আজ পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখতে পাইনি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে-বাড়ির বৌ। কি করে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে পাঠাতে চাচ্ছ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাওনি। কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উঞ্ছবৃত্তি করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশী কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প। আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মাল-মশলা যুগিয়ে দেব না।

বৃন্দাবন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, চললুম। আমার আর কিছু বলবার নেই।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল, যাও। দাঁড়াও, আর একটা কথা। দয়া করে মিথ্যে বলো না—জিজ্ঞেস করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করছি—

বৃন্দাবন দুই-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, ও কি, নিরর্থক শপথ কর কেন? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনিনি। তাহার অর্দ্ধ-আবরিত মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, তা ছাড়া পরের চলা-ফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাবও নয়, উচিতও নয়। তোমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও চাইনে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করিনে, বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

চরণ কহিল, মা, নদীতে নাইতে যাবে না?

কুসুম কথা কহিল না, তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া এক-পা এক-পা করিয়া ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

৯

অনেকদিন কাটিয়াছে। মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ সেই যে গিয়াছে আর আসিল না। তাহাকে যে জোর করিয়া আসিতে দেওয়া হয় না, ইহা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কোনরূপ সম্বন্ধ আর তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ও-দিকের কোন সংবাদ নাই, সেও আর কখনও চিঠিপত্র লিখিয়া নিজেকে অপমানিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দাদার সেই একই ভাব—সর্ব্বরকমেই প্রাণ যেন কুসুমের বাহির হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। সেই অবধি প্রকাশ্যে বাটীর বাহির হওয়া কিংবা পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গিনীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। রাত্রি থাকিতেই নদী হইতে স্নান করিয়া জল লইয়া আসে, হাটের দিন গোপালের মা হাট-বাজার করিয়া দেয়,—এমনি করিয়া বাহিরের সমস্ত সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহার গুরুভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ দিনরাত্রিগুলি যথার্থই বড় দুঃখে কাটিতেছিল।

সে খুব ভাল সূচের কাজ করিতে পারিত। যে যাহা পারিশ্রমিক দিত, তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিত এবং কেহ দিতে ভুলিয়া গেলে সেও ভুলিয়া যাইত। এই সমস্ত মহৎ গুণ থাকায় পাড়ার অধিকাংশ মশারি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর সে-ই সিলাই করিত। আজ অপরাহ্ন-বেলায় নিজের ঘরের সুমুখে মাদুর পাতিয়া একটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত মশারি শেষ করিতে বসিয়াছিল। হাতের সূচ অচল হইয়া রহিল, সে সেই প্রথম দিনের আগাগোড়া ঘটনা লইয়া নিজের মনে খেলা করিতে লাগিল।

যেদিন তাঁহারা সদলবলে পলাতক দাদার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং বড় দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়া মুখরার মত প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ করিতে হইয়াছিল—সেইসব কথা। দুঃখ তাহার যখনই অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই সে সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া এই স্মৃতি লইয়া চুপ করিয়া বসিত। মা যেমন তাঁহার একমাত্র শিশুকে লইয়া নানাভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উপভোগ করেন, সেও তাহার এই একটিমাত্র চিন্তাকেই অনির্ব্বচনীয় প্রীতির সহিত নানা দিক হইতে তোলপাড় করিয়া দেখিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত। তাহার সমস্ত দুঃখ তখন-কার মত যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইত। দু'জনের সেই বাদ-প্রতিবাদ, অপর সকলকে লুকাইয়া আহারের আয়োজন, তার পরে রাঁধিয়া বাড়িয়া পরিবেশন করিয়া স্বামী-দেবরদিগকে খাওয়ানো, শাশুড়ীর সেবা, সকলের শেষে দিনান্তে নিজের জন্য সেই অবশিষ্ট শুষ্ক শীতল যা হোক কিছু।

তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নারীদেহ ধরিয়া ইহাপেক্ষা অধিক সুখ সে ভাবিতেও পারিত না, কামনাও করিত না। তাহার মনে

হইত, যাহারা এ-কার্য্য নিত্য করিতে পায়, এ-সংসারে বুঝি তাহাদের আর কিছুই বাকী থাকে না।

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল, শেষদিনের কথা; যেদিন তিনি সমুদয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সেদিন সে নিজেও বাধা দেয় নাই, বরং ছিঁড়িতেই সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তখন চরণের কথা ভাবে নাই। ঐ সঙ্গে সেও যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে, দারুণ অভিমানে তাহা মনে পড়ে নাই। এখন যত দিন যাইতেছিল, ওই ভয়ই তাহার বুকের রক্ত পলে পলে শুকাইয়া আনিতেছিল, পাছে চরণ আর না আসিতে পায়। সত্যিই যদি সে না আসে, তবে একদণ্ডও সে বাঁচিবে কি করিয়া? আবার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে পূর্ব্বে ছিল, যাহা এ দুর্দ্দিনে হয়ত তাহাকে বল দিতেও পারিত, আর তাহা নাই, একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরবাসী সুপ্ত বিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়া অহর্নিশি তাহার কানে কানে ঘোষণা করিতেছে, সমস্ত মিথ্যা! তাহার ছেলেবেলার কলঙ্ক দুর্নাম কিছু সত্য নয়। সে হিঁদুর মেয়ে, অতএব যাহা পাপ, যাহা অন্যায়, তাহা কোনমতেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও কখন হিঁদুর ঘরের মেয়ে এত ভালবাসিতে পারে না। তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার কাজে লাগিবার জন্য সমস্ত দেহ মন উন্মত্ত হইয়া উঠে না। তিনি স্বামী না হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন, অন্তরের কোথাও কোনো একটু ক্ষুদ্র কোণে এতটুকু লজ্জার বাষ্পও অবশিষ্ট রাখিতেন।

আজ হাটবার। গোপালের মা বহুক্ষণ হাটে গিয়েছে, এখনি আসিবে, এইজন্য সদর দরজা খোলা ছিল; হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া কুঞ্জনাথবাবু চাকর সঙ্গে করিয়া বিলাতি জুতার মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া পাড়ার লোকের বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। কুসুম টের পাইল, কিন্তু অশ্রুকলুষিত রাঙা চোখ লজ্জায় তুলিতে পারিল না।

কুঞ্জনাথ সোজা ভগিনীর সুমুখে আসিয়া কহিল, তোর বৃন্দাবন যে আবার বিয়ে কচ্চে রে!

কুসুমের বক্ষঃস্পন্দন থামিয়া গেল, সে কাঠের মত নতমুখে বসিয়া রহিল।

কুঞ্জ গলা চড়াইয়া কহিল, কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কি করে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখতে হবে। ঐ নন্দা বোষ্টম, কত বড় বোষ্টমের বেটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমিদারীতে বাস করে আমারই অপমান!

কুসুম কোন কথাই বুঝিতে পারিল না, অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দ বোষ্টম কে?

কে? আমার প্রজা! আমার পুকুরপাড়ে ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব; সেই ব্যাটার মেয়ে—এই ফাল্গুন মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে—ভুতো, তামাক সাজ্।

কুসুম এতক্ষণ চোখ তোলে নাই, তাই চাকরের আগমন লক্ষ্য করে নাই, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

কুঞ্জ প্রশ্ন করিল, ভুতো, নন্দার মেয়েটা দেখতে কেমন রে?

ভুতো ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ।

কুঞ্জ আস্ফালন করিয়া কহিল, বেশ? কখ্খন না, আমার বোনের মত দেখতে? ছ্যাৎ—এমন রূপ তুই কখন চোখে দেখেচিস্?

ভুতো জবাব দিবার পূর্ব্বেই কুসুম ঘরে উঠিয়া গেল।

খানিক পরে কুঞ্জ তামাক টানিতে টানিতে ঘরের সুমুখে আসিয়া বলিল, কি রে কুসি, বলেছিলুম না? বেন্দা বৈরাগীর মত অমন নেমকহারাম বজ্জাত আর দুটি নেই—কেমন ফলল কিনা? মা বলেন, বেদ মিথ্যে হবে, কিন্তু কুমার কুঞ্জনাথের বচন মিথ্যে হবে না—ভুতো, মা বলে না?

ঘরের ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না, কিন্তু কি একরকমের অস্পষ্ট আওয়াজ আসিতে লাগিল।

কুঞ্জ কি মনে করিয়া, হুকাটা রাখিয়া দিয়া, দোর ঠেলিয়া ঘরের ভেতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল; ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া বহু-কালের পর হঠাৎ আজ তাহার চোখ দুটা জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার একাংশে গিয়া বসিল এবং বোনের মাথায় একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুই কিছু ভয় করিসনে কুসুম, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তখন দেখতে পাবি, তোর দাদা যা বলে তাই করে কিনা। কিন্তু তুইও ত শ্বশুর-ঘর করতে চাইলিনি বোন—আমরা সবাই মিলে কত সাধাসাধি করলুম, তুই একটা কথাও কারুর কানে তুললিনে।

কুঞ্জর শেষ কথাগুলো অশ্রুভারে জড়াইয়া আসিল।

কুসুম আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না—হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার জন্য আজও দাদার স্নেহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, এ আশা সে অনেক-দিন ছাড়িয়াছিল।

কুঞ্জর চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। কুঞ্জ আর একবার ভাল করিয়া জামার হাতায় চোখ মুছিয়া লইয়া

বলিল, তুই অস্থির হ'সনে বোন, আমি বলে যাচ্ছি, এ বিয়ে কোনমতেই হতে দেব না।

এবার কুসুম কথা কহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি এতে হাত দিয়ো না দাদা।

কুঞ্জ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, হাত দেব না? আমার চোখের সামনে বিয়ে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব? তুই বলচিস কি কুসুম?

না দাদা, তুমি বাধা দিতে পাবে না।

কুঞ্জ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। এতে তোর অপমান না হয় না হবে, কিন্তু আমি সইতে পারব না। আমার প্রজা—তুই বলিস্ কি রে! লোকে শুনলে আমাকে ছি ছি করবে না?

কুসুম বালিসে মুখ লুকাইয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি মানা করচি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিও না। আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, আর ঘাঁটাঘাঁটি করে কেলেঙ্কারি বাড়িয়ো না—বিয়ে হচ্চে হোক্।

কুঞ্জ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, না।

না কেন? আমাকে ত্যাগ করে তিনি বিয়ে করেছিলেন, না হয় আর একবার করবেন। আমার পক্ষে দুইই সমান। তোমার পায়ে ধরচি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে হাঙ্গামা করে আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট করে দিয়ো না—তিনি যাতে সুখী হন, তাই ভাল।

কুঞ্জ হুঁ, বলিয়া খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, জানি ত তোকে চিরকাল। একবার 'না' বললে কার বাপের সাধ্যি 'হাঁ' বলায়। তুই কারো কথা শুনবিনে, কিন্তু তোর কথা সবাইকে শুনতে হবে।

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

কুঞ্জ বলিতে লাগিল, আর ধরলে কথাটা মিথ্যে নয়। তুই যখন কিছুতেই শ্বশুরঘর করবিনে, তখন তাদের সংসারই বা চলে কি করে? এখন না হয় মা আছেন, কিন্তু তিনি ত চিরকাল বেঁচে থাকবেন না।

কুসুম কথা কহিল না।

কুঞ্জ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা কুসুম, সে বিয়ে করুক না করুক, তুই তবে এত কাঁদচিস্ কেন?

ইহার আবার জবাব কি?

অন্ধকারে কুঞ্জ দেখিতে পাইল না, কুসুমের চোখের জল কমিয়া আসিয়াছিল, এই প্রশ্নে পুনরায় তাহা প্রবলবেগে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কুঞ্জ উঠিয়া গেলে কুসুম সেদিনের কথাগুলো স্মরণ করিয়া লজ্জায় ধিক্কারে মনে মনে মরিয়া যাইতে লাগিল। ছিঃ ছিঃ, মরিলেও ত এ লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতির

পথ নাই। এইজন্যই তাঁহার আশ্রয় দিবার সাধ্য ছিল না, অথচ সে কতই না সাধিয়াছিল। ওদিকে যখন নূতন করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, তখন না জানিয়া সে মুখ ফুটিয়া নিজেকে বাড়ির বধূ বলিয়া দর্প করিয়াছিল। যেখানে বিন্দু পরিমাণ ভালবাসা ছিল না, সেখানে সে পর্ব্বত-প্রমাণ অভিমান করিয়াছিল। ভগবান! এই অসহ্য দুঃখের উপর কি মর্ম্মান্তিক লজ্জাই না তাহার মাথায় চাপাইয়া দিলে!

তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—উঃ, এইজন্যই আমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই! আর আমি লজ্জাহীনা, তাহাতে শপথ করিতে গিয়াছিলাম!

১০

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাঁহারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোন কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি হাঁকা-হাঁকি বা উচ্চ তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি সেদিন কুসুমের বারংবার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলো নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ি পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিবে এবং হয়ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল—যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্য্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসংকটই হোক, কোন-না-কোন উপায়ে তিনি সবদিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়াছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে।

দুপুরবেলা গাড়ি একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্ব্বের শৃঙ্খলা ছিল না? পণ্ডিত মশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল এবং যাহারা

আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ-ভক্ষণে। এটা বোধকরি অকৃত্রিম ভক্তি বশতঃই—ছাত্রেরা এ-সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতাইয়ের অমর্য্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পোনের মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরাঙ্গ-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে সেদিকেও খর-দৃষ্টি রাখিল।

দিন-দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া, চিনতে পারলে না।

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।

তিনি বলিলেন, আমার কাজ আছে, তা পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্ব্বে একবার দেখতে এলাম—আমি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্যসুহৃৎকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব্ব ইংরাজিশিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর ভাগিনেয় ইনি। পোনের-ষোল বৎসর পূর্ব্বে এখানে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন, সেই সময় উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকেও বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্যবন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব পাঁচ-ছয় বৎসর হইল এম. এ. পাশ করিয়া কলেজের শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, আমার মামা মিথ্যে কথা ত দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবারে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন; কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েচে কি-না তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।

কথাগুলা বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া

পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এত বড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ এই স্তুতি তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থ-ই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, যাক, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বলব না, শুধু মামার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাজের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, শুনি মাইনে নাও না, পোড়োদের বই-টই কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজি ছিলাম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে জোগাড় করলে কি করে বল ত ভায়া?

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত-মুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বলচি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোনো কাজ থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ আমার ত এই মত যে, লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে। ইঞ্জিনে স্টিম হলে তবে গাড়ি চলে, নইলে এত বড় জড় পদার্থটাকে জন-কতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি করে একচুলও নড়াতে পারবে না। যাক, তুমি এ-সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুলতে না। আমি এইজন্য বিয়ে পর্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখবার বালাই নেই, তাই প্রথম একটা পাঠশালা খুলে—শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে করি—তা আমার পাঠশালাই চলল না—ছেলে জুটল না। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি শয়তান যে, কোনমতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট করে দিন-কতক ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি পর্য্যন্ত ঘুরেছিলাম—না, তবুও না।

বৃন্দাবনের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায়নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারি অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, না হে, না—তোমাকে—তোমাদের সে কি কথা! ছি ছি! তা আমি বলিনি, সে কথা-নয়—কি জানো—

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা—তাঁত বুনি

লাঙ্গল ঠেলি, গরু চরাই—জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী অফিসের দোর গোড়ায় যেতে পারিনে, কাজেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাজেও আমাদের বাড়িতে ঢুকলে তোমাদের মত উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বৃন্দাবন, সত্যি বলচি ভাই, তোমাকে আমি চাষা-ভুষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেছি। যদি জানতুম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কখনও এ-কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে রয়েছে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এইজন্যেই তোমাদের পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার পাঠশালায় জুটেছে; আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেছে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করিতে পারিনে। তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না; তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।

কেশব লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনতমুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বদ্যি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে—যেমন আমি করেছি, কিন্তু তোমাদের মত বড় বড় ডাক্তার প্রফেসারও আমল পায় না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল-কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভাল হয়, না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশী বুঝি; তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্ছ, আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্ত্তব্য আমাদের কথা শোনা।

বৃন্দাবন কহিল, দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান, তা দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্‌। কিন্তু তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পোনের-আনা লোকই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের

ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষা-ভূষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংস্রবে লেখাপড়া শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকেও মানে না, শ্রদ্ধা করে না,—বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পর তাদের মঙ্গলকামনা করো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভূষোকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া শেখা ছেলেরা অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কর্ম্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠবে না। এ যতক্ষণ না করছ ভাই, ততক্ষণ জন্ম জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠ-শালে ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বৃন্দাবন, বোধ করি তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তা হলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাজে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে, আমরা কি করে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?

বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বললুম, আচার-ব্যবহারে। আমাদের ষোল-আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জ্জন করে, আমাদের বাস-স্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা হলে কোনদিনই আমরা বুঝতে পারব না, তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থ-ই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর?

না।

জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?

খাই।

মুসলমানের হাতের রান্না?

প্রেজুডিস্ নেই। খেতে পারি।

তা হলে আমিও বলতে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা—কিংবা আরও কিছু বেশী—সেটা

বললে তুমি রাগ করবে।

ধৃষ্টতা?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের ভাল করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধি-বিবেচনায় ধর্ম্মে-কর্ম্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালের কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার আসব, বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি হইলেও কেশব শহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্যবন্ধুকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তেআস্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেছি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেছি—বুঝলে ত?

কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেছি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থ-ই একটা মানুষ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই! তার পর?

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙে গেছে; শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এ-গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্ছ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েছে, সেখানে ক খ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ-কাজ কি গভর্ণমেণ্টের করা উচিত নয়?

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হ'ল। দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তক্ষনি দুই হাত তুলে বলবে—পণ্ডিত-মশাই, মাধুও করেছে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশ-জোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে গভর্ণমেণ্ট তাঁর কর্ত্তব্য করেন কি না। নিজের কর্ত্তব্য করার আগে পরের কর্ত্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জন-কতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে একমুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা ঠিক হ'ল না

ভাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, ত এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরী হয় না কেশব, বরং আশীর্ব্বাদ কর যেন এই অতি ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্ব্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালায় একটি সর্ত্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখতে পেতে প্রত্যহ বাড়ি যাবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি-একটি ছেলেকেও লেখা-পড়া শেখাবে। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাংলাদেশে একটি লোকও মূর্খ থাকবে না।

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ—কি ভয়ানক আশা!

বৃন্দাবন বলিল, সে বলতে পার বটে। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমারও ভয় হয় দুরাশা, কিন্তু সবল মুহূর্ত্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ!

কেশব কহিল, বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখলে জবাব দেবে বল?

এ আর বেশী কথা কি কেশব?

বেশী কথাও আছে, বলছি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?

তাও করব, বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

১১

ঠাকুরের দোল-উৎসব বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিতেন। কাল তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে বৃন্দাবন অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই, মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, বৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা।

জননীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বৃন্দাবন ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, আমি ত চিনিনে বাছা, তোর পাঠশালার একটি ছাত্তর বাইরে বসে বড় কাঁদচে—তার বাপ নাকি ভেদ-বমি হয়ে আর উঠতে পারচে না।

বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কাঁদিয়া

উঠিল। পণ্ডিত মশাই, বাবা আর চেয়েও দেখচে না, কথাও বলচে না।

বৃন্দাবন সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিবুর তখন শেষ সময়। প্রতি বৎসর এই সময়টায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা-রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘণ্টা-খানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।

বাঙলাদেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আপনা-আপনি শিক্ষিত এক-আধজন ডাক্তার বাস করেন, এ-গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন। কাল রাত্রে তাঁহাকে ডাকিতে যাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দু'টাকা ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ঠিক জানিতেন, ধারে কারবার করিলে, এ-সব রোগে তাঁহার ঔষধ-খাওয়া ছোটলোকগুলা পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া 'নুন-জল' খাওয়াইয়া, স্বামীর শেষ চিকিৎসা সমাধা করিয়া, সারা রাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে। তারপর সকালবেলা এই।

বৃন্দাবন বড়লোক, এ-গ্রামে তাহাকে সবাই মান্য করিত। মৃত স্বামীর 'গতি' করিয়া দিবার জন্য শিবুর সদ্য-বিধবা তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল, তাহার অনশন ও অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও বৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক 'গতি' করিয়াছে, শিবুরও 'গতি' করিয়া অপরাহ্ন বেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয় বো'স ষষ্ঠীচরণ, বলিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল।

ছেলেটি বার-দুই ঠোঁট ফুলাইয়া 'পণ্ডিত মশাই' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

সদ্য পিতৃহীন শিশুকে বৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কেষ্টাও বমি কচ্চে।

কেষ্টা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সহিত পাঠশালে লিখিতে পড়িতে আসিত।

আজ রাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই বৃন্দাবনের সহিত কেষ্টাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিভ দেখিলেন, ঔষধ দিলেন,

কিন্তু অবাধ্য কেষ্টা মায়ের বুক-ফাটা কান্না, চিকিৎসকের মর্য্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না রাত্রি ভোর না হতেই গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিশ্রুত হাত-যশ খারাপ করিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সদ্য-বিধবা জননীর মর্ম্মান্তিক বিলাপে বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে চাহিয়া সহস্রবার মনে মনে বলিল, মানুষের দোষের শাস্তি আর যা ইচ্ছে হয় দিয়ো ভগবান, শুধু এই শাস্তি দিয়ো না—জানি না, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতে পাইলেন কি না, কিন্তু নিজে আজ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যাহারই থাক্, তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই-তিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী ওলাউঠায় মর-মর হইয়াছে।

মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘণ্টা-খানেক পরে আর্ত্ত ক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এবার গ্রামে মহামারি শুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল; অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা ভীত শুষ্ক-মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, অন্ন-জল ফুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিবে?

বৃন্দাবনের বাড়ির সুমুখ দিয়াই বড় পথ, তথায় যখন তখন ভয়ঙ্কর হরি-ধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্ন জল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশ-পাশের গ্রামেও দুই-একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাড়লের অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

নদী নাই, যে দুই-চারিটা পুষ্করিণী পূর্ব্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! অথচ কাহারো তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আহার্য্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্য্যন্ত তাহার ভাল-মন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই, তিনি গরীবের ঘরে যাইবার সময় পান না, অথচ মহামারি প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ক্রমশঃ এমন হইয়া

উঠিল যে, ঔষধ-পথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহের সংকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।

শুধু বৃন্দাবনের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রসিকের স্ত্রীর মৃত্যু ব্যতীত এই পাঁচ-সাতটা বাটীতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই।

বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জল তখনও দুষ্ট হয় নাই, প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

কিন্তু, প্রতিদিন বৃন্দাবন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের মুখের পানে চাহিলেই তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয় অলক্ষ্যে অভেদ্য অন্তরায় তাহাদের পিতাপুত্রের মাঝখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু শুনিলেই চমকাইয়া উঠে। ডাকিতে আসিলে যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রতি পদক্ষেপ বিচারালয়ের অভিমুখে অপরাধীর চলনের মত দেখায়। শুধু তাহার চিরদিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। মৃতদেহ সংকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়, অজ্ঞাতসারে কোন্ সংক্রামক বীজ বুঝি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে তাহাকে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

পাঠশালা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চরণের মুখের দিকে চাহিয়া, ইহাও তাহাকে ক্লিষ্ট করে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার খাওয়া, পরা, শোওয়া সমস্তই নিজের হাতে লইয়াছিল, এ বিষয়ে মাকেও যেন সে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমনি সময়ে একদিন মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের প্রতিবেশী তারিণী মুখুয্যের ছোট ছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, খবর শুনিয়া তাহার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর না বাবা। এবার চরণকে নিয়ে তুই বাইরে যা।

বৃন্দাবন ছল ছল চক্ষে বলিল, মা! তুমিও চল।

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুর-ঘর ফেলে রেখে!

পুরুতঠাকুরের উপর ভার দিয়ে চল।

মা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরের ভার অপরে নেবে, আর আমি পালিয়ে যাব?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া বলিল, তা নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দু'দিন পরে ফিরে এসে তুলে নিয়ো।

মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয় না বৃন্দাবন। আমার শাশুড়ীঠাকরুণ

এ ভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন তেমন করে দিতে পারি, তবেই দেব, না হলে আমারই থাক্। কিন্তু, তোরা যা।

বৃন্দাবন উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, এই সময়ে কি করে তোমাকে একা রেখে যাব, মা? ধর যদি—

মা একটু হাসিলেন। বলিলেন, সে ত সুসময় বাবা! তখন জানব, আমার কাজ শেষ হয়েচে, ঠাকুর তাঁর ভার অপরকে দিতে চান। তাই হোক বৃন্দাবন, আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোরা নির্ভয়ে যা, আমি ঠাকুর-ঘর নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

জননীর অবিচলিত কণ্ঠস্বরে অন্যত্র পালাইবার আশা বৃন্দাবনের তিরোহিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সেও দৃঢ়স্বরে কহিল, তা হলে আমারও যাওয়া হবে না। তোমার ঠাকুর আছেন, আমারও মা আছেন। নিজের জন্য আমি এতটুকু ভয় পাইনি মা, শুধু চরণের মুখের দিকে চাইলেই আমি থাকতে পারিনে। কিন্তু যাওয়া যখন কোনমতেই হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়েই নিশ্চিত হয়ে নির্ভয়ে থাকব। এখন থেকে আর তুমি আমার শুকনো মুখ দেখতে পাবে না মা।

তারিণী মুখুয্যের ছোটছেলে মরিয়াছে। পরদিন সকালবেলা বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল, তাহাদের পুকুরের ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতগুলি কাপড়-চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকী আছে। বস্ত্রখণ্ডগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, মড়ার কাপড়-চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করছেন?

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভেতর হইতে কি বলিল, তাহা বোঝা গেল না।

বৃন্দাবন বলিল, যতটা অন্যায় করেছেন তার ত আর উপায় নেই, কিন্তু আর ধোবেন না—উঠে যান।

সে পরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, তারিণী দ্রুতপদে এই দিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখ-মুখ করিয়া বলিল, তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নামতে দাওনি?

বৃন্দাবন কহিল, তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেছি!

তারিণী চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় ধোবে? থাকব বাড়লে, ধুতে যাবো বদ্দিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন,—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে

ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্ব্বংশ হ'বি।

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু চেঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয়; তাই আত্মসংবরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করেছেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না?

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়-চোপড় কাচে না ত কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু?

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ির কোন লোককে আমি পুকুরে নাব্‌তে দেব না।

নাব্‌তে দিবিনে ত, আমরা যাব কোথায় বলে দে?

বৃন্দাবন কহিল, এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়-চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটলোক হয়ে তোর এত বড় মুখ? তুই বলিস্ মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতে বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে!

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসী-চাকর নেই, তখন, মানুষ হ'ন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না। বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কি না করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে ঘোষাল মহাশয় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, হাঁ বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্ছে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ না কি?

বৃন্দাবন কহিল, ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেছি, জল তোলা বন্ধ করিনি।

ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্চি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

বিজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ্ বৃন্দাবন।

শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু?

বৃন্দাবন এক কথা একশবার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানিনে।' যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ মলে ওসব পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ও-সব চলবে না, বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রজ্ঞানী ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্ব্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু বৃন্দাবন ঠিক জানিত, এইখানে ইহার শেষ নয়, তাই সে একটা লোককে পুষ্করিণীর জল পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। লোকটা সমস্তদিনের পর রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া সংবাদ দিল, পুকুরের জলে কাপড় কাচা হইতেছে এবং তারিণী মুখুয্যে কিছুতেই নিষেধ শুনিতেছেন না। বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তারিণীর বিধবা কন্যা বালিশের অড়, বিছানার চাদর, ছোট বড় অনেকগুলি বস্ত্রখণ্ড জলে কাচিয়া জলের উপরেই সেগুলি নিঙড়াইয়া লইতেছে, তারিণী নিজে দাঁড়াইয়া আছে।

১২

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দ্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর মায়ের কাছে যাবি রে চরণ?

চরণ নাচিয়া উঠিল—যাব বাবা।

বৃন্দাবন মনে মনে একটু আঘাত পাইয়া বলিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে অনেকদিন থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে?

চরণ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, পারব।

বস্তুতঃ, এ-দিকের সূক্ষ্ম বাঁধা-ধরা আঁটাআঁটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পায় না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাথীদের মুখ দেখিতে পর্য্যন্ত পায় না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কি-রকম একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ও-দিকে মায়ের অগাধ স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা, স্নান, আহার, খেলা কিছুতে নিষেধ

নাই, হাজার দোষ করিলেও হাসিমুখের সস্নেহে অনুযোগ ভিন্ন কাহারও ভ্রূকুটি সহিতে হয় না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

তবে যা, বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাক্স জামায়-কাপড়ে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল এবং সজল চক্ষে ছেলের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দুঃখের ভিতরেও একটা সুগভীর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিল, এবং প্রত্যহ না হোক, একদিন অন্তরেও সংবাদ জানাইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারি না।

গাড়ি যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এ-দিক ও-দিক করিয়া হঠাৎ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে কুসুম রাগ করে। মনে মনে বলিল, না, কাজটা ঠিক হ'ল না। অত বড় একজেদী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে হয়ত উল্টো বুঝে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠবে। একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া অবিলম্বে গাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জনাথের বাটীর সুমুখে আসিয়া বাহির-বাটীর চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাব।

সাড়া পাইয়া কুসুম ঘর হইতে 'দাদা' বলিয়া বাহিরে আসিয়াই অকস্মাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া ঈর্ষায় অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া, চক্ষের নিমিষে পিছাইয়া ঘরে ঢুকিল। চরণ পূর্ব্বের মত মহোল্লাসে চেঁচামেচি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথায় রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কৈ ?

কি জানি কোথায় বেড়াতে গেছেন।

বৃন্দাবন কহিল, দেখে মনে হয়, এ যেন পোড়ো বাড়ি। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না ?

না।

কোথায় ছিলে ?

মাসখানেক পূর্ব্বে কুসুম দাদার শাশুড়ীর সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে কথা না বলিয়া তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিল, এখানে সেখানে নানা জায়গায় ছিলুম।

অন্যবারে কুসুম সর্ব্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এবার তাহা দিল না দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলিল, দাঁড়িয়ে রয়েচি, একটা বসবার জায়গা দাও।

কুসুম তেমনি অবজ্ঞাভরে বলিল, কি জানি, কোথায় আসন-টাসন আছে, বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পা নড়িল না।

বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও এত বড় অবহেলা তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সেদিনের উত্তেজনাবশতঃ কলহ করিয়া ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল না, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নম্রস্বরে বলিল, আমি বেশীক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। যেজন্য এসেচি, বলি। আমাদের ওখানে ভারি ব্যারাম হচ্চে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।

কুসুম এতদিন এখানে ছিল না বলিয়াই ব্যারাম-স্যারামের অর্থ বুঝিল না; তীব্র অভিমানে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিল; ওঃ—তাই দয়া করে নিয়ে এসেচ? কিন্তু অসুখ-বিসুখ নেই কোন্ দেশে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে করব কি সাহসে?

বৃন্দাবন শান্তভাবে কহিল, আমি যে সাহসে করি, ঠিক সেই সাহসে। তা'ছাড়া তোমাকেই বোধ করি, ও সবচেয়ে ভালবাসে।

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, মা, বাবা বলেচে, আমি তোমার কাছে থাকব—নাইতে যাবে না মা?

কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে শুনাইয়া কহিল, আমার কাছে তোমার থেকে কাজ নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।

বৃন্দাবন অতিশয় ম্লান একটুখানি হাসিয়া কহিল, তা'ও শুনেচ। আচ্ছা, বলচি তা' হলে। মা একা আর পেরে উঠছে না বলেই একবার ও-কথা উঠেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেছে।

থামল কেন?

তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু সে-কথায় আর কাজ নেই।—চরণ, আয় রে, আমরা যাই—বেলা বাড়চে।

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, বাবা, কাল যাব।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না কহিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট-দুই পরে বৃন্দাবন গম্ভীর-স্বরে ডাক দিয়া বলিল, আর দেরি করিসনে রে, আয়, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনদের আদেশ পালন করিতে শিখিয়া-

ছিল, তথাপি সে মায়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুব্ধ মুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়োয়ান গরু দুটাকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতা-পুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুর; হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া আড়ালে থাকিয়াই ডাকিল, একবার শোনো।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া কহিল, কি?

তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল?

না।

তবে, এমন রোগা দেখাচ্চে কেন?

তা ত' বলতে পারি নে। বোধ করি ভাবনায়-চিন্তায় শুকনো দেখাচ্ছে।

ভাবনা-চিন্তা! স্বামীর শীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তাহার জ্বালাটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, শেষ কথায় পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিল। শ্লেষ করিয়া কহিল, তোমার ত ষোলো-আনাই সুখের! ভাবনা কি শুনি?

বৃন্দাবন ইহার জবাব দিল না। গাড়ি প্রস্তুত হইলে, চরণ উঠিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, তোর মাকে প্রণাম করে এলিনে রে?

সে নামিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরের মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুসুম ব্যগ্র-ভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও এ কথাটা সে বুঝিয়াছিল, মাতা তাহাকে আজ আদর করে নাই, এবং সে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখে নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, কে জানে, যদি আর কখনও না বলতে পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই। আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাঁই দিলে না, কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে দিয়ো।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—ও-সব আমি শুনতে চাইনে।

তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসেছিলুম।

আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?

বৃন্দাবনের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল, বলিল, তবুও সেই রাগের কথা! কুসুম শুনি তুমি অনেক শিখেচ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড়-শেখা এটা কেন শেখোনি! কিন্তু তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে কার হাতে হয় বল?

কুসুম হঠাৎ এ-কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

গরু দুটা বাড়ি ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, বাবা, এসো না!

কুসুম সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মহা অভিমান-ভরে তাহার পরলোকগত জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'মা হইয়া এ কি অসহ্য শত্রুতা সন্তানের প্রতি সাধিয়া গিয়াচ মা! যদি, যথার্থ-ই আমার অজ্ঞানে কলঙ্কে আমাকে ডুবাইয়া গিয়াছ, যদি, সত্যিই নিজের ঘৃণিত দর্পের পায়ে আমাকে বলি দিয়াছ, তবে সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাও নাই কেন? কার ভয়ে সমস্ত চিহ্ন এমন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেলে? আমার অন্তর্যামী যাহাদিগকে স্বামী-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সুমুখে সে-কথা সপ্রমাণ করিবার রেখামাত্র পথ অবশিষ্ট রাখ নাই কেন? আজ তাহা হইলে কে আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, কোন নির্লজ্জ স্বামী, স্ত্রীকে অনাথিনীর মত নিজের আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিতে সাহস করিত? কিংবা, সত্যাই যদি আমি বিধবা, তাই বা নিঃসংশয়ে জানিতে পাই না কেন? তখন কার সাধ্য বিধবার সম্মুখে রূপের লোভে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস করিত?

একস্থানে এক ভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, ভগবান্, আমার যা হোক একটা উপায় করে দাও। হয় মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে স্বামীর ঘরে যাইতে দাও, না হয় ছেলেবেলার সেই নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরাইয়া দাও, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

১৩

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, সেদিন দাদার মুখে এই সংবাদ শুনিবার পরে কি করি, কোথায় পালাই, এমনি যখন তাহার মানসিক অবস্থা, সেই সময়েই দাদার শাশুড়ির সঙ্গে তীর্থে যাইবার প্রস্তাবে সে বিনা বাক্যব্যয়ে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। কুঞ্জর শাশুড়ী কুসুমকে নিতান্তই দাসীর মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই-মত ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-সব ছোট-খাটো বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্য কুসুমের ছিল না, তাই নলডাঙ্গায় ফিরিয়া যখন সে বাড়ি আসিতে চাহিল, এবং তিনি সাপের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, ক্ষ্যাপার মত কথা ব'লো না বাছা। আমাদের বড়লোকের শত্তুর পদে পদে—তুমি সোমত্ত মেয়ে, সেখানে একলা পড়ে থাকলে আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারব না। তখনও কুসুম প্রতিবাদ করে নাই।

তিনি ক্ষণেক পরে কহিলেন, ইচ্ছে হয়, দাদার সঙ্গে যাও, ঘর-দোর দেখে দাদার সঙ্গেই ফিরে এসো। একলা তোমার কিছুতেই থাকা হবে না, তা বলে দিচ্ছি।

কুসুম তাহাতেই রাজী হইয়া কাল সন্ধ্যায় ঘর-দোর দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ চরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার ঘণ্টা-দুই পরে কুঞ্জনাথ জমিদারী চালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, স্নানাহার করিয়া নিদ্রা দিল এবং বেলা পড়িলে বোনকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিল। কুসুম ঘর-দোরে চাবি দিয়া, নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়া বসিল। সে জানিত, দাদা ইহাদের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাই সকালের কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু। বয়স এখনও পোনের পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথার বাঁধুনি ও বিষের জ্বলনে তাহার মাকেও হার মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত।

এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে, কি জানি কেন, চোখের দেখা মাত্রই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুশী হন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে যা-তা বলিতে লাগিল।

বাড়ির সম্মুখেই পুষ্করিণী, দিন তিন-চার পরে, একদিন সকালে সে তার কতকগুলো বাসন লইয়া ধুইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুতীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হাঁ ঠাকুরঝি, মা তোমাকে ক'টাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা?

মা অদূরে ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া কাজ করিতেছিল, মেয়ের তীব্র শ্লেষাত্মক প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এ তোর কি রকম কথার ছিরি লা? মানুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে?

মেয়ে উত্তর দিল, আপনার জন আমার, তোমার এ কে, যে দুঃখী মানুষকে দিয়ে দাসী-বৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না?

প্রত্যুত্তরে মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হাত হইতে বাসনগুলো একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন।

কুসুম হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া, 'তা যাক', বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই-তিনদিন তিনি কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া বেশ রাগ-ঝাল করিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য্য হইল।

কাল রাত্রে শরীর ভাল নাই বলিয়া কুসুম খায় নাই, আজ সকালেই গৃহিণী স্নানাহ্নিক করিয়া খাইয়া লইবার জন্ত তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া চুপিচুপি কহিল, মা ভোল ফেরালেন কেন, তাই ভাবচি ঠাকুরঝি!

কুসুম চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু মেয়ে মাকে বেশ চিনিত, তাই দু'দিনেই এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ সন্দেহ করিয়া মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন বলিয়া গৃহিণীর এক বোনপো ছিল, সে অপরিমিত তাড়ি ও গাঁজা-গুলি খাইয়া চেহারাটা এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, বয়স পঁয়ত্রিশ কি পঁয়ষট্টি তাহা ধরিবার জো ছিল না। কেহ মেয়ে দেয় নাই বলিয়া এখনো অবিবাহিত। বাড়ি ও-পাড়ায়, পূর্ব্বে কদাচিৎ দেখা মিলিত, কিন্তু সম্প্রতি কোন অজ্ঞাত কারণে মাসীমাতার প্রতি তাহার ভক্তি-ভালবাসা এতই বড় হইয়া উঠিল যে, প্রত্যহ যখন তখন মাসীমা, বলিয়া হাজির হইয়া, তাহার ঘরে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্নে ব্রজেশ্বরী কুসুমকে লইয়া পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। জলে নামিয়া, ঘাটের অদূরে একটা ঘন কামিনী ঝাড়ের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ায় দেখিল, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধন একদৃষ্টে চাহিয়া আছে; তখন আর কিছু না বলিয়া, কোনমতে কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সে উঠোনের উপর দাঁড়াইয়া মাসীর সহিত কথা কহিতেছে। কুসুম আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া গেল, ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা গোবর্দ্ধন দাদা, আগে কোনকালে তোমাকে ত দেখতে পেতাম না, আজকাল হঠাৎ এমন সদয় হয়ে উঠেচ কেন বল ত? বাড়ির ভেতরে আসা-যাওয়াটা একটু কম করে ফ্যালো।

গোবর্দ্ধন জানিত না, সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, এই প্রশ্নের ভাবে উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—জবাব দিতে পারিল না।

কিন্তু মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চোখ রাঙা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আগে ওর ইচ্ছে হয়নি, তাই আসেনি, এখন ইচ্ছে হয়েছে, আসচে। তোর কি?

মেয়ে রাগ করিল না, স্বাভাবিক-কণ্ঠে বলিল, এই ইচ্ছেটাই আমি পছন্দ করিনে। আমার নিজের জন্যও তত বলিনে মা, কিন্তু আমার ননদ রয়েচে, পরের মেয়ে, তা ত মনে রাখতে হবে।

মা সপ্তমে চড়িয়া উত্তর করিলেন, পরের মেয়ের জন্য কি আমার আপনার বোনপো ভাইপোরা, পর হয়ে যাবে, না বাড়ি ঢুকবে না! তা ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পরদার বিবি, না কারু সামনে বার হন না? ওলো, ও যেমন করে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্য্যন্ত লজ্জা হয়।

ব্রজেশ্বরী বুঝিল, মা কি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই সে থামিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, এই কুসুমেরই কত কথা, কত ভাবে, কত ছাঁদে, সে দু'দিন আগে মায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু তখন আলাদা কথা ছিল, এখন সম্পূর্ণ আলাদা কথা দাঁড়াইয়াছে। তখন কুসুমকে যে ভালবাসে নাই, এখন বসিয়াছে। এবং

এ ধরণের ভালবাসা ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ব্রজেশ্বরী যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া গোবর্দ্ধনের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, গোবর্দ্ধন দাদা, ভারী লজ্জার কথা ভাই, মুখ ফুটে বলতে পারলুম না, কিন্তু আমি দেখেচি। দাদার মত আসতে পার ত এসো, না হলে তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—সে দুঃখ মাও ঠেকাতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি। বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন, কি হয়েচে রে গোবর্দ্ধন?

গোবর্দ্ধন মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, তোমার দিব্যি মাসী, আমি জানিনে—কোন্ শালা ঝোপের ভিতরে—মাইরি বলচি—একটা দাঁতন ভাঙতে—জিজ্ঞেস করবে চল ময়রাদের দোকানে—আসুক ও আমার সঙ্গে ও-পাড়ায়, ভজিয়ে দিচ্চি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন সরিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া কুসুমের ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও সে ভিজা কাপড়ে স্তব্ধ হইয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন বৌ, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেলে? আমাকে কি তুমি এখানেও টিকতে দেবে না?

আগে কাপড় ছাড়, তারপর বলচি, বলিয়া সে জোর করিয়া তাহার আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া কহিল, অন্যায় আমি কোনমতেই সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, তা তোমার জন্যই হোক, আর আমার জন্যই হোক। ও হতভাগাকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না—ওর মতলব আমি টের পেয়েচি।

জননীর কথাটা সে লজ্জায় উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কুসুম কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, মতলব যার যাই থাক বৌদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার কথা নিয়ে কথা কয়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।

কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে বিপদ হবে কেন?

কুসুম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, হবেই। চোখে দেখচি হবে, কপালে সজোরে আঘাত করিয়া কহিল, এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেই-খানেই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে যাবে। বোধ করি, স্বয়ং ভগবান আমাকে রক্ষা করতে পারেন না! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—বোধ করি নিতান্ত মিথ্যে বলনি। রাগ করো না ভাই, কিন্তু শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন? তোমার নিজের দোষও কম নয় ঠাকুরঝি!

কুসুম তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নিজের দোষ কি? আমার ছেলেবেলার ঘটনা শুনেচ ত?

শুনেচি। কিন্তু সে আগাগোড়া মিথ্যে। সমস্ত জেনে শুনে এ'স্ত্রী মানুষ তুমি—সিঁদুর পর না, নোয়া হাতে রাখ না, স্বামীর ঘর কর না, এ কপালের দোষ, না তোমার নিজের দোষ ভাই? তখন না হয় জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েচে ত? তুমি বল, কোন্ সধবা রাগ করে বিধবার বেশে থাকে?

সমস্তই জানি বৌ, কিন্তু আমি সিঁদুর নোয়া পরে থাকলেই ত লোকে শুনবে না। কে আমার স্বামী? কে তার সাক্ষী? তিনিই বা আমাকে শুধু শুধু ঘরে নেবেন কেন?

ব্রজেশ্বরী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়া বলিল, সে কি কথা ঠাকুরঝি? এর চেয়ে বেশী প্রমাণ কবে কোন্ জিনিসের হয়ে থাকে? তুমি কি কিছুই শোননি, ঐ কথা নিয়ে কি কাণ্ড নন্দ-জ্যাঠার সঙ্গে এই বাড়িতেই হয়ে গেল? একটুখানি চুপ করিয়া পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, কেন, তোমার দাদা ত সমস্তই জানেন, তিনি বলেননি? আমি মনে করেচি, তুমি সমস্তই জেনে শুনেই এখানে এসেচ; তাই পাছে রাগ কর, মনে দুঃখ পাও, সেইজন্যে কোন কথা বলিনি, চুপ করেই আছি। বরং তুমি এসেচ বলে প্রথম দিন তোমার উপর রাগ পর্য্যন্ত হয়েছিল।

কুসুম উদ্বেগে অধীর হইয়া বলিল, আমি কিছু শুনিনি বৌ, কি হয়েছিল বল।

ব্রজেশ্বরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বেশ! যেমন ভাই, তেমনি বোন। ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে নন্দ-জ্যাঠার মেয়ের যখন সম্বন্ধ হয়, তখন তোমরা পশ্চিমে ছিলে, তখন তোমার দাদাই অত হাঙ্গামা বাধালে, আর শেষে সে-ই চুপ করে আছে। আমার শাশুড়ীর কথা, তোমার কথা, ওদের কথা, সমস্তই ওঠে। তখন নন্দ-জ্যাঠা অস্বীকার করেন, পাছে তার মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়। তার পরে ঠাকুরবাড়ির বড়-বাবাজীকে ডেকে আনা হয়; তিনি মীমাংসা করে দেন, সমস্ত মিথ্যে। কারণ, একে ত তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে, আমাদের সমাজে এ-সকল কাজ হতেই পারে না, তা ছাড়া তিনি নন্দ-জ্যাঠাকে হুকুম দেন, যে এ-কাজ করিয়েছিল তাকে হাজির করিয়ে দিতে। তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয় কণ্ঠিবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু হয়নি।

কুসুম আশঙ্কায় নিশ্বাস রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, হয়নি? বৌ, আমি মনে মনে জানতুম। কিন্তু আমার কথাই বা এত উঠল কেন?

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিল, তোমার দাদার একটুখানি বাইয়ের ছিট আছে কি না, তাই। অপর কেউ হয়ত চক্ষু-লজ্জাতেও এত গণ্ডগোল করতে চাইত না, কিন্তু ওঁর ত সে বালাই নেই, তাই চতুর্দ্দিকে তোলপাড় করতে লাগলেন, আমার বোনের যখন কোন দোষ নেই, মা যখন সত্যিই তার কণ্ঠিবদল দেননি, তখন কেন ঠাকুরজামাই তাকে নিয়ে ঘর করবে না, কেন আবার বিয়ে করবে, আর কেনই বা নন্দ-জ্যাঠা তাকে মেয়ে দেবে!

কুসুম লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া বলিল, ছি ছি, তার পরে?

ব্রজেশ্বরী কহিল, তার পরে আর বেশি কিছু নেই। আমার শাশুড়ীঠাকরুণ আর নন্দ-জ্যাঠাইমা এক গাঁয়ের মেয়ে, রাগে-দুঃখে, লজ্জায়-অভিমানে তোমাকে নিয়ে এই-খানেই আসেন, তাঁর ছেলের সঙ্গেই কথা হয়—কিন্তু হতে পায় নি। আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই নিজেও ত সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি তোমাকে কোন ছলে জানাননি? আগে শুনেছিলুম, তোমার জন্যে তিনি নাকি—

কুসুম মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, বৌ, সেদিন হয়ত তিনি তাই বলতেই এসেছিলেন।

ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌দিন? সম্প্রতি এসেছিলেন?

হাঁ, আমরা যেদিন এখানে আসি সেদিন সকালে।

তার পরে?

আমার দুর্ব্ব্যবহারে না বলেই ফিরে যান।

ব্রজেশ্বরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে। কুঞ্জে ঢুকতে দাওনি, না কথা কওনি?

কুসুম জবাব দিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজেশ্বরীও আর কোন প্রশ্ন করিল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল, চারিদিকে শাঁখের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি একটু ব'সো ভাই, আমি সন্ধ্যা দিয়ে প্রদীপ জেলে আনি, বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। প্রদীপ যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সত্যই কাজটা ভাল করনি দিদি। অবশ্য কি করেছিলে, তা আমি জানিনে, কিন্তু মনে যখন জানো তিনি কে, আর তুমি কে, তখন তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হয় নি।

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী কহিল, তোমাদের কথা তোমারই মুখ থেকে যতদূর শুনেচি, আমার তেমন অবস্থা হলে, পায়ে হেঁটে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি হুকুম দিতেন, সারা পথ নাকখত্‌ দিয়ে যেতে হবে, আমি তাই যেতুম!

কুসুম পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই এবার অস্ফুটে বলিল, বৌ, মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাজে করা শক্ত।

কিচ্ছু না। গেলে, স্বামী পাবো, ছেলে পাবো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত

পাওয়ার কাছে মেয়েমানুষের শক্ত কাজ কি দিদি? তাও যদি না পাই. তবু ফিরে আসতুম না—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে ভয়টা কি? বড় জোর বলতেন, 'তুমি যাও'; আমি বলতুম, 'তুমি যাও'—জোর করে থাকলে কি করতেন তিনি?

তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসাইবার জন্য, সান্ত্বনা দিবার জন্য বলে নাই। অধিকতর গম্ভীর হইয়া কহিল, সত্যি বলচি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনো না -যাও তাঁর কাছে। এমন বিপদের দিনে স্বামী-পুত্রকে একা ফেলে রেখো না।

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে কুসুম সব ভুলিয়া ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বিপদের দিন কেন?

ব্রজেশ্বরী বলিল, বিপদের দিন বই কি? অবশ্য, তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাউঠা শুরু হয়েছিল, তোমার দাদা এখনি বললেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে—প্রত্যহ দশজন বারজন করে মারা পড়চে—ছি ছি, ওকি কর—পায়ে হাত দিয়ো না ঠাকুরঝি।

কুসুম তাহার দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিইনি—আমি কিছু শুনিনি বৌদি—

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিল, বেশ, এখন শুনলে ত! এখন গিয়ে তাকে নাও গে!

কি করে যাবো?

ব্রজেশ্বরী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দোর ঠেলিয়া চৌকাঠের ও-দিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই তীব্র শ্লেষের সহিত বলিলেন, ঠাকুরঝি-ঠাকরুণকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্চে শুনি?

ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিক স্বরে কহিল, বেশ ত মা, ভেতরে এসো বলচি। তোমার কিন্তু কোন ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মতলব দেয় না, আমিও দিচ্চিনে।

মা বহুক্ষণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার মানে আমি লোকজনকে কু-মতলব দিয়ে থাকি, না? তখনি জানি, ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেচে, তখন এ বাড়িও ছারখার করবে। সাধে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, এই স্বভাব-রীতির গুণে!

মেয়েও তেমনি শক্ত কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুমের হাতের চিম্‌টি খাইয়া থামিয়া বলিল, সেইজন্যেই কালামুখীকে বলছিলুম, যা শ্বশুরঘর করগে যা, থাকিস্‌নে এখানে।

শ্বশুরবাড়ির নামে মা তাম্বুলরঞ্জিত অধর প্রসারিত ও তিলকসেবিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বলি কোন্ শ্বশুরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস্ লো? নন্দ বোষ্ট—

এবার ব্রজেশ্বরী ধমক দিয়া উঠিল—সমস্ত জেনে শুনে ন্যাকা সেজে খামোকা মানুষকে অপমান ক'রো না। শ্বশুরঘর মেয়েমানুষের দশ-বিশটা থাকে না যে, আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্দ্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুনতে হবে।

মেয়ের নিষ্ঠুর স্পষ্ট ইঙ্গিতে মা বারুদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মায়ের নামে এতবড় অপবাদ দিস্!

মেয়ে বলিল, অপবাদ হলেও বাঁচতুম মা, এ যে সত্যি কথা। মাইরি বলচি মা, তোমাদের মত দু-একটি বোষ্টম-মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়িমুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বোষ্টম বলতে মাথা কাটা যায়। থাক্. চেঁচামেচি ক'রো না, যদি অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দুঃখ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝিকে বাড়ে্শ পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা মুখে আসে তাই বলে আমাকে গাল দিয়ো; তোমার দিব্যি করে বলচি মা, কথাটি কব না।

মেয়ের সুতীক্ষ্ণ শরের মুখে, মা বুঝিলেন, যুদ্ধ এভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারাই পরাজয় হইবে, কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন, সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা তারা ঘরে নেবে কেন? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়, বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই। মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াসনে, বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তর না শুনিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানি উঁচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বোন, মিথ্যে কথা। মা জেনে শুনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে স্বীকার করচি—আচ্ছা, এখনি আসচি আমি, বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা সপ্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদন তাহাকে কর্ত্তব্যে বিচলিত করিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হতে পারে না। মা না বললে আমি চরণকে এখানে আনতে পারিনে।

ব্রজেশ্বরী কহিল, অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসো, তাঁরা কেমন আছেন।

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপরে! দশ-বিশটা রোজ মরচে সেখানে!

তবে কোন লোক পাঠিয়ে দাও, খবর আসুক।

তা হতে পারে বটে। বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম স্নান করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দাসী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, মা বারণ করলেন, দিদিঠাকরুণ, আজ আর রান্নাঘরে ঢুকো না।

কথাটা শুনিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন?

সে ত জানিনে দিদি, বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, তাহার সাক্ষৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ এ-ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে-জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে সময়ও যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সে আর একবার ব্রজেশ্বরীর সন্ধানে বাহিরে আসিতেছিল, মা সুমুখে আসিয়া বলিলেন, আর দেরি করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এস, এ-বেলার মত যা হোক মুখে দাও—তোমার দাদা ঠাকুরবাড়িতে মত জানতে গেছে।

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন মা নিজেই একটু করুণ-স্বরে বলিলেন, ব্যাটার বৌ যখন, তখন, ব্যাটার মতই অশৌচ মানতে হবে। যাই হোক, মাগী দোষে-গুণে ভালমানুষই ছিল। সে-দিন আমার ব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধ করতে এসে কত কথা! আজ ছ'দিন হয়ে গেল বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা সে যা হবার হয়েচে, এখন মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন। কি নাম বাছা তার? চরণ না? আহা! রাজপুত্তুর ছেলে, আজ সকালে তারও দু'বার ভেদ-বমি হয়েচে।

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে, ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরঝিকে তোরা কেউ দেখেছিস্ রে?

না দিদি, সেই সকালে দেখেছিলুম।

পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, সে কি কথা? কোথায় গেল তবে সে?

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, জানিনে, আমি ঘর-দোর-পুকুর-বাগান সমস্ত খুঁজেচি, কোথাও পাচ্চিনে।

চোখের জল ও পুকুরের উল্লেখে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল—তবে সে আর নেই। মার গঞ্জনা সইতে না পেরে নিশ্চয় সে ডুবে মরেচে, বলিয়া ছুটিয়া বাইরে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, শোনো—অমন ক'রে যেয়ো না—

আমি কিছু শুনতে চাইনে, বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে মেয়েমানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, মা আমার বোনকে মেরে ফেলেচে—আর আমি থাকব না, আর এ বাড়ি ঢুকব না—ওরে কুসুম রে—

তাহার শাশুড়ী কিছুই জানিতেন না, চীৎকারের শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল—ওই রাক্ষুসীই আমার ছোটবোনটিকে খেয়েছে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এসেছিলুম রে—ওরে আমার কি হ'ল রে!

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—দূর হ—দূর হ! ছুঁসনি আমাকে।

ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার জোর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, শুধু কাঁদলে আর চেঁচালেই কি বোনকে ফিরে পাবে? আমি বলচি সে কক্ষণ ডুবে মরেনি!

কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, এক ভাবেই কাঁদিতে লাগিল। এই বোনকে সে অনেক দুঃখ-কষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং যথার্থই তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত। পূর্ব্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন, তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল এবং তাহার অভিমানিনী ছোটবোনটির মৃতদেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, তুমি স্থির হও—আমি নিশ্চয়ই বলচি, সে মরেনি।

কুঞ্জ সজল-চক্ষে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন।

কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, সেখানে সে যাবে না। চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে দেখতে পারত না।

ব্রজেশ্বরী কহিল, এটা তোমাদের পাহাড়-পর্ব্বত ভুল। আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেও তার স্বামীকে তেমনি ভালবাসে। সে যাই হোক, চরণের জন্যেও ত সে যেতে পারে।

কিন্তু সে ত বাড়লের পথ চেনে না।

সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ভুল ক'রে পৌঁছুতে দেরি হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ে, নইলে বাড়ল সাত সমুদ্র তের নদীর পারে হলেও, সে একদিন না একদিন জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাও, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ফিরে এসো।

চললুম, বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ তাহার চকচকে বিলাতি জুতা, বহু মূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল শ্বশুরবাড়িতেই পড়িয়া রহিল। পোড়ারমুখী কুসীর শোকে, জমিদার কুঞ্জনাথবাবু ফেরিওয়ালা কুঞ্জ বোষ্টমের সাজে খালি পায়ে খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

১৪

ছয়দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পর কেহ কোন দিন এ অধিকার সুকৃতিবলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সেদিন তারিণী মুখুয্যের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভি-সম্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরনের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না, এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে; সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহুপরিমাণে মারিভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে, এমনি একটা বড় রকমের কূপ, যত ব্যয়ই হৌক, নির্ম্মাণ করাই-বার অভিপ্রায়ে সে কলিকাতায় কোন বিখ্যাত কল-কারখানার ফার্মে পত্র লিখিয়া-ছিল, কোম্পানী লোক পাঠাইয়াছিলেন, জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথাবার্ত্তা ও চুক্তি-পত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা, দাসী ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুলচেন না?

বৃন্দাবন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, মা কি এখনো শুয়ে আছেন ?

হাঁ দাদা, ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্চিনে।

বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিল, ওমা—মাগো !

কেহ সাড়া দিল না। বাড়ি-শুদ্ধ সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দমাত্র আসিল না। তখন লোহার সাবলের চাড় দিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলামাত্রই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ; যেন মুখের উপর সজোরে ধাক্কা মারিয়া সকলকে বিমুখ করিয়া ফেলিল। সে ধাক্কা বৃন্দাবন মুহূর্ত্তের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চাহিল।

শয্যা শূন্য। মা মাটিতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্নপ্রায়। ঘরময় বিসূচিকার ভীষণ আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেঝেয় পড়িয়া আর উঠিতে পারেন নাই। জীবনে কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে চাহিতেন না, তাই মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘুম ভাঙাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার এমন অকস্মাৎ, এরূপ শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সহ্য করা মানুষের সাধ্য নহে। বৃন্দাবনও পারিল না। তথাপি নিজেকে সোজা রাখিবার জন্য একবার প্রাণপণ-বলে চৌকাট চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল ; মিনিট-কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে। বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকল্প জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি নেই। কোথায় গেছেন, এ-বেলা ফিরবেন না।

মায়ের সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল, পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপাইয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা কাহারও কানে গেল না বটে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে পৌঁছিল।

তখন তুলসী-মঞ্চমূলে শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল, কতক্ষণ গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পরে মলিন-শ্রান্ত চক্ষু দুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া গেল।

অতঃপর এই ছয়টা দিন-রাত বৃন্দাবনের কাটিল শুধু এই জন্যে যে, তাহা ভগবানের

হাতে। তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু চরণ আর খেলাও করে না, কথাও কহে না। বৃন্দাবন তাহাকে কত রকমেরই মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল—নানাবিধ কলের গাড়ি, জাহাজ, ছবি-দেওয়া পশু-পক্ষী—যে সমস্ত লইয়া ইতিপূর্ব্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে দিকেও চাহে না।

সে-বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমাকে যখন চাদর-চাপা দিয়া ঘাটে তুলিয়া বিকট হরিধ্বনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিল।

কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, কেন গরুর গাড়ির বদলে মানুষের কাঁধে অমন করিয়া মুড়িশুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাঁদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশ বিহ্বল বিষণ্ণ মূর্ত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু বৃন্দাবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, কোনদিকে মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্ব্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে যাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া যাইত, স্থির হইতে পাইত না।

এ-কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাসবাবু আসিয়া বসিতেন, কত-রকম করিয়া বুঝাইতেন, বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিত বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ, এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়ীরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল যে, অকস্মাৎ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে তাহার জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও এ ভগ্নপোত কিছুতেই বন্দরে পৌঁছিবে না। শেষ পরিণতি যার সমুদ্রগর্ভে, তাহার জন্য হাঁপাইয়া মরিয়া লাভ কি! এমন না হইলে তাহার অমন স্ত্রী জীবনের সূর্য্যোদয়েই চরণকে রাখিয়া অপসৃত হইত না, এমন অসময়ে কুসুমেরও হয়ত দয়া হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এবং সকলের উপর তাহার মা। এমন মা কে কবে পায়? তিনিও যেন স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন,—যাইবার সময় কথাটি পর্য্যন্ত কহিয়া গেলেন না। এমনি করিয়া তাহার বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখন বাড়ির পুরাতন দাসী আসিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, দাদা, শেষকালে ছেলেটাকেও কি হারাতে হবে? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকো না, আদর কর না, চেয়ে দেখ দেখি, কি রকম হয়ে গেছে!

তাহার কথাগুলো লাঠির মত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্দ্রার ঘোর ভাঙিয়া

দিল ; সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কি হয়েচে চরণের ?

দাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বালাই, ষাট ! হয়নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাক্‌চেন।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া ধীরপদে আড়াল হইতে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে !

দাসী ধমক দিয়া কহিল—ছিঃ, ও কি কথা দাদা ?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেকদিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

দাসী নিজের কাজে চলিয়া গেলে চরণ চুপি চুপি আবেদন করিল, মার কাছে যাব বাবা।

সে যে ঠাকুমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইহাতেই বৃন্দাবন মনে মনে ভারি আরাম বোধ করিল ; আদর করিয়া বলিল, তোর মা ত সে বাড়িতে নেই চরণ।

কখন আসবেন তিনি ?

সে ত জানিনে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চি।

চরণ খুশী হইল। সেইদিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, চরণকে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দুইদিন বাকি আছে ; সকালে বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপে কাজে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইল, ভেতরে চরণের ভেদ-বমি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নির্জ্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদ-বমির চেহারায় বিসূচিকা মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনের চোখের সুমুখে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, হাত-পা দুমড়াইয়া ভাঙিয়া পড়িল ; একবার কেশবকে খবর দাও, বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নীচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টা-খানেক পরে গোপাল ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ছেলেটিকে বাঁচান ! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক্, কিন্তু সে নির্দ্দোষ। অতি শিশু, ডাক্তারবাবু—একবার পায়ের ধুলো দিন, একবার তাকে দেখুন ! তার কষ্ট দেখলে আপনারও মায়া হবে !

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, তখন মনে ছিল না যে, তারিণী মুখুয্যে এই ডাক্তারবাবুরই মামা? ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান! সে-সময়ে মনে হয়নি, এই পা-দুটোই মাথায় ধরতে হবে!

বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলচি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করিনি। যা তাঁকে নিষেধ করেছিলাম—সমস্ত গ্রামের ভালর জন্যই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত জানেন, এ-সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায়।

গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, অন্যায় বই কি! মামা ভারি অন্যায় করেচে। আমি ডাক্তার আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু'ছত্তর ইংরিজী পড়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসচ! অত বড় পুকুরে দুখানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয়! আমি কচি খোকা! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা হয় তাই! নইলে বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ করতে চাও? এত দর্প! অত অহংকার? যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।

ছেলের জন্য বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—ঘাট মানচি, পায়ের ধুলো মাথায় নিচ্চি, ডাক্তারবাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। একশ টাকা দেব—দুশ টাকা, পাঁচশ টাকা—যা' চান দেব ডাক্তারবাবু, চলুন,—ওষুধ দিন।

পাঁচশ টাকা!

গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, কি জান বাপু, তা হ'লে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হতে হবে। এইমাত্র তাঁরাও এসেছিলেন,—না বাপু. তারিণীমামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহার-ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে, আমি ডাক্তার, আমার কি! টাকা নেব, ওষুধ দেব। কিন্তু, সে ত হবার জো নেই। তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু? কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু? তখন তোমাকে নিয়ে ত আমার কাজ চলবে না। বরং এক কাজ কর, ঘোষালমশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও—তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে পায়ে ধর গে—কি জান বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বললেই আমি—আজকাল টাটকা ভাল ভাল ওষুধ এনেচি—দিলেই সেরে যাবে।

বৃন্দাবন বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়া পুনরায় কহিলেন, ভয় নেই ছোকরা, যাও দেরি ক'রো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কাজ নেই—যাও, ছুটে যাও।

বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল।

তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া, কহিলেন, সন্ধ্যে-আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে। কেমন, ফলল কিনা! নির্ব্বংশ হলি কি না!

বৃন্দাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া স্বামীকে বলিলেন, ছি ছি, এমন অধর্ম্মের কাজ ক'রো না। যা হবার হয়েচে—আহা শিশু, নাবালক—বলে দাও গোপালকে ওষুধ দিক্।

তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল—তুই থাম মাগী! পুরুষ মানুষের কথায় কথা ক'সনে।

তিনি থতমত খাইয়া বৃন্দাবনকে বলিলেন, আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে, বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন পাগলের মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে-পায়ে ধরিতে লাগিল, না—তবু না।

এমন সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় পাশের বাড়ি হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, শাস্ত্রে আছে, কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এমনি করেই কলিকালে ধর্ম্মকর্ম্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্চে—কেমন হে তারিণী, সেদিন বলিনি তোমাকে, বেন্দা বোষ্টমের ভারি বাড় বেড়েচে। যখন ও আমার কথা মানলে না, তখন জানি, ওর উপর বিধি বাম! আর রক্ষে নেই! হাতে হাতে ফল দেখলে তারিণী?

তারিণী মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, আর আমি! সেদিন পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বলেছিলাম, নির্ব্বংশ হ। খুড়ো, আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে! এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠচে, এখনও জোয়ার-ভাঁটা খেলচে। বলিয়া ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার স্ব-শরবিদ্ধ ভূপতিত জন্তুটার মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে, তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া এই একমাত্র পুত্রশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সগর্ব্বে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণের দায়ে সে অনেক সাধিয়াছিল, অনেক বলিয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্র-বিয়োগ-বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রমকে জাগাইয়া দিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল-কামনার ফলে এই দুই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের তেজে সে নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাক্‌বিতণ্ডার শেষ মীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বিগ্ন শান্ত-মুখে পীড়িত সন্তানের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেশব তখন আগুন জ্বালিয়া চরণের হাতে-পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদাঘতপ্ত মরুতৃষ্ণার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত শুনিয়া সে উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়নি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, কলকাতায় চললুম। যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগদ ফিরব, না পাই, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্ব্বের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে যায় হে বৃন্দাবন! চললুম, পার ত ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখ ভাই! বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কেশব চলিয়া গেলে চরণ পিতাকে কাছে পাইয়া, 'মার কাছে যাব' বলিয়া ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত, কোনদিনই জিদ্ করিতে জানিত না, কিন্তু আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কাজ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার এবং মায়ের কাছে যাইবার উন্মত্ত-চীৎকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল। এই চীৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্নে, যখন হাতে পায়ে পেটে খিল ধরিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

চৈত্রের স্বল্প দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ি ঢুকিল। ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু, ঘরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়াই মুখ গম্ভীর করিয়া একধারে বসিলেন। কেশব সভয়ে তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শান্তভাবে কহিল, হাঁ, আমিই বাপ বটে; কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই, আপনার যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন। যে বাপ বারো ঘণ্টাকাল বিনা চিকিৎসায় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে পারে, তার সমস্ত সহ্য হয় ডাক্তারবাবু।

পিতার এত বড় ধৈর্য্যে ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তথাপি ডাক্তার হইলেও সে মানুষ, যে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিল।

বৃন্দাবন বুঝিয়া কহিল, কেশব, এখন আমি চললুম। পাশেই ঠাকুর-ঘর, আবশ্যক হলে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হবার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন দেখতে পাই, বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ম্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। যেদিন তাহারা কুঞ্জনাথের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যেদিন কুসুমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়া-

ছিলেন; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে ঢুকিয়াছে? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, পাশের ঘরেই আমার চরণ মরিতেছে। ভগবান, আমি সে নালিশ জানাইতে আসি নাই, কিন্তু পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে বাপের চোখের উপর বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে কেন? পিতৃহৃদয়ের এতটুকু সান্ত্বনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কি জন্য? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের বহুবার কথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত! সে মনে মনে বলিল, যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে না, তাদের কথা তাহারাই জানে, কিন্তু আমি ত নিশ্চয় জানি তোমার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি শুষ্ক পাতাও মাটিতে পড়ে না; তাই আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ? আমার এই অতি ক্ষুদ্র একফোঁটা চরণের মৃত্যুতে সংসারে কাহার কি উপকার সাধিত হইবে? যদিও সে জানিত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মানবের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, তথাপি, এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিত্ত প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জন্মিল, কেনই বা এত বড় হইল এবং কেনই বা তাহাকে একটি কাজ করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল!

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পদশব্দে ধ্যান ভাঙিয়া যখন বৃন্দাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম ঝঞ্ঝা শান্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু মেঘ-মুক্ত নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশের তলে ভবিষ্যৎ-জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে অমন আঁধারে-আড়ালে বসিয়া আছে!

বৃন্দাবন কাছে সরিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্ত ঠাহর করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম। তাহার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল, কুসুম, আমার ষোল আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি? কিন্তু বলিল না।

এইমাত্র সে না-কি তাহার চরণের শিশু-আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নিজের সমস্ত সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া মৃত্যু-শয্যাশায়ী সন্তানের অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিল না; বরং করুণকণ্ঠে বলিল, আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হ'ত। আজ সমস্তদিন, যত যন্ত্রণা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসেছিল। কিন্তু, এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত

দিয়া চরণের অন্তিম-শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা। বলিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা কেহই যখন কুসুমের সুমুখে গিয়া ও-কথা বলিতে সাহস করিল না, কুঞ্জনাথ পর্য্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন বৃন্দাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, ওর মৃতদেহটা ধরে লাভ কি, ছেড়ে দাও, ওরা নিয়ে যাক্।

কুসুম মুখ তুলিয়া বলিল, ওদের আসতে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।

তারপর সে যেরূপ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া বৃন্দাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

১৫

চরণের ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিলম্ব হইল না। কেশব সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—সমস্ত মিছে কথা। যারা কথায় কথায় বলে—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারাম-জাদা, জোচ্চর!

বৃন্দাবন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অদূরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, ঘোর রক্তবর্ণ শ্রান্ত দুই চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া কহিল, শ্মশানে রাগ করতে নেই কেশব।

প্রত্যুত্তরে কেশব 'উঃ'— বলিয়া চুপ করিল!

ফিরিয়া আসিবার পথে বাগ্দীদের দুই-তিনটি ছেলে-মেয়ে গাছতলায় খেলা করিতেছিল, বৃন্দাবন থমকিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিশুরা খেলার ছলে আর একটা গাছতলায় ছুটিয়া গেল, বৃন্দাবন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুর মুখ-পানে চাহিয়া বলিল, কেশব, কাল থেকে অহর্নিশি যে প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঠেচে, এখন বোধ করি তার জবাব পেলাম - সংসারের একছেলে মরারও প্রয়োজন আছে।

কেশব এইমাত্র গালাগালি করিতেছিল, অকস্মাৎ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন কহিল, তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার জ্বালা বুঝবে না—বোঝা অসম্ভব। এ এমন জ্বালা যে, মহাশত্রুর জন্যও কেউ কামনা করে না। কিন্তু এরও দাম আছে কেশব, এখন যেন টের পাচ্ছি, খুব বড়-রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয়, ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন।

কেশব তেমনি নিরুত্তর-মুখে চাহিয়া রহিল ; বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, এই জ্বালা আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল ওই শিশুদের পানে চেয়ে। আজ আমি সকলের মুখেই চরণের মুখ দেখ্‌ছি, সব শিশুকেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে—চরণ বেঁচে থাকতে ত একটা দিনও এমন হয়নি !

কেশব অবনত-মুখে শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিল। পাঠশালার পোড়ো বনমালী ও তাহার ছোট ভাই জলপান ও জল লইয়া যাইতেছিল, বৃন্দাবন ডাকিয়া বলিল, বনমালী, কোথায় যাচ্ছিস্‌ রে ?

বাবাকে জলপান দিতে মাঠে যাচ্ছি পণ্ডিত মশাই।

আমার কাছে একবার আয় তোরা, বলিয়া নিজেই দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া উভয়কেই একসঙ্গে বুকের উপর টানিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আঃ—আঃ, বুক জুড়িয়ে গেল রে বনমালী ! কেশব, কাল বড় ভয় হয়েছিল ভাই, চরণকে বুঝি সত্যই হারালাম। না, আর ভয় নেই, আর তাকে হারাতে হবে না—এদের ভেতরেই চরণ আমার মিশিয়ে আছে, এদের ভেতর থেকেই একদিন তাকে ফিরে পাবো।

কেশব সভয়ে এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া বলিল, ছেড়ে দাও হে বৃন্দাবন, ওদের মা কি কেউ দেখতে পেলে ভারি রাগ করবে।

ওঃ—তা বটে। আমি চরণকে পুড়িয়ে আসছি যে। বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বনমালী পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়া পাইয়া ভাইকে লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই সেইখানে পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্দ্ধমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল, জগদীশ্বর ! চরণকে নিয়েছ, কিন্তু আমার চোখের এই দৃষ্টিটুকু যেন কেড়ে নিয়ো না ! আজ যেমন দেখতে দিলে, এমনি যেন চিরদিন সকল শিশুর মুখেই আমার চরণের মুখ দেখতে পাই। এমনি বুকে নেবার জন্য যেন চিরদিন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি ! কেশব, শ্মশানে দাঁড়িয়ে যাঁদের গাল দিচ্ছিলে, তাঁরা সকলেই হয়ত জোচ্চোর নন।

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, বাড়ি চল।

চল, বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, আজ আমার বাচালতা মাপ কোরো ভাই ! কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপে-ছিল, এ শাস্তি আমার কেন ? জ্ঞানতঃ এমন কিছু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিনি যে, ভগবান এত বড় দণ্ড আমাকে দিলেন, আমার—

কথাটা সম্পূর্ণ না হইতে কেশব উদ্ধতভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল, জিজ্ঞেস কর গে ওই

হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে—সে বলবে, তার জপ-তপের তেজে; জিজ্ঞেস কর গে আর এক জোচ্চোরকে—সে বলবে, পূর্ব্বজন্মের পাপে- উঃ—এই দেশের ব্রাহ্মণ!

বৃন্দাবন ধীরভাবে বলিল, কেশব, গোখরো সাপের খোলসকে লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুধের ওপর আরোপ করাও ভুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং ছাখো।

কেশব সেইসব কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে পুড়িয়া যাইতেছিল, যা মুখে আসিল বলিল, তবে এতবড় দণ্ড কেন?

বৃন্দাবন কহিল, দণ্ড ত নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়ে না, তখন এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার ক'রে, নিজেকে ছোট করে দেখতে আমি চাইনে। এ-জীবনের স্মরণ হয় না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ফল নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরুগৃহ-বাসের গৌরবের ক্লেশ। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলে না কেশব, আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হ'ল, তত বড় শিক্ষা, পুত্র-শোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বুক চিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম, আজ পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাঁদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর, আজ যা পেয়েছি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট করে বসি।

বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

* * * *

সেদিন বৃন্দাবন একটিমাত্র কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্ব্বদিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস; এ-পাড়ায় আর একটা বড়-রকমের কূপ প্রস্তুত না করিলে জলকষ্ট এবং ব্যাধি-পীড়া নিবারিত হইবে না। তাই কেশব কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিলে এমন কূপ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, যাহাতে শুধু একটা গ্রামের নয়, পাঁচ-সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে; উপরন্তু, অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ-আবাদের সাহায্য চলিতে পারিবে।

বৃন্দাবন খুশী হইয়া সম্মত হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের দিন, দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেস্ট্রী করিয়া কেশবের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, কেশব, এই ক'রো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধু-বান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও যখন নিলে,

তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোনদিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখতে পাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েছে। আমি সেইদিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।

দুর্গাদাসবাবু এ-কয়দিন সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে বাবা! কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক, সহ্য করাই ত মনুষ্যত্ব। অক্ষম অপারগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।

বৃন্দাবন মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সংসার ত্যাগ করার কোন সঙ্কল্প ত আমার নেই মাস্টারমশাই। বরং সে ত একেবারে অসম্ভব! ছেলেদের মুখ না দেখতে পেলে আমি একদিনও বাঁচব না। আপনার দয়ায় আমি পণ্ডিতমশাই বলে সকলের পরিচিত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কিন্তু তোমার সর্ব্বস্ব ত জলকষ্ট মোচনের জন্য দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি করে?

বৃন্দাবন সলজ্জ হাস্যে দেয়ালে টাঙানো ভিক্ষার ঝুলি দেখাইয়া বলিল, বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টি-ভিক্ষার অভাব হবে না মাস্টারমশাই, এইতেই আমার বাকী দিনগুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি তারই সঙ্গী-সাথীদের জন্যে দিয়ে গেলাম।

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং প্রবীণ হইলেও শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তাই তিনিও কুসুমের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্মরণ করিয়া বলিলেন, সেটা ভাল হবে না বাবা, তোমার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হতেই পারে না বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন মুখ নীচু করিয়া কহিল, তিনি তার ভায়ের কাছেই যাবেন।

দুর্গাদাস বৃন্দাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্ব্বোপরি এই গৃহত্যাগের সঙ্কল্পে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, জন্মভূমি ত্যাগ করবার আবশ্যকতা কি? এখানে বাস করেও ত পূর্ব্বের মত সমস্ত হতে পারে।

বৃন্দাবনের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, বলিল, ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা ছাড়া, এ-বাড়িতে যে দিকেই চোখ পড়ছে, সেই দিকেই তার ছোট হাত দুখানির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করুন মাস্টারমশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

দুর্গাদাস বিমর্ষমুখে মৌন রহিলেন।

যে ডাক্তার চরণের শেষ-চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ দেখিবার কৌতূহল ও বৃন্দাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেইদিন সকালে বিনা-আহ্বানে আবার কলিকাতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছিলেন; বৃন্দাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কেশব কিসের জন্য সমস্ত উন্নতি জলাঞ্জলি দিয়া এই অতি তুচ্ছ পাঠশালার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেশব, সত্যই কি তুমি এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জ্জন দিয়ে পাঠশালা নিয়ে সারাজীবন থাকবে?

কেশব সংক্ষেপে কহিল, শিক্ষা দেওয়াই ত আমার ব্যবসা।

ডাক্তার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তা জানি, কিন্তু কলেজের প্রফেসারি এবং এই পাঠশালার পণ্ডিতি কি এক? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি?

কেশব সহজভাবে বলিল, সমস্তই। টাকা রোজগার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ।

নয় মানি। কিন্তু এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয়! উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে হে!

বৃন্দাবন হাসিল এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্ব্বেই কহিল, সে কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তারবাবু, আপনাদের নয়? আজ আমার দুর্দ্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, এমনি দুর্দ্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নর-নারী হত্যা হয়, সে কি কারো কোনদিন চোখে পড়ে? আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করে চলে না গেলে, আমরা ত নিরুপায় হয়ে মরি না! রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরণের বসন যোগায়, সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এইসব গ্রামেই বাস; তাদিকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁৎলে থেঁৎলে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম. এ. পাশ করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েচে।

কেশব আনন্দে উৎসাহে সহসা বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, বৃন্দাবন, মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না।

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই দুই বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন বৃন্দাবন ভিক্ষার ঝুলিমাত্র সম্বল করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যে-কোনস্থানে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে। কেশব তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু বৃন্দাবন সম্মত হয় নাই। কারণ, সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে চাহে।

যাত্রার উদ্যোগ করিয়া সে দেবসেবার ভার পুরোহিত ও কেশবের উপর দিয়া দাস-দাসী প্রভৃতি সকলের কথাই চিন্তা করিয়াছিল। মায়ের সিন্দুকের সঞ্চিত অর্থ তাহাদিগকে দিয়া বিদায় করিয়াছিল।

শুধু কুসুমের কথাই চিন্তা করিয়া দেখে নাই। প্রবৃত্তিও হয় নাই, আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। যেদিন সে চরণকে আশ্রয় দেয় নাই, সেইদিন হইতে তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জন্মিয়া উঠিতেছিল, সেই বিতৃষ্ণা তাহার মৃত্যুর পরে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কেন কুসুম আসিয়াছে, কি করিয়া আসিয়াছে, কি জন্য আছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ লয় নাই এবং না লইয়াই নিজের মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আপনি আসিয়াছে, শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আপনিই চলিয়া যাইবে। সে আসার পরে, যদিও কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া কয়েকবার কথা কহিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের পানে সেদিন সকালে ছাড়া আর চাহিয়া দেখে নাই। ও-দিকে কুসুমও তাহার সহিত দেখা করিবার বা কথা কহিবার লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই।

এমনি করিয়া এ-কয়টা দিন কাটিয়াছে, কিন্তু আর ত সময় নাই, তাই আজ বৃন্দাবন একজন দাসীকে ডাকিয়া, সে কবে যাইবে জানিতে পাঠাইয়া, বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দাসী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া জানাইল, এখন তিনি যাবেন না।

বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া কহিল, এখানে আর ত থাকবার জো নেই, সে-কথা বলে দিলে না কেন?

দাসী কহিল বৌমা নিজেই সমস্ত জানেন।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে জেনে এসো, সে কি একলাই থাকবে?

দাসী এক মিনিটের মধ্যে জানিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ।

বৃন্দাবন তখন নিজেই ভিতরে আসিল। ঘরের কপাট বন্ধ ছিল, হঠাৎ ঢুকিতে সাহস করিল না, ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে চাহিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। দগ্ধগৃহের পোড়া-প্রাচীরের মত কুসুম এইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—চোখে তাহার উৎকট ক্ষিপ্ত চাহনি। আত্মগ্লানি ও পুত্রশোক, কত শীঘ্র মানুষকে কি করিয়া ফেলিতে পারে, বৃন্দাবন এই তাহা প্রথম দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

অসাবধানে কপাটের কড়া নাড়িয়া উঠিতেই কুসুম চাহিয়া দেখিল, এবং সরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ভেতরে এসো।

বৃন্দাবন ভিতরে আসিতেই সে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হয়ত সে প্রকৃতিস্থ নয়, উন্মত্ত নারী কি কাণ্ড করিবে সন্দেহ করিয়া বৃন্দাবনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু কুসুম অসম্ভব কাণ্ড কিছুই করিল না, গলায় আঁচল দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

বৃন্দাবন ভয়ে নড়িতে-চড়িতে সাহস করিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম বহুক্ষণ ধরিয়া ওই দুই পায়ের ভিতর হইতে যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখপানে চাহিয়া বড় করুণ-কণ্ঠে বলিল, সবাই বলে, তুমি সইতে পেরেচ; কিন্তু আমার বুকের ভেতর দিবানিশি হু হু করে জ্বলে যাচ্চে, আমি বাঁচব কি করে! তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি করে?

দু'জনের এক জ্বালা। বৃন্দাবনের বিদ্বেষ-বহ্নি নিবিয়া গেল, সে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, কুসুম, আমি যাতে শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়া আর পথ নেই।

কুসুম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, চরণকে যে তুমি কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকছি। সে তোমার মরেনি, হারায়নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে—যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমার চরণও তাদের সঙ্গে আছে।

এতক্ষণে কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে আর একবার নত হইয়া স্বামীর পায়ে মুখ রাখিল। ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিয়া বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বৃন্দাবন সভয়ে বলিল, আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।

খুব সম্ভব। আমি যাব।

বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, কি করে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য ত পারিনে! তা ছাড়া তুমি হাঁটবে কি করে?

কুসুম অবিচলিত-স্বরে কহিল, আমিও খুব হাঁটতে পারি—হেঁটেই এসেচি। তা ছাড়া ভিক্ষা করতে তোমাকে আমি দেব না, তা সে আমার জন্যই হোক, আর তোমার নিজের জন্যই হোক। তুমি শুধু তোমার কাজ করে যেয়ো, আমি উপায় করতেও জানি, সংসার চালাতেও জানি। দাদার সংসার এতদিন আমিই চালিয়ে এসেছি।

বৃন্দাবন ভাবিতে লাগিল। কুসুম বলিল, ভাবনা মিছে। আমি যাবই। অবহেলায় ছেলে হারিয়েছি, স্বামী হারাতে আর চাইনে!

বৃন্দাবন আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল, চরণ আমার যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করে গেছে, পারবে সেই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে!

কুসুম শান্ত দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল, পারব।

তবে চল, বলিয়া বৃন্দাবন সম্মতি জানাইল এবং আর একবার কেশবের উপর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া সেই রাত্রেই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেল।

মেজদিদি

মেজদিদি

১

কেষ্টর মা মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া-চিন্তিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বৈমাত্র বড় বোন কাদম্বিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, যা কেষ্ট, তোর দিদির বাড়িতে গিয়ে থাক্ গে। সে বড়মানুষ, বেশ থাকবি যা।

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাঁদিয়া-কাটিয়া জ্বর করিয়া ফেলিল। শেষে ভাল হইয়া, ভিক্ষা করিয়া শ্রাদ্ধ করিল। তার পরে ন্যাড়া মাথায় একটি ছোট পুঁটুলি সম্বল করিয়া দিদির বাড়ি রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাহাকে চিনিত না। পরিচয় পাইয়া এবং আগমনের হেতু শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল! সে নিজের নিয়মে ছেলে-পুলে লইয়া ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছিল—অকস্মাৎ এ কি উৎপাৎ!

পাড়ার যে বুড়োমানুষটি কেষ্টকে পথ চিনাইয়া সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে কাদম্বিনী খুব কড়া-কড়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিয়া কহিল, ভারি আমার মাসীমার কুটুমকে ডেকে এনেছেন, ভাত মারতে! সৎমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বজ্জাত মাগী জ্যান্তে একদিন খোঁজ নিলে না, এখন মরে গিয়ে ছেলে পাঠিয়ে তত্ত্ব করেচেন। যাও বাপু, তুমি পরের ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—এ-সব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারব না।

বুড়া জাতিতে নাপিত। কেষ্টার মাকে ভক্তি করিত, মা-ঠাকরুণ বলিয়া ডাকিত। তাই এত কটূক্তিতেও হাল ছাড়িল না। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, দিদি-ঠাকরুণ, লক্ষ্মীর ভাঁড়ার তোমার। কত দাস-দাসী, অতিথি-ফকির, কুকুর-বেড়াল এ-সংসারে পাত পেতে মানুষ হয়ে যাচ্চে, এ-ছোঁড়া দু'মুঠো খেয়ে বাইরে পড়ে থাকলে তুমি জানতেও পারবে না। বড় শান্ত সুবোধ ছেলে দিদিঠাকরুণ! ভাই বলে না নাও, দুঃখী অনাথ বামুনের ছেলে বলেও বাড়ির কোণে একটু ঠাঁই দাও দিদি।

এ স্তুতিতে পুলিশের দারোগার মন ভেজে, কাদম্বিনী মেয়েমানুষ মাত্র। কাজেই সে তখনকার মত চুপ করিয়া রহিল। বুড়া কেষ্টকে আড়ালে ডাকিয়া দুটা শলা-পরামর্শ দিয়া চোখ মুছিয়া বিদায় লইল।

কেষ্ট আশ্রয় পাইল।

কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুজ্যের ধান-চালের আড়ত ছিল। তিনি বেলা বারোটার পর বাড়ি ফিরিয়া কেষ্টকে বক্র কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, এটি কে?

কাদম্বিনী মুখ ভারী করিয়া জবাব দিল, তোমার বড়কুটুম গো, বড়কুটুম! নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর—পরকালের কাজ হোক।

নবীন সৎ-শাশুড়ীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন, ব্যাপারটা বুঝিলেন, কহিলেন, বটে! বেশ নধর গোলগাল দেহটি ত!

স্ত্রী কহিলেন, বেশ হবে না কেন? বাপ আমার বিষয়-আশয় যা-কিছু রেখে গিয়েছিলেন, সে সমস্তই মাগী ওর গভরে ঢুকিয়েচে। আমি ত তার একটি কানা-কড়িও পেলুম না।

বলা বাহুল্য, এই বিষয়-আশয় একখানি মাটির ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি বাতাবি-নেবুর গাছ। ঘরটিতে বিধবা মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন এবং নেবুগুলি বিক্রি করিয়া ছেলের ইস্কুলের মাহিনা যোগাইতেন।

নবীন রোষ চাপিয়া বলিলেন, খুব ভাল।

কাদম্বিনী কহিলেন, ভাল নয় আবার! বড়কুটুম যে গো! তাঁকে তার মত রাখতে হবে ত! এতে আমার পাঁচুগোপালের বরাতে একবেলা এক সন্ধ্যা জোটে ত তাই ঢের! নইলে অখ্যাতিতে দেশ ভরে যাবে। বলিয়া পাশের বাড়ির দোতলা ঘরের বিশেষ একটা খোলা জানালার প্রতি রোষকষায়িত লোচনের অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘরটা তার মেজ-জা হেমাঙ্গিনীর।

কেষ্ট বারান্দায় একধারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনী ভাঁড়ারে ঢুকিয়া একটা নারিকেল মালায় একটুখানি তেল আনিয়া, তাহার পাশে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না, যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এস গে—বলি ফুলেল তেল-টেল মাখা অভ্যাস নেই ত? স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, তুমি চান করতে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়ো গো, নইলে ডুবে মলে-টলে বাড়িশুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়বে।

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল, সে স্বভাবতঃই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—বেলাও হইয়াছে। নানা কারণে পাতের ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন অদূরে খাইতে বসিয়াছিলেন; লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, কেষ্টকে আর দুটি ভাত দাও গো—

দিই, বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একখানা ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই হয়েচে! এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে! ও-বেলা দোকান থেকে মণ দুই মোটা চাল পাঠিয়ে দিয়ো, নইলে দেউলে হতে দেরি হবে না, তা বলে রাখছি।

মর্মান্তিক লজ্জায় কেষ্টর মুখখানি আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। দুঃখিনী জননীর কাছে সরু চাল খাইতে পাইয়াছিল কি না, সে খবর জানি না, কিন্তু পেট ভরিয়া খাওয়ার অপরাধে কোনদিন যে সে লজ্জায় মাথা হেট্ করিতে হয় নাই তাহা জানি। তাহার মনে পড়িল, হাজার বেশী খাইয়াও কখন মায়ের মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, এই সেদিনও ঘুড়ি-লাটাই কিনিবার জন্য দু'মুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ভাতের থালার উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুঁজিয়া গিলিতে লাগিল। বাঁ হাতটা তুলিয়া চোখ মুছিতে পর্য্যন্ত সাহস করিল না, পাছে দিদির চোখে পড়ে। অনতিপূর্ব্বেই মায়া-কান্না কাঁদার অপরাধে বকুনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এতবড় মাতৃ-শোকেরও ঘাড় চাপিয়া রাখিল।

২

পৈতৃক বাড়িটা দুই ভায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

পাশের দোতলা বাড়িটা মেজভাই বিপিনের। ছোটভায়ের অনেকদিন মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিনেরও ধান-চালের কারবার। তাঁহার অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড় ভাই নবীনের সমান নয়। তথাপি ইহার বাড়িটাই দোতলা। মেজবৌ হেমাঙ্গিনী সহরের মেয়ে। তিনি দাস-দাসী রাখিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া, জাঁকজমকে থাকিতে ভালবাসেন। পয়সা বাঁচাইয়া গরীব চালে চলে না বলিয়াই বছর-চারেক পূর্ব্বে দুই জায়ে কলহ করিয়া পৃথক হইয়াছিলেন। সেই অবধি প্রকাশ্যে কলহ অনেকবার হইয়াছে, অনেকবার মিটিয়াছে, কিন্তু মনোমালিন্য একদিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ, সেটা বড় জা কাদম্বিনীর একলার হাতে। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝতেন, ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না। কিন্তু মেজবৌ অত পাকা নয়, অমন করিয়া বুঝিতেও পারিতেন না। ঝগড়াটা প্রথমে তিনিই করিয়া ফেলিতেন বটে, কিন্তু তিনিই

মিটাইবার জন্য, কথা কহিবার জন্য, খাওয়াইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া একদিন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া বসিতেন। শেষে, হাতে-পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া, ঘাট মানিয়া, বড়জাকে নিজের ঘরে ধরিয়া আনিয়া ভাব করিতেন। এমনি করিয়া দুই জায়ের অনেকদিন কাটিয়াছে। আজ বেলা তিনটা সাড়ে-তিনটার সময় হেমাঙ্গিনী এ-বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কূপের পার্শ্বে সিমেণ্ট-বাঁধান বেদীর উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল; কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিতেছিলেন। মেজ-জাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন, মাগো, —ছোঁড়াটা কি নোংরা কাপড়-চোপড় নিয়েই এসেচে!

কথাটা সত্য। কেষ্টর সেই লাল-পেড়ে ধুতিটা পরিয়া এবং চাদরটা গায়ে দিয়া কেহ কুটুমবাড়ি যায় না। দুটাকে পরিষ্কার করার আবশ্যকতা ছিল বটে, কিন্তু রজকের অভাবে ঢের বেশী আবশ্যক হইয়াছিল পুত্র পাঁচুগোপালের জোড়া-দুই এবং তাহার পিতার জোড়া-দুই পরিষ্কার করিবার। কেষ্ট আপাততঃ তাহাই করিতেছিল। হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই টের পাইলেন বস্ত্রগুলি কাহাদের। কিন্তু সে উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেটি কে দিদি? ইতিপূর্ব্বে নিজের ঘরে বসিয়া আড়ি পাতিয়া তিনি সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন। দিদি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, দিব্যি ছেলেটি ত! মুখের ভাব তোমার মতই দিদি। বলি বাপের বাড়ির কেউ না কি?

কাদম্বিনী বিরক্ত-মুখে জবাব দিলেন, হুঁ, আমার বৈমাত্র ভাই। ওরে, ও কেষ্ট, তোর মেজদিদিকে একটা প্রণাম কর্ না রে! কি অসভ্য ছেলে বাবা! গুরুজনকে একটা নমস্কার করতে হয়, তাও কি তোর মা মাগী শিখিয়ে দিয়ে মরেনি রে?

কেষ্ট থতমত খাইয়া উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর পায়ের কাছেই নমস্কার করাতে তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন, আ মর, হাবা কালা নাকি! কাকে প্রণাম করতে বললুম, কাকে এসে করলে!

বস্তুতঃ আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রাম আঘাতে তাহার মাথা বে-ঠিক হইয়া গিয়াছিল। কথার ঝাঁজে ব্যস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া শির অবনত করিতেই তিনি হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, থাক থাক, হয়েচে ভাই—চিরজীবী হও! কেষ্ট মূঢ়ের মত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ-দেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা তাহার মাথায় ঢুকিল না।

তাহার সেই কুন্ঠিত ভীত অসহায় মুখখানির পানে চাহিবামাত্র হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া,

সহসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পরিশ্রান্ত ঘর্ম্মাপ্লুত মুখখানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া, জা'কে কহিলেন, আহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়ে নিতে আছে দিদি, একটা চাকর ডাকনি কেন ?

কাদম্বিনী হঠাৎ অবাক্ হইয়া গিয়া জবাব দিতে পারিলেন না ; কিন্তু নিমিষে সামলাইয়া লইয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমি ত তোমার মত বড়মানুষ নই মেজবৌ, যে, বাড়িতে দশ-বিশটা দাস-দাসী আছে ? আমাদের গেরস্ত-ঘরে—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, উমা, শিবুকে একবার এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দে ত মা, বট্‌ঠাকুর আর পাঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেচে এনে শুকোতে দিক্। বড় জা'য়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এ-বেলা কেষ্ট আর পাঁচুগোপাল আমার ওখানে খাবে দিদি। সে ইস্কুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিয়ো ; আমি ততক্ষণ একে নিয়ে যাই। কেষ্টকে কহিল, ওঁর মত আমিও তোমার দিদি হই কেষ্ট—এসো আমার সঙ্গে। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া নিজের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

কাদম্বিনী বাধা দিলেন না। অধিকন্তু হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় খোঁচাটাও নিঃশব্দে হজম করিলেন। তাহার কারণ, যে ব্যক্তি খোঁচা দিয়াছে, সে এ-বেলা খরচটাও বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর সংসারে পয়সার বড় আর কিছু ছিল না। তাই, গাভী দুধ দিতে দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

৩

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, কি খেয়ে এলি রে কেষ্ট ?

কেষ্ট সলজ্জ নতমুখে কহিল, লুচি।

কি দিয়ে খেলি ?

কেষ্ট তেমনিভাবে বলিল, রুইমাছের মুড়োর তরকারি, সন্দেশ, রসগো—

ইস্‌ ! বলি মেজ-ঠাকরুণ মুড়োটা কার পাতে দিলেন ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে কেষ্টর মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ জানোয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেষ্টর বুকের ভিতরটায় তেমনিধার করিতে লাগিল। দেরি দেখিয়া কাদম্বিনী কহিলেন, তোর পাতে বুঝি ?

গুরুতর অপরাধীর মত কেষ্ট মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বলি, শুনলে ত ?

নবীন সংক্ষেপে হুঁ বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উমার সহিত বলিতে লাগিলেন, খুড়ী আপনার লোক, তার ব্যবহারটা দেখ! পাঁচুগোপাল আমার রুইমাছের মুড়ো বলতে অজ্ঞান, সে কি তা জানে না? তবে কোন্ আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে দিলে? বলি হাঁরে কেষ্ট, সন্দেশ-রসগোল্লা খুব পেট-ভরে খেলি? সাতজন্মে কখনও তুই এসব চোখেও দেখিস নি। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যারা দুটি ভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে লুচি-সন্দেশ কি হবে! কিন্তু আমি বলচি তোমাকে, কেষ্টকে মেজগিন্নী বিগড়ে না দেয় ত আমাকে কুকুর ব'লে ডেকো।

নবীন মৌন হইয়া রহিলেন। কারণ স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবৌ তাহাকে বিগড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না! তাঁহার স্ত্রীর কিন্তু স্বামীর উপরে বিশ্বাস ছিল না, বরং ষোল-আনা ভয় ছিল, সাদাসিধা ভালোমানুষ বলিয়া যে-কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে। সেইজন্য ছোটভাই কেষ্টর মানসিক উন্নতি-অবনতির প্রতি সেই অবধি তিনি প্রখর দৃষ্টি পাতিয়া রাখিলেন।

পরদিন হইতেই দুটো চাকরের একটাকে ছাড়ান হইল, কেষ্ট নবীনের ধান-চালের আড়তে কাজ করিতে লাগিল! সেখানে সে ওজন করে, বিক্রী করে, চার-পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে, দুপুরবেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে দোকান আগলায়। দিন-দুই পরে একদিন তিনি আহার-নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া গেলে, সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেষ্ট পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতেছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধার তাড়নায় বোধ করি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু দিদিকে ডাকিয়া তুলিবে, এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপটি করিয়া দিদির ঘুমভাঙার আশায় বসিয়াছিল, হঠাৎ ডাক শুনিল—কেষ্ট?

সে আহ্বান কি স্নিগ্ধ হইয়াই তাহার কানে বাজিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, মেজদি তাঁহার দোতলার ঘরের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেষ্ট একটিবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিয়া, সুমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'দিন দেখিনি ত? এখানে চুপ করে বসে কেন কেষ্ট?

একে ত ক্ষুধায় অল্পেই চোখে জল আসে, তাহাতে এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর। তাহার দু'চোখ টল্ টল্ করিতে লাগিল। সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না।

মেজখুড়ীমাকে সব ছেলেমেয়েই ভালবাসিত। তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া কাদম্বিনীর ছোটমেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চেঁচাইয়া বলিল, কেষ্টমামা, রান্নাঘরে

তোমার ভাত ঢাকা আছে, খাও গে, মা খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছে।

হেমাঙ্গিনী অবাক্‌ হইয়া কহিলেন, কেষ্টর এখনও খাওয়া হয়নি, তোর মা খেয়ে ঘুমোচ্চে কি রে—হাঁ কেষ্ট, আজ এত বেলা হল কেন?

কেষ্ট ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। টুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, কেষ্ট মামার রোজ ত এমনি বেলাই হয়। বাবা খেয়ে-দেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবে ত ও খেতে আসে।

হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন, কেষ্টকে দোকানের কাজে লাগান হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়ান হইবে, এ আশা অবশ্য তিনি করেন নাই; কিন্তু একবার এই বেলার দিকে চাহিয়া, একবার এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আর্ত্ত শিশুদেহের পানে চাহিয়া, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ি চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুই পরে একবাটি দুধ হাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কেষ্ট খাইতে বসিয়াছিল। একটা পিতলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুকনা ড্যালা-পাকান ভাত। একপাশে একটুখানি ডাল ও কি একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেষ্ট খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে একটিবার মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, পাতে গোনা একটিও ভাত পড়িয়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অন্ন নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্ত্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চাপিতে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

সর্দ্দি উপলক্ষ করিয়া হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন-দুই থাকিয়া আপনি ভাল হইয়া যাইত। দিন-কয়েক পরে এমনি একটু জ্বর বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়াছিলেন। ঘরে কেহ ছিল না, হঠাৎ মনে হইল কে যেন অতি সন্তর্পণে কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ডাকিলেন, কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে, ললিত?

কেহ সাড়া দিল না। আবার ডাকিতে, আড়াল হইতে জবাব আসিল, আমি।

কে আমি রে? আয়, ঘরে এসে বোস।

কেষ্ট সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন রে কেষ্ট?

কেষ্ট আরও একটু সরিয়া আসিয়া, মলিন কোঁচায় খুঁট খুলিয়া দুটি আধ-পাকা পেয়ারা বাহির করিয়া বলিল, জ্বরের উপর খেতে বেশ।

হেমাঙ্গিনী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, কোথায় পেলি রে? আমি কাল থেকে লোকের কত খোসামোদ করছি, কেউ এনে দিতে পারেনি, বলিয়া পেয়ারাসুদ্ধ কেষ্টর হাতখানি ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কেষ্ট লজ্জায় আহ্লাদে আরক্ত মুখ হেঁট করিল। যদিও, এটা পেয়ারার সময় নয়, হেমাঙ্গিনীও খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি এই দুটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে দুপুরবেলার সমস্ত রোদটা কেষ্টর মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ কেষ্ট, কে তোকে বললে আমার জ্বর হয়েচে?

কেষ্ট জবাব দিল না।

কে বললে রে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েচি?

কেষ্ট তাহারও জবাব দিল না। সে সেই যে মুখ হেঁট করিল, আর তুলিতেই পারিল না। ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরুস্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, আদর করিয়া 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আর কত কি কৌশলে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন। বিস্তর অনুসন্ধানে পেয়ারা সংগ্রহ করিবার কথা হইতে শুরু করিয়া, তাহার দেশের কথা, মায়ের কথা, খাওয়া-দাওয়ার কথা, এখানে দোকানে কি কি কাজ করিতে হয়, তাহার কথা, একে একে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, এই তোর মেজদিকে কখনও কিছু লুকোসনে কেষ্ট, যখন দরকার হবে চুপি চুপি এসে চেয়ে নিস—নিবি ত?

কেষ্ট আহ্লাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

সত্যকার স্নেহ যে কি, তাহা দুঃখী মায়ের কাছে কেষ্ট শিখিয়াছিল; এই মেজদির মধ্যে তাহাই আস্বাদ করিয়া কেষ্টর রুদ্ধ মাতৃশোক আজ গলিয়া ঝরিয়া গেল। উঠিবার সময় মেজদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু, তাহার দিদির আক্রোশ তাহার প্রতি প্রতিদিনই বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কারণ, সে সৎমার ছেলে, সে নিরুপায়। আবশ্যক হইলে অখ্যাতির ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না। সুতরাং যখন রাখিতে হইবে, তখন যতদিন তাহার দেহ বহে, ততদিন কষিয়া খাটাইয়া লওয়াই ঠিক।

সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন—সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে

কোথায় ছিলি রে কেষ্ট?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। কাদম্বিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, বল্ শীগ্‌গির।

কেষ্ট তথাপি মৌন হইয়া রহিল। মৌন থাকিলে যাহাদের রাগ পড়ে, কাদম্বিনী সে দলের নহেন। অতএব কথা বলাইবার জন্য তিনি যতই জেদ করিতে লাগিলেন, বলাইতে না পারিয়া তাঁহার ক্রোধ এবং রোখ ততই চড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাঁচু-গোপালকে ডাকিয়া তাহার দুই কান পুনঃ পুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাত্রে হাঁড়িতে চাল লইলেন না।

আঘাত যতই গুরুতর হোক, প্রতিহত হইতে না পারিলে লাগে না। পর্ব্বত-শিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত-পা ভাঙে না, ভাঙে শুধু তখনই—যখন—পদদল-স্পৃষ্ট কঠিনভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেষ্টর। মায়ের মরণ যখন পায়ের নীচে নির্ভরস্থলটুকু তাহার একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল, তখন হইতে বাহিরের কোন আঘাতই তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত না। সে দুঃখীর ছেলে, কিন্তু কখনও দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত তাহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদম্বিনীর দেওয়া কঠোর দুঃখকষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিল না বলিয়াই। কিন্তু আজ পারিল না। আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাতৃস্নেহের সুকঠিন ভিত্তির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই আজিকার এই অত্যাচার অপমান তাহাকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া দিল। মাতাপুত্র নিরপরাধ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া, অপমান করিয়া, দণ্ড দিয়া, চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূমিশয্যায় পড়িয়া আজ অনেকদিনের পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া, মেজদির নাম করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল!

পরদিন সকালে কেষ্ট হঠাৎ গুটি গুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে বিছানার একপাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী পা দুইটি একটু গুটাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, দোকানে যাস নি কেষ্ট?

এইবার যাব।

দেরী করিসনে দাদা, এইবেলা যা, নইলে এক্ষুণি আবার গালাগালি করবে। কেষ্টর মুখ একবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর হইল। যাই, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া আবার চুপ করিল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, কিছু বলবি আমাকে রে?

কেষ্ট মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, কাল কিছু খাইনি মেজদি—

কাল থেকে খাস্‌নি! বলিস্‌ কি কেষ্ট? কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আর একবার কাছে বসাইয়া একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন, কাল রাত্তিরেই কেন এলিনে?

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার মাথার দিব্যি রইল ভাই, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা ব'লে মনে করবি।

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদম্বিনীর কানে গেল। তিনি নিজের বাড়ি হইতে মেজবৌকে ডাক দিয়া বলিলেন, ভাইকে আমি খাওয়াতে পারিনে যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে পড়ে বলতে গেছ?

কথার ধরণ দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর গা জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, যদি গায়ে পড়েই ব'লে থাকি, তাতেই বা দোষ কি?

কাদম্বিনী প্রশ্ন করিলেন, তোমার ছেলেটিকে ডেকে এনে আমি যদি এমনি করে বলি, তোমার মানটি থাকে কোথায় শুনি? তুমি এমন করে 'নাই' দিলে আমি তাকে শাসন করি কি করে বল দেখি?

হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, দিদি, পনের-ষোল বছর এক সঙ্গে ঘর করচি—তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তার পরে পরের ছেলেকে করো, তখন গায়ে পড়ে কথা কইতে যাবো না।

কাদম্বিনী অবাক হইয়া বলিলেন, আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা? দেবতার সঙ্গে বাঁদরের তুলনা? এর পরে আরও কি যে তুমি বলে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবৌ।

মেজবৌ উত্তর দিলেন, কে দেবতা, কে বাঁদর, সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বলব না দিদি, যদি বলি ত এই যে—তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই। বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্থাৎ কর্ত্তারা ঘরে ফিরিবার সময়টিতে বড়বৌ নিজের উঠানে দাঁড়াইয়া দাসীকে উপলক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন—যিনি রাত-দিন কচ্ছেন, তিনিই এর বিহিত করবেন। মায়ের চেয়ে মাসীর

দরদ বেশী! আমার ভায়ের মর্ম্ম আমি বুঝিনে, বোঝে পরে! কখ্খনো ভাল হবে না—ভাই-বোনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে ধর্ম্ম সইবেন না—তা বলে দিচ্ছি, বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উভয় জায়ের মধ্যে এই ধরণের গালি-গালাজ, শাপ-শাপান্ত অনেকবার অনেক রকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ ঝাঁজটা কিছু বেশী! অনেক সময় হেমাঙ্গিনী শুনিয়াও শুনিতেন না, বুঝিয়াও গায়ে মাখিতেন না; কিন্তু আজ নাকি তাঁহার দেহটা খারাপ ছিল, তাই উঠিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, এর মধ্যেই চুপ করলে কেন দিদি? ভগবান হয়ত শুনতে পাননি—আর খানিকক্ষণ ধরে আমার সর্ব্বনাশ কামনা কর—বট্‌ঠাকুর ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন—এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন?

কাদম্বিনী উঠানের উপর ছুটিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আমি কি কোন সর্ব্বনাশীর নাম মুখে এনেছি?

হেমাঙ্গিনী স্থিরভাবে জবাব দিলেন, মুখে আনবে কেন দিদি, মুখে আনবার পাত্রী তুমি নও। কিন্তু তুমি কি ঠাওরাও, একা তুমিই সেয়ানা, আর পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাকা? ঠেস দিয়ে কার কপাল ভাঙচ, সে কি কেউ টের পায় না?

কাদম্বিনী এবার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন, টের পেলেই বা। যে দোষে থাকবে, তারই গায়ে লাগবে। আর একা তুমিই টের পাও, আমি পাই নে? কেষ্ট যখন এলো, সাত চড়ে রা করত না, যা বলতুম, মুখ বুজে তাই করত—আজ দুপুরবেলা কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো এই প্রসন্নর মাকে,—বলিয়া দাসীকে দেখাইয়া দিল।

প্রসন্নর মা কহিল, সে-কথা সত্যি মেজবোমা। আজ সে ভাত ফেলে উঠে যেতে মা বললেন, এ পিণ্ডিই না গিললে যখন যমের বাড়ি যেতে হবে, তখন এত তেজ কিসের জন্যে? সে বলে গেল, আমার মেজদি থাকতে কাউকে ভয় করিনে।

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, কেমন হ'ল ত! কার জোরে এত তেজ শুনি? আজ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্চি, মেজবৌ, ওকে তুমি একশ'বার ডেকো না। আমাদের ভাই-বোনের কথার মধ্যে থেকো না।

হেমাঙ্গিনী কথা কহিলেন না। কেঁচো সাপের মত চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কত বেশী পীড়নের দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতে পারিয়াছে।

আবার মাথা ধরিয়া জর বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায় আসিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া ইহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধ-

ভয়ে বলিয়া উঠিলেন, বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ! কারু মানা শুনবে না, যেখানে যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আছে, দেখলেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, রোজ রোজ আমার এত হাঙ্গামা সহ্য হয় না মেজবৌ। আজ বৌঠান আমাকে না-হক্ দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, বৌঠান হক্ কথা কবে বলেন যে আজ তোমাকে না-হক্ কথা বলচেন।

বিপিন বলিলেন, কিন্তু আজ তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবার বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভাগ্নের অমন বাগানখানা তোমার জন্যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্টে পুলিশ থামাতে একশ দেড়শ ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝ না? কবে এ স্বভাব যাবে?

হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তাঁর আগে নয়। আমি মা,—আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাইনে। আমার অসুখ করেচে—আর আমাকে বকিও না—তুমি যাও। বলিয়া গায়ের র‍্যাপারখানা টানিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে স্ত্রীর উপর এবং বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ দুর্ভাগাটার উপর আজ মর্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

৬

পরদিন সকালে জানালা খুলিতেই হেমাঙ্গিনীর কানে বড় জায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ঝঙ্কার প্রবেশ করিল। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ছোঁড়াটা কাল থেকে পালিয়ে রইল, একবার খোঁজ নিলে না?

স্বামী জবাব দিলেন, চুলোয় যাক। কি হবে খোঁজ করে?

স্ত্রী কণ্ঠস্বর সমস্ত পাড়ার শ্রুতিগোচর করিয়া বলিলেন, তা হলে যে নিজেদের গ্রামে বাস করা দায় হবে! আমাদের শত্রু ত দেশে কম নেই, কোথাও প'ড়ে মরে-টরে থাকলে ছেলেবুড়ো বাড়িশুদ্ধ সবাইকে জেলখানায় যেতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

হেমাঙ্গিনী সমস্তই বুঝিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া খান কতক রুটি খাইতেছিলেন, হঠাৎ

চোরের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক।

কোথায় পালিয়েছিলি রে কেষ্ট?

পালাইনি ত। কাল সন্ধ্যার পর দোকানে শুয়েছিলুম, ঘুম ভেঙ্গে দেখি, দুপুর রাত্তির। ক্ষিদে পেয়েছে মেজদি।

ও-বাড়িতে গিয়ে খেগে যা। বলিয়া হেমাঙ্গিনী নিজের রুটির থালায় মনোযোগ করিলেন।

মিনিট-খানেক চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেষ্ট চলিয়া যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কাছে বসাইলেন, এবং সেইখানেই ঠাঁই করিয়া রাঁধুনীকে ভাত দিতে বলিলেন।

তাহার খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছিল, এমন সময় উমা বহির্ব্বাটী হইতে ত্রস্তব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানাইল—বাবা আসচেন যে!

মেয়ের ভাব দেখিয়া মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তাতে তুই অমন করছিস কেন?

উমা কেষ্টর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রত্যুত্তরে তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইয়া, চোখ-মুখ নাড়িয়া তেমনি ইসারায় প্রকাশ করিল—খাচ্ছে যে!

কেষ্ট কৌতূহলী হইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছিল। উমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, শঙ্কিত মুখের ইসারা তাহার চোখে পড়িল। এক মুহূর্ত্তে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। কি ত্রাস যে তাহার মনে জন্মিল সেই জানে। মেজদি, বাবু আসচেন, বলিয়াই সে ভাত ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া রান্নাঘরের দোরের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি উমাও আর একদিকে পলাইয়া গেল। অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল যেরূপ ব্যবহার করে, ইহারাও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া বসিল।

প্রথমটা হেমাঙ্গিনী হতবুদ্ধির মত একবার এদিক একবার ওদিকে চাহিলেন, তার পরে পরিশ্রান্তের মত দেয়াল ঠেস্ দিয়া এলাইয়া পড়িলেন। লজ্জা ও অপমানের শূল যেন তাঁহার বুকখানা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই স্ত্রীকে ওভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন-মুখে প্রশ্ন করিলেন, ও কি, খাবার নিয়ে অমন করে বসে যে?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন না। বিপিন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, আবার জ্বর হল নাকি? অভুক্ত ভাতের থালাটার পানে চোখ পড়ায় বলিলেন, এখানে এত ভাত ফেলে উঠে গেল কে? ললিত বুঝি?

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, না, সে নয়—ও-বাড়ির কেষ্ট খাচ্ছিল, তোমার ভয়ে আড়ালে লুকিয়েচে।

কেন?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেন, তা তুমিই ভাল জান। আর শুধু সে নয়; তুমি

আসচ খবর দিয়েই উমাও ছুটে পালিয়েচে।

বিপিন মনে মনে বুঝিলেন, স্ত্রীর কথাবার্ত্তা বাঁকা পথ ধরিয়াছে। তাই বোধ করি সোজা পথে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে সহাস্যে বলিলেন, ও বেটি পালাতে গেল কি দুঃখে?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কি জানি? বোধ করি মায়ের অপমান চোখে দেখবার ভয়েই পলিয়েচে। পরক্ষণে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেষ্ট পরের ছেলে, সে ত লুকোবেই। পেটের মেয়েটা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলে না যে, তার মায়ের কাউকে ডেকে একমুঠো ভাত দেবার অধিকারটুকুও আছে।

এবার বিপিন টের পাইলেন, ব্যাপারটা সত্যিই বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পাছে একেবারে বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌছায় এজন্য অভিযোগটাকে সামান্য পরিহাসে পরিণত করিয়া চোখ টিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না—তোমার কোন অধিকার নেই। ভিখিরি এলে ভিক্ষেও না। সে যাক—কাল থেকে আর মাথা ধরেনি ত? আমি মনে করচি, সহর থেকে কেদার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই—না হয় একবার কলকাতায়—

অসুখ ও চিকিৎসার পরামর্শটা ঐখানেই থামিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, উমার সামনে তুমি কেষ্টকে কিছু বলেছিলে?

বিপিন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—আমি? কৈ না! ও—হাঁ—সেদিন যেন মনে হচ্চে বলেছিলুম—বৌঠান রাগ করেন—দাদা বিরক্ত হন—উমা বোধ করি সেখানে দাঁড়িয়েছিল—কি জান—

জানি, বলিয়া হেমাঙ্গিনী কথাটা চাপা দিয়া দিলেন। বিপিন ঘরে ঢুকিতেই তিনি কেষ্টকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন, কেষ্ট এই চারটে পয়সা নিয়ে দোকান থেকে কিছু মুড়িটুড়ি কিনে খেগে যা। ক্ষিদে পেলে আর আসিস্‌নে আমার কাছে। তোর মেজদির এমন জোর নেই যে, সে বাইরের মানুষকে একমুঠো ভাত খেতে দেয়।

কেষ্ট নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া বিপিন তাহার পানে চাহিয়া ক্রোধে দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিলেন।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন বৈকালে বিপিন অত্যন্ত বিরক্ত-মুখে ঢুকিয়া বলিলেন, এ-সব কি তুমি শুরু করলে মেজবৌ? কেষ্ট তোমার কে যে, একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন-রাত আপনা-আপনির মধ্যে লড়াই করে বেড়াচ্চ। আর দেখলাম, দাদা পর্য্যন্ত ভারি রাগ করেছেন।

অনতিপূর্ব্বে নিজের ঘরে বসিয়া বড়বৌ স্বামীকে উপলক্ষ ও মেজবৌকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার শব্দে যে-সকল অপভাষার তীর ছুঁড়িয়াছিলেন, তাহার একটিও নিষ্ফল হয় নাই। সব ক'টি আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে বিঁধিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি মুখে করিয়া যে পরিমাণ বিষ বহিয়া আনিয়াছিল, তাঁহার জ্বালাটাও কম জ্বলিতেছিল না। কিন্তু মাঝখানে ভাশুর বিদ্যমান থাকায় হেমাঙ্গিনী সহ্য করা ব্যতীত প্রতিকারের পথ পাইতেছিলেন না।

আগেকার দিনে যেমন যবনেরা গরু সুমুখে রাখিয়া রাজপুত-সেনার উপর বাণ বর্ষণ করিত, যুদ্ধ জয় করিত, বড়বৌ মেজবৌকে আজকাল প্রায়ই তেমনি জব্দ করিতেছিলেন।

স্বামীর কথায় হেমাঙ্গিনী দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, বল কি, তিনি পর্য্যন্ত রাগ করেচেন ? এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা, শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে ! এখন কি করলে রাগ থামবে বল ?

বিপিন মনে মনে রাগ করিলেন, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়, তাই মনের ভাব গোপন করিয়া সহজভাবে বলিলেন, হাজার হলেও গুরুজনের সম্বন্ধে কি—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী কহিলেন, সব জানি, ছেলেমানুষটি নই যে, গুরুজনের মান-মর্য্যাদা বুঝি নে ! কিন্তু ছোঁড়াটাকে ভালবাসি বলেই যেন ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে দিবারাত্র বিঁধতে থাকেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছু নরম শুনাইল। কারণ, হঠাৎ ভাশুরের সম্বন্ধে শ্লেষ করিয়া ফেলিয়া তিনি নিজেই মনে মনে অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারও গায়ের জ্বালাটা নাকি বড় জ্বলিতেছিল, তাই রাগ সামলাইতে পারেন নাই।

বিপিন গোপনে ও-পক্ষে ছিলেন। কারণ, এই একটা পরের ছেলে লইয়া নিরর্থক দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি তিনি মনে মনে পছন্দ করিতেন না। স্ত্রীর এই লজ্জাটুকু লক্ষ্য করিয়া জো পাইয়া জোর দিয়া বলিলেন, বেঁধা-বিঁধি কিছুই নয়। তাঁরা নিজেদের ছেলে শাসন করছেন, কাজ শেখাচ্ছেন, তাতে তোমাকে বিঁধলে চলবে কেন ? তা ছাড়া যা-ই করুন, তাঁরা গুরুজন যে !

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইলেন। কারণ, এই পনের-ষোল বছরের ঘর-কন্নায় স্বামীর এত বড় ভ্রাতৃভক্তি তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, তাঁরা গুরুজন, আমিও মা। গুরুজন নিজের মান নিজে নিঃশেষ করে আনলে আমি কি দিয়ে ভর্ত্তি করব !

বিপিন কি একটা জবাব বোধ করি দিতে যাইতেছিলেন, থামিয়া গেলেন।

দ্বারের বাহিরে কুণ্ঠিতকণ্ঠের বিনম্র ডাক শোনা গেল—

মেজদি!

স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হইল। স্বামী একটু হাসিলেন, তাহাতে প্রীতি বিকীর্ণ হইল না। স্ত্রী অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া কবাটের কাছে সরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে কেষ্টর মুখের পানে চাহিতেই সে আহ্লাদে গলিয়া গিয়া প্রথমেই যা মুখে আসিল কহিল, কেমন আছ মেজদি?

হেমাঙ্গিনী একমুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিলেন না। যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীতে এইমাত্র বিবাদ হইয়া গেল, অকস্মাৎ তাহাকে সম্মুখে পাইয়া বিবাদের সমস্ত বিরক্তিটা তাহারই মাথায় গিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী অনুচ্চ কঠোর স্বরে কহিলেন, এখানে কি? কেন তুই রোজ রোজ আসিস্ বল্ ত?

কেষ্টর বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। এই কঠোর কণ্ঠস্বরটা সত্যই এত কঠোর শুনাইল যে, হেতু ইহার যা-ই হোক, বস্তুটা যে সস্নেহ পরিহাস নয়, বুঝিয়া লইতে এই দুর্ভাগা বালকটারও বিলম্ব হইল না।

ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় মুখখানা তাহার কালিমাখা হইয়া গেল। কহিল, দেখতে এসেচি।

বিপিন হাসিয়া বলিলেন, দেখতে এসেছে তোমাকে। এ হাসি যেন দাঁত ভ্যাংচাইয়া হেমাঙ্গিনীকে অপমান করিল। তিনি দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখের পানে একটিবার চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন, আর এখানে তুই আসিস্‌নে। যা—

আচ্ছা, বলিয়া কেষ্ট তাহার মুখের কালি হাসি দিয়া ঢাকিতে গিয়া সমস্ত মুখ আরো কালো, আরো বিশ্রী বিকৃত করিয়া অধোমুখে চলিয়া গেল।

সেই বিকৃতির কালো ছায়া হেমাঙ্গিনী নিজের বুকের উপর লইয়া স্বামীর পানে আর একবার চাহিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দিন পাঁচ-ছয় হইয়া গেল, হেমাঙ্গিনীর জ্বর ছাড়ে নাই। কাল ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, সর্দ্দি বুকে বসিয়াছে। সন্ধ্যার দীপ সবেমাত্র জ্বালা হইতেছিল, ললিত ভাল কাপড়-জামা পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, মা, দত্তদের বাড়ি পুতুল-নাচ হবে, দেখতে যাব?

মা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, হাঁ রে ললিত, তোর মা যে এই পাঁচ-ছ-দিন পড়ে আছে, একবারটি কাছে এসেও ত বসিস্ নে!

ললিত লজ্জা পাইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মা সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, এই অসুখ যদি না সারে, যদি মরে যাই, কি করিস্ তুই? খুব কাঁদিস?

যাঃ—সেরে যাবে, বলিয়া ললিত মায়ের বুকের উপর একটা হাত রাখিল। মা ছেলের হাতখানি হাতে লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। জ্বরের উপরে এই স্পর্শ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া দিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটান। কিন্তু একটু পরেই ললিত উস্‌খুস্ করিতে লাগিল, পুতুল-নাচ হয়ত এতক্ষণে শুরু হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, ভিতরে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

ছেলের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া মা মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা যা, দেখে আয়, বেশী রাত করিস্‌নে যেন।

না মা, এক্ষুনি ফিরে আসব, বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা, একটা কথা বলব?

মা হাসিমুখে বলিলেন, একটা টাকা চাই ত? ঐ কুলুঙ্গিতে আছে, নি গে—দেখিস, বেশী নিস্‌নে যেন।

না মা, টাকা চাইনে। বল, তুমি শুনবে?

মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, টাকা চাইনে? তবে কি কথা রে?

ললিত আর একটু কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কেষ্টমামাকে একবার আসতে দেবে? ঘরে ঢুকবে না—ঐ দোরগোড়া থেকে একটিবার তোমাকে দেখেই চলে যাবে। কালকেও বাইরে এসে বসেছিল, আজকেও এসে বসে আছে।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—যা যা ললিত, এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়—আহা হা, বসে আছে, তোরা কেউ আমাকে জানাসনি রে?

ভয়ে আসতে চায় না যে, বলিয়া ললিত চলিয়া গেল। মিনিট-খানেক পরে কেষ্ট ঘরে ঢুকিয়া মাটির দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, এস দাদা, এস।

কেষ্ট তেমনিভাবে স্থির হইয়া রহিল। তিনি নিজে তখন উঠিয়া আসিয়া কেষ্টর হাত ধরিয়া বিছানায় লইয়া গেলেন। পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, হা রে কেষ্ট, বকেছিলুম বলে তোর মেজদিদিকে ভুলে গেছিস বুঝি?

সহসা কেষ্ট ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ, কখনও কেহ তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই। অনেক দুঃখ-কষ্ট-যাতনা দিলেও সে

ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে থাকে, লোকজনের সুমুখে চোখের জল ফেলে না। তাহার এই স্বভাবটি হেমাঙ্গিনী জানিতেন বলিয়াই বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ছি, কান্না কিসের? বেটাছেলেকে চোখের জল ফেলতে আছে কি?

প্রত্যুত্তরে কেষ্ট কোঁচার খুট মুখে গুঁজিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কান্না রোধ করিতে করিতে বলিল, ডাক্তার বলে যে, বুকে সর্দ্দি বসেচে?

হেমাঙ্গিনী হাসিলেন—এই জন্যে? ছি ছি! কি ছেলেমানুষ তুই রে! বলিতে বলিতে তাঁর নিজের চোখ দিয়াও টপ্ টপ্ করিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বাঁ হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাহার মাথায় একটা হাত দিয়া কৌতুক করিয়া বলিলেন, সর্দ্দি বসেচে—বসলেই বা রে! যদি মরি, তুই আর ললিত কাঁধে করে গঙ্গায় দিয়ে আসবি—কেমন, পারবিনে?

বলি মেজবৌ, কেমন আছ আজ? বলিয়া বড়বৌ দোড়গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন! ক্ষণকাল কেষ্টর পানে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই যে ইনি এসে হাজির হয়েচেন। আবার ও কি? মেজগিন্নীর কাছে কেঁদে সোহাগ করা হচ্চে যে! ন্যাকা আমার কত ফন্দীই জানে!

ক্লান্তিবশতঃ হেমাঙ্গিনী এইমাত্র বালিশে হেলান দিয়া কাত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তীরের মত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, দিদি, আমার ছ-সাতদিন জ্বর, তোমার পায়ে পড়ি, আজ তুমি যাও।

কাদম্বিনী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে বলিনি মেজবৌ। নিজের ভাইকে শাসন করছি, তুমি অমন মারমুখী হয়ে উঠচ কেন?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, শাসন ত রাত্রিদিনই চলছে—বাড়ি গিয়ে কোরো, এখানে আমার সামনে করবার দরকার নেই, করতেও দেব না।

কেন, তুমি কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না কি?

হেমাঙ্গিনী হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমার বড় অসুখ দিদি; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, হয় চুপ কর—নয় যাও।

কাদম্বিনী বলিলেন, নিজের ভাইকে শাসন করতে পাব না?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন, বাড়ি গিয়ে কর গে।

সে আজ ভাল করেই হবে। আমার নামে লাগান-ভাঙান আজ বার করব—বজ্জাত মিথ্যুক কোথাকার! বললুম গরুর দড়ি নেই কেষ্টা, দু আঁটি পাট কেটে দে—না 'দিদি তোমার পায়ে পড়ি, পুতুল-নাচ দেখে আসি—' এই বুঝি পুতুলের নাচ হচ্চে রে? বলিয়া কাদম্বিনী গুম্ গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী কতক্ষণ কাঠের মত বসিয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, কেন তুই পুতুল-নাচ দেখতে গেলিনি কেষ্ট? গেলে ত এইসব হ'ত না! আসতে যখন তোকে ওরা দেয় না ভাই, তখন আর আসিস্‌নে আমার কাছে।

কেষ্ট আর কথাটি না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের গাঁয়ের বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি, পূজো দিলে অসুখ সেরে যায়। দাও না মেজদি!

এইমাত্র নিরর্থক ঝগড়া হইয়া যাওয়ায় হেমাঙ্গিনীর মনটা ভারি বিগড়াইয়া গিয়াছিল, ঝগড়া-ঝাঁটি ত হয়ই—সেইজন্য নয়। এমন একটা রসাল ছুতা পাইয়া এই হতভাগার দুর্দ্দশা যে কিরূপ হইবে, আসলে সেই কথাটা মনে মনে তোলপাড় করিয়া তাঁহার বুকের ভিতরটা ক্ষোভে ও নিরুপায় আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কেষ্ট ফিরিয়া আসিতেই হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিলেন, এবং কাছে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমি ভাল হয়ে তোকে লুকিয়ে পূজো দিতে পাঠিয়ে দেব। পারবি একলা যেতে?

কেষ্ট উৎসাহে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, একলা যেতে খুব পারব। তুমি আজকে আমাকে একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না, মেজদি—আমি কাল সকালেই পূজো দিয়ে তোমাকে প্রসাদ এনে দেব। সে খেলে তক্ষুনি অসুখ সেরে যাবে। দাও না মেজদি আজকেই পাঠিয়ে।

হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, তাঁহার আর সবুর সয় না! বলিলেন, কিন্তু কাল ফিরে এলে তোকে যে এরা ভারি মারবে। মার-ধোরের কথা শুনিয়া প্রথমটা কেষ্ট দমিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া কহিল, মারুক গে। তোমার অসুখ সেরে যাবে ত।

আবার তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া প'ড়িল। বলিলেন, হ্যাঁ রে কেষ্ট, আমি তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে এত মাথা-ব্যথা কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর কেষ্ট কোথায় পাইবে? সে কি করিয়া বুঝাইবে, তাহার পীড়িত আর্ত্ত হৃদয় দিবারাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে! একটুখানি মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার অসুখ যে সারচে না মেজদি—বুকে সর্দ্দি বসেচে যে!

হেমাঙ্গিনী এবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমার বুকে সর্দ্দি বসেছে তাতে তোর কি? তোর এত ভাবনা হয় কেন?

কেষ্ট আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ভাবনা হবে না মেজদি, বুকে সর্দ্দি বসা যে বড় খারাপ। অসুখ যদি বেড়ে যায় তা হলে?

তা হলে তোকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু না ডেকে পাঠালে আর আসিস্‌নে ভাই।

কেন মেজদি ?

হেমাঙ্গিনী দৃঢ়ভাবে মাথা নড়িয়া বলিলেন, না, তোকে আর আমি এখানে আসতে দেব না। না ডেকে পাঠালেও যদি আসিস্ তা হলে ভারি রাগ করব।

কেষ্ট মুখপানে চাহিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বল, কাল সকালে কখন ডেকে পাঠাবে ?

কাল সকালেই তোর আসা চাই ?

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আচ্ছা, সকালে না হয় দুপুরবেলায় আসব—না মেজদি ? তাহার চোখে মুখে এমনই একটা ব্যাকুল অনুনয় ফুটিয়া উঠিল যে, হেমাঙ্গিনী মনে মনে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু আর ত তাঁহার কঠিন না হইলে নয়। সবাই মিলিয়া এই নিরীহ একান্ত অসহায় বালকের উপর যে নির্য্যাতন শুরু করিয়াছে, কোন কারণেই আর ত তাহা বাড়াইয়া দেওয়া চলে না। সে হয়ত সহিতে পারে। মেজদির কাছে আসা-যাওয়া করিবার দণ্ড যত গুরুতর হোক সে হয়ত সহ্য করিতে পিছাইবে না ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজে কি করিয়া সহিবেন ?

হেমাঙ্গিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, তথাপি তিনি মুখ ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, বিরক্ত করিসনে কেষ্ট, যা এখান থেকে। ডেকে পাঠালে আসিস, নইলে যখন তখন এসে আমাকে বিরক্ত করিসনে।

না, বিরক্ত করিনি ত, বলিয়া ভীত লজ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া তাড়াতাড়ি কেষ্ট উঠিয়া গেল।

এইবার হেমাঙ্গিনীর দুই চোখ বহিয়া প্রস্রবণের মত জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকেই মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে। তাঁহারই আঁচলের অল্প একটুখানি মাথায় টানিয়া লইবার জন্য কাঙালের মত কি করিয়াই না বেড়াইতেছে !

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিলেন, কেষ্ট, মুখখানি অমন করে গেলি ভাই, কিন্তু তোর মেজদি যে তোর চেয়েও নিরুপায়। তোকে জোর করে বুকে টেনে আনবে, সে ক্ষমতা তার নেই ভাই।

উমা আসিয়া কহিল, মা, কাল কেষ্ট মামা তাগাদায় না গিয়ে, তোমার কাছে এসে বসেছিল বলে, জ্যাঠামশায় এমন মার মারলেন যে নাক দি—

হেমাঙ্গিনী ধমকাইয়া উঠিলেন—আচ্ছা—হয়েচে—হয়েচে—যা তুই এখান থেকে। অকস্মাৎ ধমকানি খাইয়া উমা চমকাইয়া উঠিল। আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল ; মা ডাকিয়া বলিলেন, শোন রে! নাক দিয়ে কি খুব রক্ত পড়েছিল ?

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না খুব নয়, একটু।

আচ্ছা তুই যা।

উমা কপাটের কাছে আসিয়াই বলিয়া উঠিল, মা, এই যে কেষ্টমামা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কেষ্ট শুনিতে পাইল। বোধ করি ইহাকে অভ্যর্থনা মনে করিয়া মুখ বাড়াইয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, কেমন আছ মেজদি?

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কেন এসেচিস্ এখানে? যা, যা বলচি শীগ্‌গির। দূর হ' বলচি—

কেষ্ট মূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল—হেমাঙ্গিনী অধিকতর তীক্ষ্ণ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, তবু দাঁড়িয়ে রইলি হতভাগা—গেলিনে?

কেষ্ট মুখ নামাইয়া শুধু 'যাচ্ছি' বলিয়াই চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে হেমাঙ্গিনী নির্জ্জীবের মত বিছানার একধারে শুইয়া পড়িয়া অস্ফুটে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, একশবার বলি হতভাগাকে, আসিস্‌নে আমার কাছে—তবু 'মেজদি'! শিবুকে 'বলে দিস্ ত উমা, ওকে না আর ঢুকতে দেয়।

উমা জবাব দিল না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় বলিলেন, কোনদিন ত তোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ এই অসুখের উপর একটা ভিক্ষা চাইচি, দেবে?

বিপিন সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি চাই?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেষ্টকে আমাকে দাও—ও বেচারি বড় দুঃখী—মা-বাপ নেই—ওকে ওরা মেরে ফেলচে,—এ আর আমি চোখে দেখতে পারচিনে।

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা হলে চোখ বুজে থাকলেই ত হয়।

স্বামীর এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হেমাঙ্গিনীকে শূল দিয়া বিঁধিল, অন্য কোন অবস্থায় তিনি ইহা সহিতে পারিতেন না, কিন্তু আজ নাকি তাঁহার দুঃখে প্রাণ বাহির হইতেছিল, তাই সহ্য করিয়া লইয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, তোমার দিব্বি করে বলচি, ওকে আমি পেটের ছেলের মত ভালবেসেচি। দাও আমাকে—মানুষ করি—খাওয়াই-পরাই—তার পরে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের তাই ক'রো। বড় হলে আমি একটি কথাও কবো না।

বিপিন একটুখানি নরম হইয়া বলিলেন, ও কি আমার গোলার ধান-চাল যে তোমাকে এনে দেব? পরের ভাই, পরের বাড়ি এসেচে; তোমার মাঝখানে পড়ে এত দরদ কিসের জন্যে?

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। খানিক পরে চোখ মুছিয়া বলিলেন, তুমি ইচ্ছে করলে বট্‌ঠাকুরকে বলে, দিদিকে বলে, স্বচ্ছন্দে আনতে পার। তোমার দুটি পায়ে পড়চি, দাও তাকে!

বিপিন বলিলেন, আচ্ছা, তাই যদি হয়, আমিই বা এত বড়মানুষ কিসে যে, তাকে প্রতিপালন করব?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আগে আমার একটা তুচ্ছ কথাও ঠেলতে না, এখন কি অপরাধ করেচি যে, যখন এমন করে জানাচ্চি,—বলচি, সত্যিই আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে—তবু এই সামান্য কথাটা রাখতে চাইচ না? সে দুর্ভাগা বলে কি তোমরা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেলবে? আমি তাকে আমার কাছে আসতে বলব, দেখি ওঁরা কি করেন।

বিপিন এবার রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, আমি খাওয়াতে পারব না।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আমি পারব। আমি কি বাড়ির কেউ নই যে, নিজের ছেলেকে খাওয়াতে পারব না। আমি কালই তাকে আমার কাছে এনে রাখব। দিদিরা জোর করেন ত আমি তাকে থানায় দারোগার কাছে পাঠিয়ে দেব।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিপিন ক্রোধে অভিমানে ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা সে দেখা যাবে, বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল, হেমাঙ্গিনী জানালাটা খুলিয়া দিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন, সহসা পাঁচুগোপালের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে গেল। সে চেঁচাইয়া বলিতেছিল, মা, তোমার গুণধর ভাই জলে ভিজতে ভিজতে এসে হাজির হয়েচে।

খ্যাংরা কোথায় রে? যাচ্ছি আমি, বলিয়া কাদম্বিনী হুঙ্কার দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া মাথায় গামছা দিয়া দ্রুতপদে সদর-বাড়িতে ছুটিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, যা ত বাবা, ও-বাড়ির সদরে। দেখ্‌তে, কেষ্টমামা কোথা থেকে এল?

ললিত ছুটিয়া চলিয়া গেল, এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাঁচুদা তাকে নাড়ুগোপাল করে মাথার দুটো থান ইট দিয়ে বসিয়ে রেখেচে।

হেমাঙ্গিনী শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করেছিল সে?

ললিত বলিল, কাল দুপুরবেলা তাকে তাগাদা করতে পাঠিয়েছিল গয়লাদের কাছে, তিন টাকা আদায় করে নিয়ে পালিয়েছিল, সব খরচ করে এই আসচে।

হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, কে বললে, সে টাকা আদায় করেছিল?

লক্ষ্মণ গয়লা নিজে এসে বলে গেছে, বলিয়া ললিত পড়িতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই-তিন আর কোন গোলযোগ শোনা গেল না। বেলা দশটার সময় রাঁধুনি খান-কতক রুটি দিয়া গিয়াছিল, হেমাঙ্গিনী বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমনি সময় তাঁহারই ঘরের বাহিরে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। বড়গিন্নীর পশ্চাতে পাঁচুগোপাল কেষ্টর কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে, সঙ্গে বড়কর্তাও আছেন। মেজ-কর্তাকেও আনিবার জন্য দোকানে লোক পাঠান হইয়াছে।

হেমাঙ্গিনী শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াতেই বড়কর্তা তীব্র কটুকণ্ঠে শুরু করিয়া দিলেন, তোমার জন্যে ত আমরা বাড়িতে টিকতে পারিনে মেজবৌমা। বিপিনকে বল, আমাদের বাড়ির দামটা ফেলে দিক, আমরা আর কোথাও উঠে যাই।

হেমাঙ্গিনী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বড়গিন্নী যুদ্ধপরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বারের ঠিক সুমুখে সরিয়া আসিয়া, হাত-মুখ নাড়িয়া বলিলেন, মেজবৌ, আমি বড়-জা, তা আমাকে কুকুর-শিয়াল মনে কর—তা ভালই কর, কিন্তু হাজার দিন বলেচি মিছে লোক-দেখান আহ্লাদ দিয়ে আমার ভায়ের মাথাটি খেয়ো না—এখন ঘটল ত? ওগো, দু'দিন সোহাগ করা সহজ, কিন্তু চিরকালের ভারটি ত তুমি নেবে না—সে ত আমাকেই বইতে হবে?

ইহা যে কটূক্তি এবং আক্রমণ, তাহাই শুধু হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন—আর কিছু নয়। মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে?

কাদম্বিনী আরো বেশি হাতমুখ নাড়িয়া কহিলেন, বেশ হয়েচে—খুব চমৎকার হয়েচে! তোমার শেখানোর গুণে আদায়ী টাকা চুরি করতে শিখেচে—আর দু'দিন কাছে ডেকে আরো দুটো শলাপরামর্শ দাও, তা হলে সিন্দুক ভাঙতে, সিঁদ কাটতেও শিখবে।

একে হেমাঙ্গিনী পীড়িত, তাহার উপর এই কদর্য্য বিদ্রূপ ও অভিযোগে আজ তিনি জ্ঞান হারাইলেন। ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন কারণে ভাশুরের সুমুখে কথা কহেন নাই; কিন্তু আজ থাকিতে পারিলেন না। মৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, আমি কি তাকে চুরি-ডাকাতি করতে শিখিয়ে দিয়েচি দিদি?

কাদম্বিনী স্বচ্ছন্দে বলিলেন, কেমন করে জানব, কি তুমি শিখিয়ে দিয়েচ, না দিয়েচ। এ স্বভাব তার ত আগে ছিল না, এখনই বা হ'ল কেন? এত লুকোচুরি কথাবার্ত্তাই বা তোমাদের কি, আর এত আহ্লাদ দেওয়াই বা কিজন্যে? কতদিনের পুঞ্জীভূত আবদ্ধ বিদ্বেষরাশি যে এই একটু পথ পাইয়া বহিয়া আসিল, তাহা যিনি সব দেখেন, তিনি দেখিতে পাইলেন!

মুহূর্ত্তকালের জন্য হেমাঙ্গিনী হতজ্ঞানের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এমন

নিষ্ঠুর আঘাত, এত বড় নির্লজ্জ অপমান মানুষ মানুষকে যে করিতে পারে, ইহা যেন তাঁহার মাথায় প্রবেশ করিল না। কিন্তু ঐ মুহূর্ত্তকালের জন্য। পরক্ষণেই তিনি মর্ম্মান্তিক আহত সিংহীর মত দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ভাশুরকে সুমুখে দেখিয়া মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া নিলেন, কিন্তু রাগ সামলাইতে পারিলেন না। বড়-জাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ কঠোরস্বরে বলিলেন, তুমি এতবড় চামার যে, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। তুমি এতবড় বেহায়া মেয়েমানুষ যে, ঐ ছোঁড়াটাকে ভাই বলেও পরিচয় দিচ্ছ। মানুষ জানোয়ার পুষলে তাকেও পেট ভরে খেতে দেয়, কিন্তু ঐ হত-ভাগাটাকে দিয়ে যত-রকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্য্যন্ত এক-দিন পেট ভরে খেতে দাও না। আমি না থাকলে এতদিনে ও না খেতে পেয়েই মরে যেত। ও পেটের জ্বালায় ছুটে আসে আমার কাছে, সোহাগ-আহ্লাদ করতে আসে না।

বড়-জা বলিলেন, আমরা খেতে দিইনে, শুধু খাটিয়ে নিই,—আর তুমি ওকে খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেচ ?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন, ঠিক তাই। আজ পর্য্যন্ত কখনও ওকে দু'বেলা তোমরা খেতে দাওনি—কেবল মার-ধোর করেচ, আর যত পেরেচ খাটিয়ে নিয়েচ। তোমার ভয়ে আমি হাজার দিন ওকে আসতে বারণ করেচি, কিন্তু ক্ষিদে বরদাস্ত করতে পারে না, আর আমার কাছে পেট ভরে দুটো খেতে পায় বলেই ছুটে ছুটে আসে—চুরি-ডাকাতির পরামর্শ নিতে আসে না। কিন্তু তোমরা এতবড় হিংসুক যে, তাও চোখে দেখতে পার না।

এবার ভাশুর জবাব দিলেন। কেষ্টকে সুমুখে টানিয়া আনিয়া তাহার কোঁচার খুঁট খুলিয়া একটা কলাপাতার ঠোঙা বাহির করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, হিংসুক আমরা! কেন যে ওকে ভাল চোখে দেখতে পারিনে, তা তুমি নিজের চোখে ত্যাখো। মেজবৌমা, তোমার শেখানর গুণেই ও আমার টাকা চুরি ক'রে তোমার ভালোর জন্যে কোন্ একটা ঠাকুরের পুজো দিয়ে প্রসাদ এনেচে এই নাও; বলিয়া তিনি গোটা-দুই সন্দেশ ও ফুল-বেলপাতা ঠোঙার ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন।

কাদম্বিনী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, মা গো! কি মিটমিটে শয়তান, কি ধড়িবাজ ছেলে! বেশ ত মেজবৌ, এখন তুমিই বল না, কি মতলবে ও চুরি করেচে ? ও কি আমার ভালোর জন্যে ?

হেমাঙ্গিনী ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন। একে তাঁহার অসুস্থ শরীর, তাহাতে এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ, তিনি দ্রুতপদে কেষ্টর সম্মুখীন হইয়া তাহার দুই গালে

সশব্দে চড় কসাইয়া দিয়া কহিলেন, বদমাইস চোর, আমি তোকে চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েচি? কতদিন তোকে আমার বাড়ি ঢুকতে বারণ করেচি, কতবার তোকে তাড়িয়ে দিয়েচি! আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, তুই চুরির মতলবেই যখন তখন উঁকি মেরে দেখতিস্।

ইতিপূর্ব্বে বাড়ির সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। শিবু কহিল, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি মা, পরশু রাত্তিরে ও তোমার ঘরের সুমুখে আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। আমি এসে না পড়লে নিশ্চয় তোমার ঘরে ঢুকে চুরি করত।

পাঁচুগোপাল বলিল, জানে মেজখুড়িমার অসুখ শরীর—সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়েন——ও কি কম চালাক!

মেজবৌয়ের কেষ্টর প্রতি আজকার ব্যবহারে কাদম্বিনী যেরূপ প্রসন্ন হইলেন, এই ষোল বৎসরের মধ্যে কখনও এরূপ হন নাই। অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিলেন, ভিজে বেড়াল! কেমন করে জানব মেজবৌ, তুমি ওকে বাড়ি ঢুকতেও বারণ করেচ। ও বলে বেড়ায়, মেজদি আমাকে মায়ের চেয়ে ভালবাসে। ঠোঙা-সুদ্ধ নির্ম্মাল্য টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, টাকা তিনটে চুরি করে কোথা থেকে দুটো ফুলটুল কুড়িয়ে এনেচে।

বাড়ি লইয়া গিয়া বড়কর্ত্তা চোরের শাস্তি শুরু করিলেন। সে কি নির্দ্দয় প্রহার! কেষ্ট কথাও কহে না, কাঁদেও না। এদিকে মারিলে ওদিকে মুখ ফিরায়, ওদিকে মারিলে এদিকে মুখ ফিরায়। ভারী গাড়িসুদ্ধ গরু কাদায় পড়িয়া যেমন করিয়া মার খায়, তেমনি করিয়া কেষ্ট নিঃশব্দে মার খাইল। এমন কি কাদম্বিনী পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, হাঁ, মার খাইতে শিখিয়াছিল বটে! কিন্তু ভগবান জানেন, এখানে আসার পূর্ব্বে নিরীহ স্বভাবের গুণে কখন কেহ তাহার গায়ে হাত তুলে নাই।

হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের ভিতর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়াছিলেন। উমা মার দেখিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জ্যাঠাইমা বললেন, কেষ্টমামা বড় হলে ডাকাত হবে! ওদের গাঁয়ে কি ঠাকুর আছে—

উমা?

মায়ের অশ্রুবিকৃত ভগ্ন কণ্ঠস্বরে উমা চমকাইয়া উঠিল। কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

হাঁ রে, এখনো কি তাকে সবাই মিলে মারচে? বলিয়াই তিনি মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

মায়ের কান্না দেখিয়া উমাও কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর কাছে বসিয়া, নিজের আঁচল দিয়া জননীর চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, পেসন্নর মা কেষ্টমামাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে।

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিলেন না, সেইখানে তেমনি করিয়াই পড়িয়া রহিলেন। বেলা দু-তিনটার সময় সহসা কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল। আজ অনেকদিনের পর পথ্য করিতে বসিয়াছিলেন—সে খাবার তখনও একধারে পড়িয়া শুকাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর বিপিন ও-বাড়িতে বৌঠানের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রোধভরে স্ত্রীর ঘরে ঢুকিতেছিলেন, উমা কাছে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, মা জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

বিপিন চমকাইয়া উঠিলেন, সে কি রে, আজ তিন-চারদিন জ্বর ছিল না ত!

বিপিন মনে মনে স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কত যে বাসিতেন তাহা বছর চার-পাঁচ পূর্ব্বে দাদাদের সহিত পৃথক হইবার সময় জানা গিয়াছিল। ব্যাকুল হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, তখনও তিনি মাটির উপর পড়িয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া শয্যায় তুলিবার জন্য গায়ে হাত দিতেই হেমাঙ্গিনী চোখ মেলিয়া, একমুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—কেষ্টকে আশ্রয় দাও, নইলে এ জ্বর আমার সারবে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতে মাপ করবে না।

বিপিন পা ছাড়াইয়া লইয়া, কাছে বসিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দেবে?

বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন, তুমি যা চাও তাই হবে, তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

হেমাঙ্গিনী আর কিছু বলিলেন না, বিছানায় উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন।

জ্বর রাত্রেই ছাড়িয়া গেল, পরদিন সকালে উঠিয়া বিপিন ইহা লক্ষ্য করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হাত-মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া দোকানে বাহির হইতে-ছিলেন, হেমাঙ্গিনী আসিয়া বলিলেন, মার খেয়ে কেষ্টর ভারি জ্বর হয়েচে, তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসচি।

বিপিন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তাকে এ-বাড়িতে আনবার দরকার কি? যেখানে আছে সেখানেই থাক না।

হেমাঙ্গিনী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিলেন, কাল রাত্রে যে তুমি কথা দিলে, তাকে আশ্রয় দেবে?

বিপিন অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ—সে কে যে, তাকে ঘরে এনে পুষতে হবে! তুমিও যেমন!

কাল রাত্রে স্ত্রীকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, আজ সকালে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তাহাই তুচ্ছ করিয়া দিলেন। ছাতাটা বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন; পাগলামি ক'র না,—দাদারা ভারি চটে যাবেন।

হেমাঙ্গিনী শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, দাদারা চটে গিয়ে কি তাকে খুন করে ফেলতে পারেন, না, আমি নিয়ে এলে সংসারে কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে? আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হয়েচে। আমি কেষ্টর মা।

আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া বিপিন চলিয়া যাইতেছিল, হেমাঙ্গিনী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এ-বাড়িতে তাকে আনতে দেবে না?

সর, সর—কি পাগলামি কর? বলিয়া বিপিন চোখ রাঙাইয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, শিবু, একটা গরুর গাড়ি ডেকে আন, আমি বাপের বাড়ি যাব।

বিপিন শুনিতে পাইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, ইস্! ভয় দেখানো হচ্চে। তার পর দোকানে চলিয়া গেলেন।

কেষ্ট চণ্ডী মণ্ডপের একধারে ছেঁড়া মাদুরের উপর জ্বরে, গায়ের ব্যথায় এবং বোধ করি বুকের ব্যথায় আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল। হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, কেষ্ট!

কেষ্ট যেন প্রস্তুত হইয়া ছিল—এইবারে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, মেজদি! পরক্ষণে সলজ্জ হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। যেন তাহার কোন অসুখ-বিসুখ নাই, এই ভাবে মহা-উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচা দিয়া ছেঁড়া মাদুর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, ব'স।

হেমাঙ্গিনী তাহার হাত ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, আর ত বসব না দাদা, আয় আমার সঙ্গে। আমাকে বাপের বাড়ি আজ তোকে পৌছে দিতে হবে যে।

চল, বলিয়া কেষ্ট তাহার ভাঙা ছড়িটা বগলে চাপিয়া লইল এবং ছেঁড়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিল।

নিজেদের বাড়ির সদরে গো-যান দাঁড়াইয়াছিল, হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন। গাড়ি যখন গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন পশ্চাতে ডাকাডাকি চিৎকারে গাড়োয়ান গাড়ি থামাইল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আরক্ত-মুখে বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাও মেজবৌ?

হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে দেখাইয়া বলিলেন, এদের গ্রামে।

কখন্‌ ফিরবে?

হেমাঙ্গিনী গভীর দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ভগবান যখন ফেরাবেন, তখনই ফিরব।

তার মানে?

হেমাঙ্গিনী পুনরায় কেষ্টকে দেখাইয়া বলিলেন, কখনও যদি কোথাও এর আশ্রয় জোটে, তবেই ত একা ফিরে আসতে পারব, না হয়, একে নিয়েই থাকতে হবে।

বিপিনের মনে পড়িল, সেদিনেও স্ত্রীর এমনি মুখের ভাব দেখিয়াছিলেন এবং এমনি কণ্ঠস্বরই শুনিয়াছিলেন, যেদিন মতি কামারের নিঃসহায় ভাগিনেয়ের বাগানখানি বাঁচাইবার জন্য তিনি একাকী সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। মনে পড়িল, এ মেজবৌ সে নয়, যাহাকে চোখ রাঙাইয়া টলান যায়।

বিপিন নম্রস্বরে বলিলেন, মাপ কর মেজবৌ, বাড়ি চল।

হেমাঙ্গিনী হাত জোড় করিয়া কহিলেন, আমাকে তুমি মাপ কর—কাজ না সেরে আমি কোনমতেই বাড়ি ফিরতে পারব না।

বিপিন আর এক মুহূর্ত্ত স্ত্রীর শান্ত দৃঢ় মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, তার পর সহসা সুমুখে ঝুকিয়া পড়িয়া কেষ্টর ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কেষ্ট, তোর মেজদিকে তুই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই; শপথ করছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না। আয় ভাই, তোর মেজদিকে নিয়ে আয়।

পথ-নির্দ্দেশ

পথ-নির্দ্দেশ

১

মাঝারি গৃহস্থ-ঘরের বাড়ির কর্ত্তা যখন যক্ষ্মারোগে মারা যান, তখন তিনি পরিবারটিকে আধ-মরা করিয়া যান। সুলোচনার স্বামী পতিতপাবন ঠিক তাহাই করিয়া গেলেন। বর্ষাধিক কাল রোগে ভুগিয়া একদিন বর্ষার দুর্দ্দিনে গভীর রাত্রে দেহত্যাগ করিলেন। সুলোচনা কাল স্বামীর শেষ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দিয়া পাশে আসিয়া বসিয়াছিলেন, আর ওঠেন নাই। স্বামী নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন, সুলোচনা তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিলেন না। ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা হেমনলিনী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অদূরে মাদুরের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে জাগাইলেন না। সে ঘুমাইতে লাগিল, পিতার মৃত্যুর কথা জানিতেও পারিল না। বাড়িতে একটি ভৃত্য নাই, দাসী নাই, দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয় পর্য্যন্ত নাই। পাড়ার লোকও ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষ অপরাহ্ণ হইতেই বৃষ্টি চাপিয়া আসিয়াছিল বলিয়া দয়া করিয়া আজ আর কেহ রাত্রি জাগিবার নাম করিয়া ঘুমাইতে আসে নাই।

বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ভিতরে মৃত স্বামীকে চোখের সামনে লইয়া সুলোচনা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরদিন সংবাদ পাইয়া সকলেই আসিলেন, পুরুষেরা মড়া বাহির করিয়া শশ্মানে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরাও গোবর জল ছড়া দিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেলেন।

সুলোচনার থাকিবার মধ্যে শুধু একখানি ছোট আম-কাঁঠালের বাগান অবশিষ্ট ছিল। পাড়ার লোকের সাহায্যে সেইটি একশত টাকায় বিক্রয় করিয়া যথাসময়ে স্বামীর শেষ কাজ সমাধা করিয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিলেন। মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হবে মা এবার?

মা জবাব দিলেন, ভয় কি মা? ভগবান আছেন।

শ্রাদ্ধ-শেষে যাহা বাঁচিয়াছিল তাহাতে একমাস কোনমতে কাটিয়া গেল। তার পর একদিন আকাশ মেঘমুক্ত দেখিয়া প্রভাত না হইতেই তিনি ঘর-দোরে চাবি দিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়ে প্রশ্ন করিল, কোথায় যাবে মা?

মা বলিলেন, কোলকাতায়, তোর দাদার বাড়িতে।

আমার আবার দাদা কে? কোনদিন ত তাঁর কথা বলনি?

মা একটু চুপ করিয়া বলিলেন, এতদিন আমার মনে পড়েনি মা।

হেম অতিশয় বুদ্ধিমতী, সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাজ নেই মা কারু বাড়ি গিয়ে। দেশে থেকে দুঃখ করলে আমাদের দুটো পেটের ভাত জুটবে—আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সুলোচনা উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়াস্‌নে হেম, সকাল হয়ে যাবে। চলিতে চলিতে বলিলেন, তিনি তোকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েচেন—সে সমস্ত জলে ফেলিস্‌নে। তুই আমাকে কি বলবি হেম! আমি জানি, ঘরে বসে মায়ে-ঝিয়ে দুঃখ করলে পেটের ভাতটা জুটবে, কিন্তু তোর বিয়ে দেব কি করে বল দেখি মা?

হেম বলিল, বিয়ে নাই দিলে?

জাত যাবে যে রে।

হেম বলিল, গেলেই বা মা। আমরা দুটি মায়ে-ঝিয়ে থাকব—দুঃখ করে খাব, আমাদের জাত থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি। পৃথিবীতে আরো অনেক জাত আছে, মেয়ের বিয়ে না দিলে জাত যায় না। আমরা না হয় তাদের মত হয়ে থাকব।

মেয়ের কথা শুনিয়া সুলোচনা এত দুঃখের মাঝেও একটু হাসিলেন, বলিলেন, তা হলেও গাঁ ছাড়তে হবে। জাত গেলে কেউ উঠান ঝাঁট দিতেও ডাকবে না।

হেম আর জবাব দিল না। বিস্তর অপ্রীতিকর স্মৃতি ইহার পশ্চাতে উদ্যত হইয়া ছিল, সেইগুলি দমন করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

যে পথটা গঙ্গার পাশ দিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীরামপুর স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাঁহারা সেই পথ ধরিয়া প্রায় ক্রোশখানেক আসিয়া পথিপার্শ্বে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া হেম বলিল, মা, সকাল হয়ে গেছে, আমার পথ চলতে লজ্জা হচ্ছে।

সুলোচনার নিজেরও লজ্জা করিতেছিল। নীচে এক বৃদ্ধা প্রাতঃস্নানে আসিতে-ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, শ্রীরামপুর ইস্টিশানের এই পথ না?

বৃদ্ধা ক্ষণকাল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কোথা থেকে আসচ মা।

সুলোচনা সে-কথায় জবাব না দিয়া বলিলেন, ইস্টিশানে যাবার আর কোন পথ নেই মা?

দেবালয়ের বিপরীত দিকে একটি ছোট গলি বরাবর রেলওয়ে লাইনের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধা সেই পথটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই গলিটা বামুন-দের বাড়ির পাশ দিয়ে বরাবর রেলের রাস্তায় গিয়ে মিশেচে। এই পথ দিয়ে যাও। রেলের রাস্তা ধরে সোজা বাঁ-দিকে গেলে ছিরামপুর ইস্টিশনে পৌঁছুবে—যাও মা, ভয় নেই, কেউ কিছু বলবে না।

সুলোচনা কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

২

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের উপর গুণেন্দ্রর প্রকাণ্ড বাড়ি প্রায় খালি পড়িয়াছিল। তেতলার একটা ঘরে সে শয়ন করিত, আর একটায় লেখা-পড়া করিত। বাকী ঘরগুলো এবং সমস্ত দ্বিতলটা শূন্য পড়িয়াছিল। নীচের তলায় এক পাচক, দুই ভৃত্য ও এক দারোয়ান এক-একটা ঘর দখল করিয়া থাকিত, তদ্ভিন্ন সমস্ত ঘরই তালা-বন্ধ।

গুণেন্দ্রর পিতা লোহার ব্যবসা করিয়া মৃত্যুকালে এত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক সন্তান না থাকিয়া দশ সন্তান থাকিলেও কাহারো উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন হইত না। সেই টাকা এবং পিতার লোহার কারবার বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া সমস্ত টাকা গুণেন্দ্র ব্যাঙ্কে জমা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আদালতে ওকালতি করিতে বাহির হইয়াছিল।

ভৃত্য আসিয়া বলিল, বাবু, আপনার স্নানের সময় হয়েচে।

যাচ্ছি, বলিয়া গুণেন্দ্র পড়িতে লাগিল।

ভৃত্যটা খানিক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দুটি মেয়েমানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

গুণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে?

হাঁ বাবু, আপনার সঙ্গে। আপনার- -

তাহার কথা শেষ না হইতেই সুলোচনা ঘরে প্রবেশ করিলেন। গুণেন্দ্র বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুলোচনা চাকরটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুই নিজের কাজে যা।

ভৃত্য চলিয়া গেলে বলিলেন, গুণি, তোমার বাবা কোথায়, বাবা?

গুণেন্দ্র অবাক হইয়া রহিল, জবাব দিতে পারিল না।

সুলোচনা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার মুখের দিকে চেয়ে চিনতে পারবে না বাবা। প্রায় বার বছর আগে তোমাদের পাশের বাড়িতে আমরা ছিলাম। সেই বছর তোমার পৈতা হয়, আমরাও বাড়ি চলে যাই। তোমার বাবা কি দোকানে গেছেন?

গুণেন্দ্র বলিল, না, বছর-তিনেক হ'ল মারা গেছেন।

মারা গেছেন! তোমার পিসিমা?

তিনিও নেই! তিনি বাবার পূর্ব্বেই গেছেন!

সুলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দেখছি শুধু আমিই আছি। তোমার মা যখন মারা যান, তখন তুমি সাত বছরেরটি। তার পরে পৈতা না হওয়া পর্য্যন্ত

আমার কাছেই তুমি মানুষ হয়েছিলে। হাঁ, গুণি, তোর সইমাকে মনে পড়ে না রে?

গুণেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাঁ, মা! তুমি?

সুলোচনা হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া বলিলেন, হাঁ বাবা, আমিই।

গুণেন্দ্র একখানা চৌকি টানিয়া বলিল, ব'সো মা!

সুলোচনা হাসিয়া বলিলেন, যখন তোর আশ্রয়ে এসেছি তখন বসব বৈ কি। হাঁ রে, তুই এখনো বিয়ে করিস্‌নি?

এবার গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, এখনো ত সময় হয়ে ওঠেনি।

সুলোচনা বলিলেন, এইবার হবে। বাড়িতে কি কেউ মেয়েমানুষ নেই?

না।

রাঁধে কে?

একজন বামুন আছে।

সুলোচনা বলিলেন, বামুনের আর দরকার নেই, এখন থেকে আমি রাঁধব। আচ্ছা, সে পরে হবে। আমার আরো দু-চারটে কথা আছে, সেইগুলো বলে নি। আমার স্বামীর এখানকার কাজ যাবার পরে আমরা বাড়ি চলে যাই। হাতে কিছু টাকা তখন ছিল, দেশেও কিছু জমি-জমা ছিল। এতেই একরকম স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল। তার পর গত বৎসর তাঁকে যক্ষ্মারোগে ধরে। চিকিৎসার খরচে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করে তিনি মাসখানেক পূর্ব্বে স্বর্গে গেলেন। এখন অনাথাকে দুটি খেতে দিবি এই প্রার্থনা।

তাঁর চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গুণেন্দ্রর চোখও ছল ছল করিয়া উঠিল। সে কাতর হইয়া বলিল, মাকে মানুষে খেতে দেয় না, তুমি কি এই কথা মনে ভেবে এখানে এসেছ মা?

সুলোচনা আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, না বাবা, সে-কথা মনে ভেবে আসিনি। তা হলে এত দুঃখেও বোধ হয় আসতাম না। তোকে ছোটটি দেখে গেচি, আজ বার বছর পরে দুঃখের দিনে যখন মনে পড়েচে, কোন শঙ্কা না করেই চলে এসেচি। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে; আমার মেয়ে হেমনলিনী—সে তোরই বোন—সে আবার আমার চেয়ে অনাথা। বিয়ের বয়স হয়েচে, কিন্তু বিয়ে দিতে পারিনি। তার উপায় তোকে করে দিতে হবে।

গুণেন্দ্র বলিল, তাকে কেন সঙ্গে আননি মা?

সুলোচনা বলিলেন, এনেচি। কিন্তু সে বড় অভিমানিনী। পাছে এ-সব কথা

শুনতে পায়, তাই তাকে নীচে বসিয়ে রেখে আমি একলাই ওপরে এসেচি।

গুণেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া চাকরটাকে চীৎকার করিয়া ডাক দিয়া বলিল, ও নন্দা, নীচে হেম বসে আছে, যা শীগগির ডেকে নিয়ে আয়।

•সুলোচনা বলিলেন, তাকে উদ্ধার করতে তোর খরচ হবে—সে ঋণ আমি কোনদিন—

গুণেন্দ্র বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তবে মা, আমি বাইরে যাই, তোমার যা মুখে আসে বল। কিন্তু আমার মা মরে যাবার পর তুমি যা করেছিলে, সে সব ঋণের কথা যদি আমি তুলি তা হলে বলে রাখছি মা, তোমাকেও লজ্জায় বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার চেয়ে কাজ নেই—তুমিও চুপ কর, আমিও করি!

সুলোচনা হাসিয়া বলিলেন, তাই ভাল। তবে মেয়েটা আসচে, তার সামনে আর বলা হবে না—তাই এইবেলা বলে রাখি। মনে করিসনি গুণী, আমি মায়ের চোখ নিয়ে একথা বলচি, কিন্তু হেম এলে দেখতে পাবি তোর বোন রূপে গুণে কোন মানুষেরই অযোগ্য হবে না। তার বাপ তাকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েচে, শেষ কয়েক বছর এইটেই তার একমাত্র কাজ ছিল। আমি বলচি, ও মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ঘরই আলো হবে। ও হেম, এই দিকে আয়—ইনি তোর গুণীদাদা—প্রণাম কর।

হেম ঘরে ঢুকিয়া গুণেন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইল। তাহার পথশ্রমে ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া গুণেন্দ্র বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুলোচনা বোধ করি সে ভাব লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, গুণী, হেমকে তোর হাতেই দিতাম, যদি না দেশাচারে নিষেধ থাকত। আমি মরলে হেমের দশ দিন অশৌচ হবে, তোকেও তিন দিন অশৌচ মানতে হবে, তাই ধর্ম্মতঃ ও তোর বোন হয়।

গুণেন্দ্র এবার নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া হেমকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, হেম, শুনলে ত,—আমাদের একই মা। মায়ের বাড়িতে আমিও যেমন, তুমিও তেমনি। চল, তোমাদের খাবার যোগাড় করে দি।

সুলোচনা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তোর গলায় পৈতে দেখছি না যে!

গুণেন্দ্র খালি-গায়ে ছিল, সে নিজে গলার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্ম; ছি বাবা, কাজটা ভাল করনি। যাই হোক, প্রায়শ্চিত্ত করে পৈতে নাও।

গুণেন্দ্র বলিল, কাজটা যদিও আমার ঠিক করা নয়, বাবা নিজেই করে গেছেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত করারও কোন আবশ্যক দেখিনে মা। ব্রাহ্ম মতটা মন্দ বলে মনে করি না।

সুলোচনা মনে মনে যেন শক্ত আঘাত পাইয়া বসিয়া পড়িলেন। খানিক পরে নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, জানিনে কেন মানুষের এ-সব দুর্ব্বুদ্ধি হয়।

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, দুর্ব্বুদ্ধির কথা অন্য সময়ও হতে পারবে মা, এখন রান্নাঘরের দিকে চল।

৩

পথিক যেমন গাছতলায় রাঁধিয়া খাইয়া হাঁড়িটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায় এবং তখন চাহিয়া দেখে না হাঁড়িটা ভাঙ্গিল কি বাঁচিল, সংসারে শতকরা নব্বই জন লোক ঠিক এমনি করিয়াই সরস্বতীর কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া মা-লক্ষ্মীর রাজপথের ধারে নির্ম্মমভাবে তাঁহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়—একবার ফিরিয়াও দেখে না তিনি ভাঙিলেন, কি বাঁচিলেন। গুণেন্দ্র সেইরূপ করে নাই। সে চিরদিন যেভাবে শ্রদ্ধা করিয়া সেবা করিয়া আসিয়াছিল, উকীল হইয়াও ঠিক তেমনি করিয়াই সরস্বতীর সেবা করিতে লাগিল। তাহার পড়িবার ঘর পুস্তকে ভরিয়া উঠিয়াছিল; সেই ঘরের মধ্যে হেমনলিনী ভারি আশ্রয় পাইল। গুণেন্দ্র গুছান প্রকৃতির লোক ছিল না বলিয়া তাহার যে পুস্তক একবার আলমারির বাহিরে আসিত তাহা শীঘ্র আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত না। টেবিল, চেয়ার, অবশেষে নীচের গালিচার উপর পড়িয়া সুদীর্ঘকাল পরে যদি কোনগতিতে নন্দার সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করিত, আবশ্যক না হইলে আর বাহির হইত না—এমনি মিশিয়া যাইত। একটা পুস্তকের তালিকাও তাহার ছিল বটে, কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাইবার কিছু মাত্র উপায় ছিল না।

হেম এই বিশৃঙ্খলা দুই-চারিদিনের মধ্যেই ঠিক করিয়া ফেলিল। একদিন একটা আলমারি খালি করিয়া সমস্ত বই নীচে নামাইয়াছে, এমন সময়ে গুণেন্দ্র ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া হেম বলিল, গুণীদা, এই বইগুলো ঐ আলমারিতে, আর ওই বইগুলো এই আলমারিতে রাখলে ভারি সুবিধে হয়।

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, কি সুবিধে হয়?

হেম বলিল, বাঃ, সুবিধে হবে না? দেখচ না এই বইগুলো এইটাতে রাখলে কেমন—

গুণেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল, দেখতে পাচ্ছি বটে, খুব সুবিধে হবে।

হেম একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, যাও—করব না, তোমার ভাল করতে নেই।

গুণেন্দ্র একখানা বই তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এই ঘরটিতে হেমনলিনী দিবারাত্র থাকিত বলিয়া, গুণেন্দ্র আজকাল তাহার শোবার ঘরে বসিয়াই পড়া-শুনা করিত। একদিন রবিবারে দুপুরবেলা হেম বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, গুণীদা, আসব?

গুণী ভিতর হইতে বলিল, এস।

হেম ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, তুমি সব সময়ে এই শোবার ঘরে বসেই বই পড় কেন?

দোষ কি? এ-ঘরে কি বিদ্যে কম হয়?

তোমার পড়বার ঘরেই কি এতদিন কম হয়েছিল?

গুণেন্দ্র বলিল, কম হয়নি বটে, কিন্তু কাঁচা হয়েছিল—এই ঘরে সেগুলো পাকছে।

হেম প্রথমে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু কথাটা বুঝিতে না পারিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তোমার কেবল তামাসা। একটা কথাও তুমি সোজা করে বলতে জান না।

গুণী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, জবাব দিল না।

হেম বলিল,আমি কিন্তু জানি। ও-ঘরে আমি থাকি বলেই তুমি যাও না। আমাকে তুমি লজ্জা কর। আমি কিন্তু তোমাকে একটুও লজ্জা করিনে।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন কর না, করা ত উচিত।

হেম হাত দিয়া একগাছা চুল কপালের উপর হইতে পিঠের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিল, তোমাকে আবার লজ্জা করতে যাব কি, তুমি কি পর? সে হবে না গুণীদা, চল সে ঘরে। বলিয়া সে বইগুলি তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

হেমের সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য হার, চুড়ি, বালা প্রভৃতি কতকগুলা অলঙ্কার গুণী কিনিয়া আনিয়াছিল। সুলোচনা দেখিয়া বলিলেন, কেন বাবা এ সব?

গুণী বলিল, এই কটিতে কি হবে মা, আরো ঢের চাই। শুধু-হাতে ত মেয়ে পার হবে না।

সুলোচনা আর কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুটিতে কেমন করিয়া যে এত সত্বর এত আপনার হইয়া গেল, এই কথা তিনি যখন তখন ভাবিতে লাগিলেন। একদিন তিনি গুণীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই সামনের অঘ্রান যেন বয়ে না যায় বাবা। যেমন করে হোক, ওর বিয়ে দিতেই হবে। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

গুণী বলিল, সেজন্য তুমি নিশ্চিত থাক মা। কিন্তু হাত-পা বেঁধে জলে ফেলেও ত দিতে পারব না। একটি সুপাত্র চাই।

সুলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, সুপাত্র অপাত্র ওর অদৃষ্ট গুণী। আমাদের কাজ আমরা করব, তার পরে ভগবানের হাত।

সে ঠিক কথা মা, বলিয়া গুণী চলিয়া গেল। তাহার মুখের উপর দিয়া একটা কালো ছায়া ভাসিয়া গেল, সুলোচনা তাহা লক্ষ্য করিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, না, ভাল হচ্ছে না—যত শীঘ্র পারা যায় পাত্রস্থ করা চাই।

কয়েকদিন পরে হেম হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এখনো শুয়ে আছ—কাপড় পরনি? শীগ্‌গির ওঠ।

গুণী বিছানার উপর শুইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। হেম আলমারির কাছে গিয়া খট্ করিয়া আলমারি খুলিয়া একমুঠা নোট ও টাকা লইয়া আঁচলে বাঁধিল। চাবি বন্ধ করিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি গুণীদা, আর দেরি ক'রো না, ওঠ। দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

গুণী তাহার সাজগোজ দেখিয়া কতকটা অনুমান করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে?

হেম ব্যস্ত হইয়া বলিল, বেশ! গাড়ি তৈরী করতে বলে দিয়েছি এক ঘণ্টা আগে। এখন—তুমি বলছ কোথায় যেতে হবে!

গুণী বলিল, কোচম্যান্ না হয় জানতে পারে কোথাও যেতে হবে; আমি ত কোচম্যান্ নই, জানব কি করে?

হেম হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি কোচম্যান কেন হবে গুণীদা? চল, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

কোন দোকান?

বইয়ের দোকান গো! তোমাকে মানদা বলে যায়নি? আমি তাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলাম যে! অনেক ভাল ভাল নূতন বাংলা বই বেরিয়েছে—আমি একটা লিস্টি করেচি।

তাহার হাতে একটা কাগজের টুকরো দেখিয়া গুণী হাত বাড়াইয়া বলিল, লিস্টি দেখি।

না, তা হলে তুমি কিনতে দেবে না।

তা বলে চুরি করে কিনলেও পড়তে দেবো না।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা চল, গাড়িতে দেখাব।

সন্ধ্যার পর তাহারা একগাড়ি বই কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। সুলোচনা দেখিয়া বলিলেন, ইস্? এত বই কি হবে রে।

গুণী বলিল, কি জানি মা, ও-সব হেমের বই। কেবল কতকগুলা বাজে বই কিনে টাকা নষ্ট করে এল।

সুলোচনা বলিলেন, তুই দিলি কেন?

গুণী বলিল, আমি কেন দেব? চাবি ওর হাতে, ও নিজে টাকা নিলে, গাড়ি তৈরী করতে বলে দিলে, তার পর নিজে গিয়ে কিনে আনলে—আমি শুধু সঙ্গে ছিলাম বৈ ত নয়।

হেম পুস্তকের রাশি নন্দাকে দিয়া, মানদাকে দিয়া এবং কতক নিজে বহিয়া লইয়া তেতলার ঘরে চলিয়া গেল।

সুলোচনা বলিলেন, গুণী, অত প্রশ্রয় দিসনে বাবা! কোথায় কার হাতে পড়বে, তখন দুঃখে মারা যাবে।

গুণী উপরে পড়িবার ঘরে গিয়া দেখিল, হেম গ্যাসের আলোকে নীচে বসিয়া নূতন পুস্তকের পিছনে আঠা দিয়া নম্বর আটিতেছে; দেখিয়া বলিল, মা বলেছেন, তোমাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না! কোথায় কার হাতে পড়ে দুঃখে মারা যাবে।

হেম মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কেন মারা যাব? আমাকে গরীব-দুঃখীর ঘরে দিলে, আমি তার পরের দিনই পালিয়ে আসব।

গুণী হাসিয়া বলিল, তবে সেই ভাল।

হেম আর জবাব দিল না, কাজ করিতে লাগিল। গুণেন্দ্র কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস দমন করিয়া লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেল। বিজয়ার দিনে গাড়ি করিয়া ঠাকুর-ভাসান দেখিয়া ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়া হেম উপরে উঠিয়া গেল। তেতলার খোলা ছাদের উপর জ্যোৎস্নার আলোকে গুণেন্দ্র একা পায়চারী করিতেছিল, হেম সুমুখে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া দাঁড়াইল। গুণেন্দ্র নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, একবার একটুখানি যেন লজ্জা করিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বলিল, আমাকে আশীর্বাদ করলে না গুণীদা?

গুণেন্দ্রর চমক ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, করেছি বৈ কি।

কৈ করলে?

মনে মনে করেছি।

হেম হাসি চাপিয়া বলিল, কি আশীর্ব্বাদ করলে আমাকে বল।

গুণেন্দ্র বিপদগ্রস্ত হইয়া অবশেষে গম্ভীর হইয়া বলিল, আশীর্ব্বাদ করে বলতে নেই। তা হলে ফলে না।

হেম বলিল, আচ্ছা সে হবে, তুমি মাকে প্রণাম করেচ?

সে তো রোজ করি!

হেম ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, সে হবে না। আজ বিজয়া, আজ বিশেষ করে প্রণাম করতে হয়। শীগ্‌গির যাও—না হলে তিনি দুঃখ করবেন।

গুণেন্দ্র নীচে নামিয়া গেল।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি একদিন হেম ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, তোমাদের কি আর কথা নেই, আর কাজ নেই? তোমাদের কি করেছি আমি! বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

গুণেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, কি হয়েছে হেম?

হেম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যেন কিছু জানে না! কি হয়েছে হেম! মা বলছিলেন, শান্তিপুরে, না কোথায়, সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে। আমি যদি বিয়ে না করি, তোমরা কি জোর করে আমার হাত-পা বেঁধে দিতে পার?

গুণেন্দ্র এবার বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ এই কথা! বড় হয়েছো তোমার বিয়ে দিতে হবে না?

না।

না কি? বিয়ে না দিলে জাত যাবে যে!

বিয়ে না দিলে তোমাদের জাত যায় কি?

গুণেন্দ্র কহিল, আমাদের যায় না—আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু তোমাদের যখন সময়ে না দিলে জাত যায়, তখন দিতে হবে।

হেম চোখ মুছিয়া বলিল, তোমরা ঠিক। তোমরাই মানুষ, তাই মানুষকে এমন ধরে-বেঁধে বধ কর না। আমি কিছুতেই এ-বাড়ি ছেড়ে যাব না—তা তোমরা যত মতলবই কর না?

গুণেন্দ্র তাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, সেও খুব বড়

বাড়ি। তিনি দেখতে শুনতে ভাল, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বড়লোক, সেখানে তোমার কোন কষ্ট হবে না।

হেম কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া সবেগে মুখের উপর হইতে চুল সরাইয়া দিয়া কহিল, সে হবে না—কিছুতেই হবে না, তোমায় আমি বলছি। আমি তোমাদের ভার-বোঝা হয়ে থাকি, আমাকে খেতে দিতে হবে না। আমি উপোস করে আমার পড়বার ঘরে পড়ে থাকব—আমি কিছু চাইব না।

গুণেন্দ্র হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, সেখানেও তোমার পড়বার ঘর পাবে। না পাও, তোমার এই ঘর আমি সেখানে তুলে দিয়ে আসব।

হেম সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, তোমাকে কিছু করতে হবে না গুণীদা, কিচ্ছু না। এই অঘ্রান মাসে? এই এক মাস পরে? তোমার দুটি পায়ে পড়ি গুণীদা, তুমি সম্বন্ধ ভেঙে দাও।

তাহার কান্না দেখিয়া গুণেন্দ্রর নিজের চোখও ভিজিয়া উঠিয়াছিল। সে কোন মতে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, সে কি হয় ভাই? সে হয় না। কথাবার্ত্তা সব পাকা হয়ে গেছে?

ছাই কথাবার্ত্তা! ছাই পাকা কথা! তুমি সম্বন্ধ করেছ, তুমি ইচ্ছে করলে ভেঙে দিতে পার। আমি হাত জোড় করে বলছি গুণীদা, আমার এই কথাটি রাখো।

সুলোচনা সন্দিগ্ধ-চিত্তে পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, ঘরে ঢুকিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, এ-সমস্ত তোর কি হচ্ছে হেম? এ-সব কি পাগলের মত বকচিস? সম্বন্ধ কি কখনো ভাঙা যায়, না, পাকা-কথার নড়চড় করা যায়? আর ভাঙবেই বা কেন? তোর ভাগ্যি ভাল যে, এমন ভাই পেয়েছিস। এমন সম্বন্ধ জুটেছে—তুই বলিস্ কি না, ভেঙে দিতে? বাঙালী মেয়ে খ্রীষ্টানীর মত আইবুড়ো থুবড়ো হয়ে থাকবি? যা নীচে যা।

হেম চলিয়া গেল, সুলোচনা গুণেন্দ্রর দিকে চাহিয়া কহিলেন, এইসব দিন-রাত বই পড়ার ফল। চব্বিশ ঘণ্টা নভেল, নাটক, নিয়ে থাকলেই এই সমস্ত দুর্ম্মতি হয়। অঘ্রান মাসে যেমন করে হোক, ওকে বিদায় করতেই হবে।

গুণেন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুলোচনা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

দুই দিন পরে আদালত হইতে ফিরিয়া কি একটা বইয়ের জন্য গুণেন্দ্র পড়িবার ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, ভিতর হইতে হেম বলিয়া উঠিল, এসো না গুণীদা, আমি যাচ্ছি।

গুণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থেলেই বা। আমি ঘরে ঢুকলেই কি খাওয়া নষ্ট হবে?

হেম কহিল, সমস্ত ঘরময় কার্পেট পাতা রয়েছে যে।

গুণী বলিল, তোমার দাদী মানদা ঢুকলে জাত যায় না, আমি কি তার চেয়ে ছোট?

হেম অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা এসো, আমার খাওয়া হয়েছে। বলিয়া খাবারের থালাটা টেবিলের ওধারে সরাইয়া দিল।

না না, তুমি খাও, তুমি খাও, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি। বলিয়া গুণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার বুকের ভিতরটা যেন জ্বালা করিতে লাগিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় গুণী ভাত খাইয়া উঠিবামাত্রই হেম কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই পাতা আসনে বসিয়া বলিল, বামুনঠাকুর, আমাকে এই পাতে ভাত দাও।

বামুনঠাকুর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ওতে যে বাবু খেয়ে গেলেন!

হেম বলিল, হাঁ, হাঁ, জানি, তুমি দাও না।

পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইয়া সুলোচনা নিকটে আসিয়া বলিলেন, ও কি করছিস্ হেম! ও যে গুণীর এঁটো পাতা; যা কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আয়।

হেম উচ্ছিষ্টাবশেষ হইতে একগ্রাস মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, ঠাকুর, ভাত দাও। গুণীদার এঁটো পাতে বসে খাবার যোগ্যতা সংসারের কজনের ভাগ্যে আছে? এ পাতে খেতে পাওয়া ভাগ্য।

সুলোচনা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, বামুনঠাকুর আরও ভাত-তরকারী আনিয়া থালের উপর দিয়া গেল।

গুণী বারান্দার ওধারে বসিয়া মুখ ধুইতেছিল, সমস্ত শুনিতে পাইল। সন্ধ্যার পর সে হেমকে বলিল, আজ হেমের জাত গেল।

হেম নূতন বই লইয়া মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, তোমাকে কে বলল?

যেই বলুক, জাত গেছে ত?

হেম মুখ তুলিয়া বলিল, না। তোমার পাতে বসে খেলে কারু জাত যায় না—যারা জাত তৈরী করেছে—তাদেরও না।

গুণী অদূরে আর একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, তা হোক, কিন্তু কাজটা ভাল হয়নি। যার যা জাত, তাই তার মেনে চলা উচিত। তা ছাড়া মাকে দুঃখ দেওয়া হয় যে।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ যেন রাগ করিয়া বলিল, এ যেন

তোমার বাড়ি নয়, তোমার জায়গা নয়, তুমি যেন সকলের নীচে, সকলের ছোট। এ যদি বা তোমার সহ্য হয়, আমার হয় না। তোমার পাতে বসে খেলে মা দুঃখ পান; না খেলে, মার চেয়ে যিনি বড় তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়। আচ্ছা, তুমি এখন যাও—আমি বকতে পারিনে, পড়ি। বলিয়া সে খোলা বইয়ের পাতার উপর তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িল।

গুণেন্দ্র খানিক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। তাহার দুই চোখের উপর হইতে একটা কালো পর্দা আজ যেন অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

৪

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে নবদ্বীপে এক বড়লোকের ঘরে হেমের বিবাহ হইয়া গেল। সে দূর হইতে গুণীদাকে প্রণাম করিয়া স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গেল। সেখানে শ্বশুর, শ্বশ্রূ, জা, ননদ, কেহই ছিল না; স্বামীর পিতামহী, এবং স্বামীর অবিবাহিত ছোট ভাই—সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে।

কিশোরীবাবুর বয়স ছত্রিশের কাছাকাছি। তিনি বিপত্নীক হইয়া অবধি একটি ডাগর মেয়ে খুঁজিতেছিলেন, তাই হেমকে না দেখিয়াই তাঁহার পছন্দ হইয়া গেল। বিবাহের পর তিনি সুলোচনাকে এ বাড়িতে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সুলোচনা সম্মত হইয়া মেয়ের কাছে পত্র লিখাইলেন। তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন, এই ইচ্ছা।

হেম জবাবে লিখিল, তুমি যে-বাড়িতে আছ মা, সে বাড়ির হাওয়া লাগলেও সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। ওখান থেকে যদি তোমার পুণ্যসঞ্চয় না হয়, বৈকুণ্ঠে গেলেও হবে না। ওকে ছেড়ে যদি তুমি এস, আমি নিজে গিয়ে তাঁর কাছে থাকব।

মেয়েকে তিনি চিনিতেন, তাই যাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার কোথাকার অজানা নবদ্বীপের আশে-পাশে দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমনি করিয়া আরো ছয় মাস কাটিয়া গেল। একদিন তিনি আর থাকিতে না পারিয়া কি একটা উৎসবের উপলক্ষ্য করিয়া নন্দাকে সঙ্গে করিয়া স্টীমারে চড়িয়া বসিলেন। সেখানে গিয়া মেয়েকে রোগা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, কেউ নাই এখানে, বোধ করি তোর যত্ন হয় না।

মেয়ে হাঁ-না একটা জবাবও দিল না।

উৎসব শেষ হইয়া গেল, তবু তাঁহার ফিরিবার গা নাই দেখিয়া একদিন হেম বলিল; আর কতদিন জামাইয়ের বাড়ি থাকবে মা? লোকে নিন্দে করবে যে!

সুলোচনা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচিস্! এ তবু ত আপনার মেয়ে-জামায়ের বাড়ি, সেইখানেই কোন্ নিজের বাড়িতে ফিরে যাব শুনি?

হেম কিছুক্ষণ অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, তোমার দোষ নেই মা, এ আমাদের মেয়েমানুষের স্বধর্ম। আমরা আপনার-পর একদিনেই ভুলে যাই।

দিন কাটিতে লাগিল, আবার দুর্গাপূজা ঘুরিয়া আসিল। গুণী বড় ঘটা করিয়া পূজার তত্ত্ব পাঠাইয়াছিল। সুলোচনা হেমকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, গুণী আমার ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু এ-সব জানে।

মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাড়ায় বিতরণ করিয়া কাপড়-চোপড় সকলকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি নেই, তাই ছেলে আমার বোনকে তত্ত্ব পাঠিয়েছে; এবং পূজা দেখিয়াই তিনি ঘরে ফিরিবেন, এ-কথাও সকলের কাছে প্রচার করিয়া দিলেন। তাঁহার যাওয়া সম্বন্ধে হেম সেদিন হইতে আর কোন কথা বলিত না, আজও চুপ করিয়া রহিল। সুলোচনা বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে বলিলেন, যদি কখন ভগবান দিন দেন তখন বুঝবি মা, সন্তানকে ছেড়ে যেতে মায়ের প্রাণ কি করে!

কিন্তু পূজা শেষ না হইতেই সুলোচনাকে শক্ত করিয়া ম্যালেরিয়ায় ধরিল। মাস-খানেক জ্বরভোগের পরে, একদিন হেম বলিল, আর কেন মা, বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করতে হয়, যদি বাঁচতে চাও গুণীদাকে ডাক দাও। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, তারপর সেই জল ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, ঊর্ধ্বমুখে সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

মা বলিলেন, তাই কর্ হেম, তাকে চিঠি লিখে দে।

হেম বাড়ির সরকারকে দিয়া মাকে লইয়া যাইবার জন্য গুণেন্দ্রকে চিঠি লিখাইয়া দিল।

দুইদিন পরে মানদা ও দারোয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল। হেম মানদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গুণীদা এলো না কেন রে?

মানদা বলিল, তাঁরও অসুখ। প্রায় দু হপ্তা হয়ে গেল, সর্দি-কাসি, কোনদিন বা একটু জ্বরও হয়, না হলে তিনিই আসতেন। হেম আশা করিয়াছিল, গুণীদা আসিবে।

সুলোচনা চলিয়া গেলেন। গুণী ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দাস-দাসী সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে পাঠাইয়া দিল। যাইবার সময় সুলোচনা বলিলেন, গুণী, তুইও আমার সঙ্গে আয় বাবা, তোর দেহটাও ভাল নেই—চল দু'জনেই যাই। গুণী স্বীকার করিতে পারিল না। তাহার কলিকাতায় কাজ ছিল, সে রহিয়া গেল।

পশ্চিমে গিয়া সুলোচনা সারিতে লাগিলেন। তিনি নবদ্বীপে ও কলিকাতায় চিঠি লিখিয়া সংবাদ জানাইলেন যে, শরীর ভাল থাকিলে মাঘের শেষে দেশে ফিরিবেন।

গত ছাব্বিশে অগ্রহায়ণ হেমের বিবাহ হইয়াছিল, আজ ছাব্বিশে অগ্রহায়ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ এই কথাটা স্মরণ করিয়া গুণী ক্ষণকালের জন্য বই হইতে মুখ তুলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল, এমন সময় পিছনে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া নূতন দারোয়ান ডাকিল, মহারাজ, একঠো জরুরি তার আয়া।

গুণী মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দারোয়ান বুদ্ধি করিয়া পিওনকে সঙ্গে আনিয়াছে। সে খাম হাতে দিয়া দস্তখত লইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

গুণী তার পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হেম খবর দিতেছে, সে রওনা হইয়া পড়িয়াছে, হুগলীতে নামিয়া ট্রেনে করিয়া আসিবে, সুতরাং বেলা তিন-চারটার সময় যেন হাওড়া স্টেশনে গাড়ি পাঠান হয়। সে কিজন্য আসিতেছে, সঙ্গে কে কে আছে, কিশোরীবাবু আছেন কিংবা সে একলাই আসিতেছে, কিছুই বোঝা গেল না। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেহ ছিল না; মানদা সুলোচনার সহিত পশ্চিমে গিয়াছিল, তাই গুণী কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। পুরাতন কোচম্যান্ গাড়ি লইয়া গেল এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হেমকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে দাস-দাসী, চাকর এবং কিছু জিনিসপত্র ছিল। গুণী হেমকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, এ কি রকম পাগলের মত বেশ করে আসা হ'ল শুনি?

হেম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ওপরে চল বলছি। উপরে বসিবার ঘরে গিয়া স্থির হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা ত মাঘ মাসের আগে ফিরবেন না?

গুণী বলিল, মা সেইরকমই ত লিখেছেন।

তা হলে তাঁকে এর মধ্যে আর জানিয়ে কাজ নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ গুণীদা, আজকের দিনে বিদেয় হয়েছিলাম, আজকের দিনেই ফিরে এলাম।

গুণী বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ফিরে এলাম কি?

হেম সহজভাবে বলিল, ফিরে এলাম বৈ কি! আর সেখানে কি করে থাকব; কেন, তুমি কি আমার থানকাপড় দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? পরশু কাজ-কর্ম্ম শেষ হয়ে গেল, আজ চলে এলাম।

গুণী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, একটা খবরও দাওনি—কি হয়েছিল কিশোরীবাবুর ?

হেম বলিল, ও-বুধবারে সন্ধ্যাবেলাতেই কলেরার লক্ষণ টের পাওয়া যায়। ওদেশে যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করা গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। পরদিন দশটার সময় মারা গেলেন।

গুণী কিছুক্ষণ পরে অলক্ষ্যে আর্দ্রচক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু মা শুনলে একেবারে মারা যাবেন। যতদিন তিনি জানতে না পারেন, ততদিনই ভাল।

হেম বলিল, কি করবে গুণীদা ? তোমরা ভগবানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলে সে কথা কেবল আমিই মনে মনে টের পেয়েছিলাম। তখন আমার কথা তোমরা গ্রাহ্য করলে না—এখন কান্না, আর হায় হায়! খিদে পেয়েচে, কি খাই বল ত ? কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর রাঁধতে পারব না—কিছু ফলমূল খেয়েই আজকের দিন কাটাই।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, ও-বেলাতেও খাওয়া হয়নি ?

না। সকালে ষ্টীমার ধরতে হয়েছিল।

মাঘের শেষে সুলোচনা ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু রোগমুক্ত হইয়া আসিতে পারিলেন না। তার পর ঘরে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া সেইদিনই আবার শয্যা গ্রহণ করিলেন। এ শোক তাঁহার বুকে শেলের মত বাজিল। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অন্ত রহিল না, কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হইতে চাহিল না। একদিন তাঁহার হাত-পা ফুলিয়া উঠিল দেখিয়া গুণী অতিশয় চিন্তিত হইল। সেদিন তিনিও গুণীকে নিভৃতে পাইয়া বলিলেন, আর কি হবে বাবা চেষ্টা করে ? আমাকে একটু শান্তিতে যেতে দে।

গুণী চোখের জল চাপিয়া বলিল. এমন কি হয়েছে মা, যে, একেবারেই তুমি নিরাশ হয়ে পড়েছ ?

সুলোচনা বলিলেন, আচ্ছা, তুই বলে দে, আমার আশা করবার আর কি বাকী আছে ?

গুণী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সুলোচনা বলিলেন, গুণী, আমি অত নির্ব্বোধ নই বাবা, আমি জেনে-শুনে যে পাপ করেছি, সেই পাপ আমাকে যেন ভিতর থেকে পলে পলে ভস্ম করে আনছে। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, একটা কথা আমাকে সত্য করে বল্ গুণী ? আমি বেশ জানি, একদিন তুই আমার হেমকে স্নেহ করতিস, আর একবার চেষ্টা করলে তাকে আবার স্নেহ করতে পারিস্‌নে ?

গুণী মুখ নীচু করিয়া বলিল, তাকে ত চিরকালই স্নেহ করি মা। সেদিনও করেছি, আজও করি। তার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি বেঁচে থাকতে সে কোন দুঃখ পাবে না।

সুলোচনা বলিলেন, তা জানি। আচ্ছা, এই আমার শেষ আশীর্ব্বাদ তোদের উপর রইল, যদি কোনদিন আবশ্যক হয়, এ-কথা তাকে বলিস্। আর একটা কথা বাবা—এখানে থাকতে হেম আমাকে চিঠি লিখেছিল, মা, যেখানে তুমি আছ, সে বাড়ির হাওয়া লাগলে সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। ও-বাড়িতে থেকেও যদি তোমাদের পুণ্যসঞ্চয় না হয়, বৈকুণ্ঠেও হবে না। আয় বাবা, আমার মরণ-কালে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর, যেন পাপমুক্ত হই। আমার অপরাধ যে কত বড় গুণী, সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

গুণী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। সে যথার্থই সুলোচনাকে মায়ের মত ভালবাসিত।

সুলোচনা বলিলেন, হেমকে আমি কোন কথাই বলে যেতে পারব না। তার দিকে তাকালেই আমার বুকের ভিতর হু হু করে জ্বলতে থাকে। লোকে সৎমার গল্প করে, আমি সৎমার চেয়েও তার শত্রু।

পরদিন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইল। তাঁহার বাঁচিবার আশা সকলেই ত্যাগ করিল। তাঁহার শ্বাসকষ্টের সূত্রপাতেই তিনি হেমকে কাছে ডাকাইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

হেম, তবে বিদায় হ'লাম মা!

হেম মায়ের বুকের উপর পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে তিনি ইসারায় উঠিতে বলিয়া বলিলেন, কাঁদিসনে মা। সুখে-দুঃখে পনের বছর তোকে বুকে করে কাটিয়েচি; আজ সময় হয়েচে, তাই তোর বাপের কাছে যাচ্ছি। আজ আমার সুখের দিন, আজ আমি কাঁদতাম না হেম, আজ হেসে আমোদ করে যেতাম, যদি না তোকে এমন করে নষ্ট করতাম। আমি লজ্জায়, দুঃখে তোর মুখের পানে যে চাইতেই পারছি না মা!

হেম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কেন অমন করে তুমি বলছ মা, আমার কপালে যা ছিল তাই হয়েছে, এতে তোমার হাত কি?

সুলোচনা বাধা দিয়া বলিলেন, আমার হাত ছিল, সে হাত আমি নিজের হাতেই কেটেছি। তুই বলছিস, মন্দ কপাল, কিন্তু তোর কপালের মত ভাল কপাল এ-রাজ্যে একটি মেয়েরও ছিল না, আমি যদি না মাঝে পড়ে সমস্ত নষ্ট করে দিতাম। আমি যে সমস্তই জানি; তাতেই ত এ দুঃখ রাখবার জায়গা খুঁজে পেলাম না। অজানা পাপের উপায় আছে, কিন্তু জেনে-শুনে পাপ করার কোথায় মোচন পাব মা?

তাঁহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হেম

আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলে, কিছুক্ষণ পরে সুলোচনা পুনরায় বলিলেন, মায়ের উপর রাগ করিসনে মা। পাছে এ-কথা বললে তোর অকল্যাণ হয় তাই বলতে পারলাম না ; না হলে মরণকালে হাত জোড় করে বলতাম—

হেম তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে তুমি সুখী হও—আমাকে বল, তাই করব। আমি ত কোনদিন তোমার অবাধ্য হইনি মা।

সুলোচনা অনেক কষ্টে তাঁহার অবশ হাতখানি হেমের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, সেই জন্যই ত পুড়ে মরছি হেম। আমার যা বলবার তা গুণীকে বলেছি, দরকার হলে সে-ই তোকে বলবে। তুই কিন্তু আজ এই কাপড়খানা তোর ছেড়ে আয়। যে কাপড় পরে এক বছর আগে এই ঘরে এই খাটের উপর এসে বসতিস্, যে-সব গয়না পরে আমাকে প্রথম প্রণাম করতে এসেছিলি, আমার গুণীর দেওয়া সেই কাপড়, সেই গয়না পরে আমার সামনে আয়। এক দণ্ডের জন্যেও আমার নিজের পাপ থেকে আমায় মুক্তি দে।

হেম নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে যেন ঈষৎ হর্ষের আভাস খেলা করিয়া গেল। তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে বলিলেন, মা, চৌত্রিশ বছর বয়সে আমার যে জ্ঞান কোনদিন হয়নি, সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি এক নিমিষে হয়েছিল, যেদিন পশ্চিম থেকে ফিরে এসে তোকে প্রথম দেখি। লোকে বলে মাথায় বাজ পড়া ; কি জানি মা, সে কি-রকম, কিন্তু সেদিন আমার যে ব্যথা বেজেছিল, তার অর্দ্ধেক ব্যথাও যদি বজ্রাঘাতে বাজে ত সে ব্যথা আমার পরম শত্রুর জন্যেও কামনা করিনে। আমায় দিব্যি রইল হেম, এ বেশ আর খুলে ফেলিস্‌নে। কি জানি, কোন পাষাণ বিধবার সাজ তৈরী করে গিয়েছিল, আজ আমি অভিসম্পাত করি, তাকে যেন আমার মত আঘাত বুক পেতে সইতে হয়। না না হেম, বাধা দিসনে মা, কাল আমি আর বলতে আসব না। আজ তোকে বলি, যেন তোর বাপের কাছে থেকে তোকে দেখে সুখী হতে পারি।

তাঁহার আবার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। হেম আঁচল দিয়া ধীরে ধীরে চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। বাহিরে জুতার শব্দ শুনিয়া হেম মাথার উপরে কাপড় তুলিয়া দিতেই গুণী সাহেব ডাক্তার লইয়া ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলোচনা দেখিতে পাইয়া অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, আবার ডাক্তার কেন গুণী ? ঐখান থেকে ভিজিট দিয়ে ওকে বিদায় করে দিয়ে তুই আমার কাছে এসে একবার বোস।

গুণী বলিল, মা, অন্ততঃ একবার তোমার হাতটা—

না গুণী, না। আর আমাকে দগ্ধ করিসনে, যেতে দে ওকে ।

সাহেব ডাক্তার অত বুঝিল না। সে ঘরে ঢুকিয়া নিকটে চৌকি টানিয়া থার্ম্মোমিটার বাহির করিতে লাগিল। সুলোচনা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ওর বুদ্ধি দেখ! ও ঐটে দিয়ে আজ আমার জ্বর দেখবে! হাঁ গুণী, নন্দাকে পাঠিয়ে দে, ভাল কবিরাজ ডেকে আনুক, কখন শেষ হবে আমাকে শুনিয়ে যাক্। বলে দে ওষুধ-পত্র না আনে।

সুলোচনা গ্যাসের আলো সহ্য করিতে পারিতেন না; তাই এ-ঘরে বরাবর মোম-বাতি জ্বলিত। সন্ধ্যা হইলে দাসী সেজ জ্বালিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া গেল। সুলোচনা বলিলেন, আজকের রাত্রিই বোধ করি শেষরাত্রি। তাই আজ যদি না সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলতে পারি, আজ যদি না লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে মুখের সঙ্গে বুকের সঙ্গে এক করে দেখতে পারি, তবে ভগবান যেন আমাকে আরও শাস্তি দেন। কিন্তু তিনি নির্দ্দোষীকে যেন আর দুঃখ না দেন। আমার পাপের ফল যেন আমার ওপর দিয়েই শেষ হয়।

তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া 'উঃ' করিয়া উঠিলেন, হেম ব্যস্ত হইয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, কি মা?

সুলোচনা আস্তে আস্তে বলিলেন, কিছুই নয় মা। শুধু তুই কি একা হেম, আমার গুণীর যে মুখ আমি চোখে দেখেছি—পাষাণেরও বোধ করি তাতে দয়া হ'ত কিন্তু আমার হয়নি, অথচ সে আমাদের কি না করেছে। থাক্, ও সব-কথা আর তুলব না। কোনদিন তার অবাধ্য হ'স্‌নে মা, ও-সব মানুষের বুকের ব্যথা স্বয়ং ভগবানের বুকে গিয়ে বাজে। তার যা ধর্ম্ম, তোর ধর্ম্মও তাই। এ আমার আদেশ নয় হেম, এ তাঁর আদেশ, যাঁর আদেশে তোরা একদিনের দেখাতেই চিরকালের মত এক হয়ে গিয়েছিলি। ছিঃ মা, লজ্জা কি! যিনি অন্তর্যামী, যিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে বসে কথা কন, তাঁকে অস্বীকার ক'রো না—তাকে অমান্য ক'রো না। তাঁর হুকুম আমার ভিতরেও কথা কয়েছিল, কিন্তু দর্প করে তা শুনিনি, অগ্রাহ্য করে অপমান করেছিলাম, তাই তার ফল পাচ্ছি। কিন্তু তোদের ওপরে আমার এই শেষ অনুরোধ রইল মা, আমার পাপকে চিরকাল স্বীকার করে আমার দুষ্কৃতিকে যেন অক্ষয় করে রাখিস্‌নে।

মানদা আসিয়া বলিল, মা, কবিরাজ এসেচেন।

সুলোচনা আস্তে আস্তে বলিলেন, তাঁকে আসতে বল। হেম, তুই একবার বাইরে যা মা।

৫

মায়ের মৃত্যুর পর হইতেই হেমের আচার-ব্যবহারের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কাছে থাকিয়াও যেন প্রতিদিন নিজেকে কোন্ সুদূর অন্তরালের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া যাইতে লাগিল। গুণেন্দ্র চিরদিন সহিষ্ণু ও নিস্তব্ধ প্রকৃতির। এ পরিবর্ত্তন সে প্রথমেই টের পাইল, কিন্তু নিঃশব্দে সহ্য করিয়া রহিল। অকস্মাৎ ধর্ম্মের মধ্যে হেম কি রস পাইল, সে-ই জানে, সে নাটক, নভেল, কবিতার বই তুলিয়া রাখিয়া, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও উপনিষদের বাঙলা অনুবাদের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিল। মায়ের শপথ মনে করিয়া সে থান-কাপড় পরিল না বটে এবং কানের দুটি হীরার দুল, চুড়ি, এবং হারও খুলিয়া রাখিল না সত্য, কিন্তু বৈধব্যের সমস্ত কঠোরতা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া চলিতে লাগিল। সমস্ত রকমের বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া সে একবেলা রাঁধিয়া খাইত। এইটুকু সময় এবং গৃহিণীর প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমাধা করিতে যেটুকু সময় লাগে, সেইটুকু ছাড়া সমস্ত সময়টা সে ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতে লাগিল। যদি বা সে গুণীর কাছে আসিয়া বসিত, কিন্তু পরক্ষণেই কোন একটা কাজের নাম করিয়া চলিয়া যাইত। সে যে তাহার সঙ্গকে ভয় করিতে শুরু করিয়াছে, এই আকস্মিক ত্রস্ত পলায়নের দ্বারা তাহা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত যে, বহুক্ষণের নিমিত্ত গুণী শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাহিরে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। যত দিন কাটিতে লাগিল, তাহার আচার-বিচারের ছোটখাট কাজগুলা পর্য্যন্ত সুদৃঢ় আকার ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। যেমন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ জেলের মধ্যে বেষ্টনের পরে বেষ্টন তুলিয়া তাহার বড় কয়েদীগুলির পরিসর ছোট করিয়া আনিতে থাকে, হেম যেন ঠিক তেমনি সতর্ক হইয়া তাহার হৃদয়বাসী কোন এক গভীর দুষ্কৃতকারীর চলাফেরার পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে লাগিল।

একদিন সে হঠাৎ আসিয়া বলিল, গুণীদা, মন্তর নেব।

গুণী মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি মন্ত্র, গুরুমন্ত্র?

হাঁ।

গুণী হাসিয়া বলিল, ভয় নেই ভাই, তোমাকে আত্মরক্ষার জন্য নিত্য নূতন কবচ আঁটতে হবে না।

হেম বোধ করি কথাটা বুঝিতে পারিল না, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, গুরুমন্ত্রের দরকার নেই?

গুণী বলিল, আছে, কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার হয়নি। তা ছাড়া, কে তোমাদের গুরু, সে ত আমি জানিনে।

হেম বলিল, সে গুরুতে আমার কাজ নেই, আমি তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নেব।

গুণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমার কাছে থেকে দীক্ষা নেবে? আমি দীক্ষার কি জানি হেম? তা ছাড়া, তোমরা হিন্দু, আমি ব্রাহ্ম।

হেম বলিল, আমি সে জানিনে। মা বলেছিলেন, তোমার যা ধর্ম্ম আমারও তাই ধর্ম্ম। আচ্ছা গুণীদা, এ-কথার অর্থ কি?

এ-কথার কি অর্থ গুণী তাহা জানিত। তাহা না বলিয়া সহজভাবে সে বলিল, বোধ করি তিনি বলছিলেন, সব ধর্ম্মই এক।

হেম বলিল, কিন্তু সব ধর্ম্ম ত এক নয়।

গুণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, এ-সব আলোচনা আমি কখনো পরের সঙ্গে করিনে।

হেম বলিল, কিন্তু আমি ত তোমার পর নই।

গুণী প্রত্যুত্তরে বলিয়া উঠিল, না, তুমি আমার পরমাত্মীয়, কিন্তু তোমার সঙ্গেও আমি এ-সমস্ত চর্চ্চা করব না।

হেম হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি বলবে না তবে আর আমি কি করে শুনব?

গুণী তাহার মুখ দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়া বলিল, তুমি কি শুনতে চাও?

হেম বলিল, গুণীদা, যেদিন আমি জোর করে তোমার পাতে বসে খেয়েছিলাম, তুমি সেদিন নিষেধ করে বলেছিলে, কাজটা ভাল করনি, যার যা জাত তাই মেনে চলা উচিত, আজ বলছ সব ধর্ম্মই এক—কোন্‌টা সত্যি?

গুণী কহিল, সেদিন আমি সাধারণভাবেই বলেছিলাম। তবুও দুটো কথাই সত্য। জাত আর ধর্ম্ম এক জিনিস নয়। একটা দেশাচার, লোকাচার, শুধুমাত্র ইহকালের বস্তু। কিন্তু অপরটা ইহকাল, পরকাল দুই কালেরই বস্তু। কিন্তু তাই বলে ধর্ম্ম মেনে চললেই যে জাত মেনে চলা হয়, তাও না; আবার জাত মেনে চললেই যে ধর্ম্ম মানা হয়, তাও নয়। জাত না মেনে চলার দুঃখ আছে, সবাই সে দুঃখ সইতে পারে না, পারার প্রয়োজনও সব সময়ে হয় না—তাই তোমাকে আমি সেদিন ও-কথা বলেছিলাম। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, হেম, এ দুটো আলাদা, অথচ মিশে আছে। মিশে আছে বলেই দেশভেদের সঙ্গে ধর্ম্মেরও নানা ভেদ হয়ে গেছে। ধর্ম্মের যেটা গোড়ার কথা সেটা পরকালের কথা, মরণই শেষ নয় এই কথা। এই বনিয়াদের ওপর তুমি হিন্দু, তুমিও দাঁড়িয়ে আছ, আমি ব্রাহ্ম, আমিও দাঁড়িয়ে আছি। ঈশ্বরকেও সকল ধর্ম্মে হয়ত মানে না, কিন্তু মরণ হলেই যে নিষ্কৃতি পাবার জো নেই, এ কথাটা নিগ্রোদের দেশ থেকে ল্যাপল্যাণ্ডের দেশ পর্য্যন্ত সকল দেশের ধর্ম্মই স্বীকার করে। মৃত্যুর পরের ভাবনা তাই তুমিও ভাব, আমিও

ভাবি। হতে পারে, আলাদা রকম করে ভাবি, কিন্তু ভাবনার আসল বস্তুটা যে এক, এই কথাই মা হয়ত মরণকালে তোমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন।

হেম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, শুধু ভাবলেই ত হয় না, তার উপায় করাও চাই।

গুণী বলিল, চাই বই কি ভাই! এই উপায় বার করা নিয়েই এত দ্বন্দ্ব, এত গণ্ডগোল। তোমার উপায়টা আমি পছন্দ করিনে, আমারটা তুমি পছন্দ কর না। এটা অনুমানের জিনিস, প্রমাণের জিনিস নয় বলেই তর্ক শেষ হয় না, ঝগড়াও থামে না, কিন্তু তোমার রাঁধবার সময় হ'ল যে হেম?

হেম নিঃশব্দে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। গুণী শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যের দিকেই চাহিয়া রহিল।

গুণীদা?

গুণী চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি হেম?

হেম বলিল, আচ্ছা, আমি যে-পথে চলছি, সে কি ঠিক পথ!

কি করে বলব ভাই? সে-কথা তুমি জান। যদি আনন্দ পাও, শান্তি পাও, নিশ্চয়ই তা হ'ল ঠিক পথ।

কিন্তু আমি ত কিছুই পাইনে!

তাহার ব্যথিত কণ্ঠস্বরে গুণীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। সে বহুক্লেশে তাহা রোধ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কর কেন?

হেম বলিল, কি জানি গুণীদা, কিসে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যায়, যেন জোর করে করায়, আমি থামতে পারিনে।

গুণী কি বলিবে, হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না, তার পর বলিল, হয়ত নূতন বলেই প্রথমে সুখ পাচ্ছ না, শেষে নিশ্চয় পাবে।

হেম উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাব?

নিশ্চয় পাবে। ধর্ম্মে যদি সুখ-শান্তি না পাও, তবে আর কিসে? আমি আশীর্ব্বাদ করি, একদিন নিশ্চয় তুমি সুখী হবে।

দুইদিন পরে জ্যোৎস্নার আলোয় খোলা ছাদের উপর পাটি পাতিয়া গুণী চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। হেম আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল—তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেব গুণীদা?

দাও,-বলিয়া গুণী চোখ বুজিয়া রহিল। চন্দ্রালোকে দীপ্ত হেমের মুখের দিকে

চাহিতে সাহস করিল না। হেম নিঃশব্দে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ বলিল, গুণীদা, বিধবার বিয়ে হওয়া ভাল ?

গুণী চোখ বুজিয়াই বলিল, তুমি কি বল ?

হেম বলিল, আমি বলতে আসিনি, শুনতে এসেচি।

গুণী বলিল, পায়ে হাত বুলোনটা বুঝি তার ভূমিকা ?

হেম সহজভাবে বলিল, না, তা নয়। তোমার পায়ের কাছে বসলে আমার হাত দেবার লোভ হয়।

গুণী চুপ করিয়া রহিল। নিজের জিভকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

হেম বলিল, কৈ বললে না ?

গুণী তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

হেম পায়ের তলায় একটি ক্ষুদ্র চিমটি কাটিয়া বলিল, বল শীগ্‌গির।

গুণী বলিল, বলব, কিন্তু আগে আমার কথার জবাব দাও।

কি ?

তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাসতে কি ?

একটুও না। সে-কথা আমার কোনদিন মনেও হয়নি। সেখানকার একটি পয়সার জিনিস সঙ্গে আনিনি, তাদের দেওয়া একখানি কাপড় পর্য্যন্ত পরে আসিনি। পেটে যা খেয়েছি, তার চতুর্গুণ দিয়ে এসেছি—এমনি তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

গুণী বলিল, কিন্তু যারা সতী-লক্ষ্মী তারা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে। বিধবা হলে কিন্তু তার মুখ মনে করে আর বিয়ে করে না। তোমার মার মত তারা মরণ-কালে 'স্বামীর কাছে যাচ্ছি' মনে করে।

হেম বলিল, আমাকে তোমরা জোর করে ধরে-বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে। আমি সতী-লক্ষ্মী, তাই মরণ-কালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এই কথাই মনে করব। আচ্ছা গুণীদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব ?

তাহার কথার মধ্যে জড়তা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জার লেশমাত্র নাই, এ যেন কাহার কথা কে বলিয়া যাইতেছে। তখনকার হেমের সহিত আজিকার হেমের যেন সংস্রব নাই। গুণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হেম বলিল, বল, তোমার কাছে যেতে পারব কি না ?

গুণী বলিল, না।

না—কেন ?

গুণী কহিল, আমার কর্ম্মের ফল আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে আমি জানি না, তোমার কর্ম্মের ফল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে তুমিও জান না। আমার কর্ম্মদোষে হয়ত পশু হয়ে জন্মাব, তুমি হয়ত আবার বামুনের মেয়ে হয়ে জন্মাবে,

তখন আমাকে কি করে পাবে ভাই? কর্ম্মফল যদি সত্য হয়, স্বামী-স্ত্রীর চিরসম্বন্ধ কোনমতেই সত্য হতে পারে না। আমাদের এই কাল্পনিক সম্বন্ধ ত অতি তুচ্ছ। কত ভেদ, কত পার্থক্য, কত উঁচু-নীচু চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হয়ত কর্ম্মের ফল। একে কোন ভালবাসার টানই নিবারণ করে দিতে পারে না। এ সংসারে কত পাষণ্ড স্বামীর সতী-সাধ্বী স্ত্রী থাকে, স্বামীটা হয়ত মরে গরু হয়ে জন্মায়—এ তোমাদেরই শাস্ত্রের কথা—তুমি কি কামনা কর হেম, সতী-সাধ্বী স্ত্রী, তার সারা-জীবনের সুকর্ম্মের অন্তে এই গরুর সঙ্গে গোয়ালে গিয়ে বাস করে? সে হয় না। তা হলে ভাল কাজ মন্দ কাজের অর্থ থাকে না। স্ত্রী নিজের কর্ম্মে স্বর্গে যায়, স্বামী হয়ত জন্ম জন্ম নরক ভোগ করে—হাজার কামনা করলেও আর এক হবার উপায় থাকে?

হেম বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কি সত্যই আর মেলবার পথ থাকে না?

গুণী বলিল, না। তার আবশ্যকও থাকে না। তার চেয়ে হেম, যে মেলা সব-চেয়ে বড় মেলা, যার কাছে যেতে পারলে আর কারো কাছে যেতে হবে না, অথচ সমস্ত রকমের মিলনের ইচ্ছাই আপনা আপনি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তুমি সেই মিলনের কামনা কর। তোমার পথ থেকে তোমাকে কেউ যেন টেনে নিয়ে না যায়; আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, আমাদের দেওয়া সমস্ত দুঃখ একদিন যেন তোমার সার্থক হয়।

চাঁদের আলোয় হেম দেখিতে পাইল, গুণীর চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সে পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। সে উঠিয়া গেল, এমন অনেকদিনই এমনি করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ কেমন করিয়া গুণীর সমস্ত সংযম, সমস্ত ধৈর্য্যের বাধ সে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার ধিক্কারের সহিত কেবল মনে হইতে লাগিল, যেন চিরদিনের সুযোগ অকস্মাৎ চোখের সামনে দিয়া বহিয়া গেল, হাত বাড়াইয়া ধরা হইল না। হেম তাহাকে কত ভালবাসে, এ-কথা সে নিঃসংশয়ে জানিত। আজ তাহার মুখ হইতে স্পষ্ট করিয়া শুনিয়াও, সে কোনমতেই নিজের কথাটা বলিতে পারিল না। সুলোচনার মৃত্যু হইতে বলি বলি করিয়াছে, বলিতে পারে নাই। কেবলি মনে হইয়াছে, এ যেন কোন বিষধর সর্প ঘুমাইয়া আছে, হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিলেই বুঝি ফণা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে। তাই বরাবর সেই ভয় তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে, আজিকার এমন বারেও সেই ভয় তাহাকে হাত বাড়াইতে দিল না।

প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া হেম প্রণাম করিতে আসিত, পরদিন আসিবামাত্রই গুণী সমস্ত সঙ্কোচ প্রাণপণ অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন করিল, হেম কাল তুমি বিধবা-বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন?

হেম বলিল, একটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম, তাই।

গুণী বলিল, তুমি কি ওটা ভাল মনে কর?

হেম সংক্ষেপে বলিল, ছিঃ! ও কি আবার একটা বিয়ে?

গুণী প্রশ্ন করিল, কেন নয়? এক হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর সব জাতের মধ্যেই ত বিধবা-বিবাহ আছে।

থাক গে, বলিয়া হেম বাহির হইয়া যাইতেছিল, গুণী ডাকিয়া বলিল, আর একটা কথা আছে হেম।

হেম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি?

তোমার বয়স কত?

ষোল।

এই বয়স থেকে চিরকাল সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে?

হেম মৃদু হাসিয়া বলিল, আর কি করব? যেমন কপাল? যেমন তোমার বুদ্ধি!

গুণী ক্ষণকাল মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আর কি কোন পথ নেই, কোন উপায় নেই?

কিছু না গুণীদা, কিছু না, বলিয়া হেম বাহির হইয়া গেল।

দিন দিন পরিপূর্ণ যৌবন যেমন হেমের সর্ব্বদেহে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মও যেন সে-সমস্ত ছাপাইয়া চলিতে লাগিল। গুণী সমস্তই দেখিতে পাইল, কিন্তু সাহস করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। হেমের মধ্যে এমন একটা বস্তু ছিল, যাহাতে সকলেই তাহাকে মনে মনে ভয় করিয়া চলিত। তাহার মাও তাহাকে ভয় করিতেন, গুণীও ভয় করিত। উহার কয়েকদিন পরে একদিন গুণী আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় হেম আসিয়া আলমারি খুলিয়া চেক বই বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিল, ফেরবার সময় ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচশ টাকা সঙ্গে এনো।

আচ্ছা, বলিয়া গুণী বইখানা পকেটে রাখিয়া দিল।

হেম কহিল, রোসো, সংসার-খরচের টাকা কমে গেছে, আর দু'শ অমনি ঐ-সঙ্গে এনো।

গুণী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ পাঁচশ টাকা তবে কিসের জন্যে?

হেম বলিল, ও টাকা? আমি কাল কাশী যাব যে!

গুণী চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, কাল কাশী যাবে? এ-বিষয়ে কারো মত নেওয়ার আবশ্যক মনে করো না?

হেম অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তোমার হুকুম নিয়ে তবে যাব।

গুণী বলিল, ঠিক করেছ কাল যাবে, আবার কবে হুকুম নেবে শুনি? সঙ্গে কে যাবে?

হেম বলিল, মানদা, নন্দা আর দারোয়ান যাবে। আজ রাত্তিরে তোমাকে বলব মনে করেছিলাম। গুণীদা যাব কাল?

আচ্ছা যেয়ো, বলিয়া গুণী আদালতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর হেম নোট টাকা চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া গুণীর কাছে আসিয়া বলিল, কাল যাওয়া হ'ল না।

কেন?

আজ দুপুরবেলা বামুনঠাকুরের ঘর থেকে টেলিগ্রাফ এসেছিল, তার মায়ের ব্যামো। আমি তিন মাসের মাহিনা দিয়ে তাকে ছুটি দিয়েছি, সে চলে গেছে।

রাঁধবে কে?

যতদিন লোক না পাওয়া যায়, ততদিন আমিই রাঁধব। গুণীদা, তুমি একটি বিয়ে কর।

কেন?

কেন আবার কি? বিয়ে করবে না—সংসার চালাবে কে? তোমাকে দেখবে-শুনবে কে?

তুমি।

হেম হাসিয়া বলিল, আমি বুঝি চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে করে থাকব? আমাকে কাজ করতে হবে না?

আমাকে দেখা-শুনা বুঝি কাজ নয়?

হেম হাসিমুখে বলিল, তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারিনে। না, না, সে হবে না। তোমাদের বেশ বড় মেয়ে পাওয়া যায়। দেখে-শুনে একটি বিয়ে কর, আমি তার হাতে সংসার দিয়ে কাশী যাই।

গুণী বলিল, আচ্ছা, তুমিও একটি বিয়ে কর, আমিও করি।

এইমাত্র হেম হাসিতেছিল, একমুহূর্তে তাহার মুখের হাসি যেন উড়িয়া গেল। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, ছিঃ, ও কি তামাসা গুণীদা? কোনদিন ও-কথা মুখেও এনো না।

গুণী আর কথা কহিতে পারিল না, মুখপানে চাহিয়া রহিল। হেম উঠিয়া গেল।

৬

মাস-দুই কাশী থাকিয়া, গুণীর অসুখের সংবাদ পাইয়া হেম বাড়ি আসিল। সে আসিয়া না পড়িলে অসুখ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। আসিয়া শুশ্রূষা করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল।

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। গুণী শয্যার উপর বসিয়া সার্শির ভিতর দিয়া তাহাই দেখিতেছিল। আর ভাবিতেছিল হেমের কথা। একটা পরিবর্ত্তন তাহার চোখে পড়িয়াছিল। হেম পূর্ব্বে প্রত্যহ নিয়মিত প্রণাম করিয়া যাইত, এবারে সেটা আর দেখা গেল না। মানদাকে দিয়া হেমকে সে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল; মানদা আসিয়া বলিল, দিদিঠাকরুণ জপ করছেন।

ঘণ্টা-দুই পরে হেম ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমাকে ডাকছিলে?

গুণী বলিল, হাঁ, একটু ব'সো।

হেম কহিল, কিন্তু এখনো যে আমার জপ সারা হয়নি।

দু'ঘণ্টাতেও জপ সারা হয়নি?

দু'ঘণ্টাতেই কি হবে? গুরু বলেছেন, অন্ততঃ দু'হাজার জপ করা চাই।

গুরু বলেছেন? গুরু কে?

হেম বলিল, আমি যে এবারে কাশীতে মন্ত্র নিয়েছি। আমার গুরু, কাশীবাসী সন্ন্যাসী। আহা, তাঁকে দেখলে আর সংসারে ফিরতে ইচ্ছা হয় না। আবার কতদিনে তাঁর চরণ-দর্শন পাব তাই ভাবি। মনে করছি, কাল-পরশুর মধ্যেই ফিরব।

গুণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাল-পরশুর মধ্যে কি করে ফিরবে? আমি ত এখনো বেশ সারিনি হেম, আমাকে দেখবে কে?

হেম একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ও কিছু না—ওটুকু দু'দিনেই সেরে যাবে।

গুণী বলিল, অন্ততঃ সে দু'টোদিন ত তোমাকে থাকতে হবে?

আচ্ছা, না হয় থাকব। বলিয়া হেম চলিয়া যাইতেছিল, গুণী ডাকিয়া বলিল, শোন, কাল-পরশুই যেয়ো, কিন্তু আবার কতদিনে ফিরবে?

এখন বোধ হয় শীঘ্র ফিরতে পারব না। আমাকে তুমি মাসে একশ টাকা করে পাঠিয়ো, তাতেই চলে যাবে, তার কমে হবে না।

গুণী বলিল, টাকার কথা ত হচ্ছে না হেম। তোমার একশ টাকার জায়গায় দু'শ টাকা লাগলেও আমি পাঠাব। কিন্তু সত্যই কি তুমি আর ফিরবে না?

কি করতে আর ফিরব?

যদি আমার মৃত্যু-সংবাদ পাও, তা হলে ফিরবে?

হেম ব্যথিত হইয়া বলিল, ও কি কথা গুণীদা?

গুণী বলিল, বলা যায় না ভাই, তাই সময় থাকতে বলে রাখা ভাল। আমার উইলের মধ্যে তোমাকে টাকা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। আর থাকবে এই বাড়িটা। যদি এদেশে এস, এই বাড়িতে এই ঘরে শুয়ো, এই আমার অনুরোধ।

হেম কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া বলিল, আমি বলছি গুণীদা, তোমার কোন ভয় নেই। এখন শরীরটা দুর্ব্বল বলেই ওসব মনে হচ্ছে।

বোধ হয় তাই হবে, বলিয়া গুণী বাহিরের বৃষ্টির দিকে চাহিয়া রহিল। হেম বিষণ্নমুখে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরে দ্বারের বাহির হইতে ঘরের মধ্যে অন্ধকার দেখিয়া হেম রাগিয়া উঠিয়া ডাকিল, নন্দা। বাবুর ঘরে আলো জ্বেলে দিস্‌নি?

গুণী ভিতর হইতে কহিল, আমি মানা করেছিলাম।

নন্দা ছুটিয়া আসিলে হেম তাহাকে একটা সেজ জ্বালিয়া আনিতে বলিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঠাহর করিয়া গুণীর পায়ের কাছে খাটের উপর গিয়া বসিল। নন্দা ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল, হেম গুণীর পায়ের উপর হাত রাখিতেই সে পা সরাইয়া লইল। হেম ব্যথা পাইয়া বলিল, তুমি কি আর আমাকে পায়ে হাত দিতে দেবে না?

গুণী বলিল, কাজ কি ভাই, তোমার গুরুর হয়ত নিষেধ থাকতে পারে।

হেম বুঝিল যে, সে আসিয়া অবধি পায়ের ধূলা লয় নাই, গুণী তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, গুণীদা, আমার উপর রাগ করেছ?

আমি কি কোনদিন তোমার উপর রাগ করেছি হেম?

হেম তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, কোনদিন না—কিন্তু আজ ওসব কথা বলছিলে কেন?

কি কথা ভাই?

উইল করবার কথা, আরো কত কি কথা, আমি বলছি গুণীদা, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভয় করো না।

গুণী একটুখানি হাসিয়া বলিল, ভাল না হওয়ায় আমার কি খুব ভয় বলে তোমার মনে হয়?

হেম কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওসব কথা বলো না। তুমি ভাল না হলে আমি বাঁচব কি করে?

তুমি চলে গেলেই বা আমি বাঁচব কি করে? তাই, যদি ধরে রাখি, যদি যেতে না দি?

হেম ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আমাকে ধরে রেখে লাভ কি?

লাভ! গুণী আর কথা বলিতে পারিল না, নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। বাহিরের বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পট্ পট্ শব্দে সার্শির গায়ে আঘাত করিতে লাগিল। এক একবার দমকা হাওয়া খোলা দরজার ভিতর দিয়া আসিয়া সেজের বাতির আলো নিবাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। নীচে চাকরদের অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। তবুও দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গুণী শিশুকাল হইতে অত্যন্ত অভিমানী, অত্যন্ত সংযমী। তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ সুদৃঢ় করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সুলোচনার আশীর্ব্বচন সেই বাঁধের ভিত্তিমূলে সেইদিন হইতে মূষিকের মত নিরন্তর বিবর খুঁড়িয়া নদীর জল ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বহুদূরব্যাপী ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতেছিল, কবে কখন যে সমস্তটা ধসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা ছিল না। উন্মত্ত বাহ্য প্রকৃতির দিকে চাহিয়া একবার সে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কথাগুলো আলোচনা করিয়া দেখিতে চাহিল, কিন্তু তাহার রুগ্ন দেহ, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কোন কথাই যেন পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে দিল না।

হেম হঠাৎ বলিল, গুণীদা, চুপ করে রইলে যে, কি ভাবছ?

কিছু না, কিছু না, আমার কথা তোমাকে বলবার নয়—তুমি বুঝবে না। কিন্তু যদি কোনদিন তোমার মতি ফেরে, আর তখন যদি বেঁচে থাকি—এসো।

হেম একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, আমি সমস্ত বুঝেচি। হা অদৃষ্ট! যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক! শেষকালে তুমিই আমাকে দুর্গতির পথে টেনে আনতে চাও!

গুণী এতক্ষণ একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়া ছিল, তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল; উঠিয়া বসিয়া বলিল, ছিঃ হেম, বুঝে কথা কও! ও কি বলচ?

হেম তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বুঝেই বলচি। তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যা বলচ, আমি স্পষ্ট করে তোমার মুখের সামনেই তা বলচি। তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও। বিধবার আবার বিয়ে কি গুণীদা? আমি এত শিশু নই যে, ধর্ম্মের ভান করলেই অধর্ম্মের পথে পা বাড়িয়ে দেব। আমি তোমার টাকা চাইনে, কিছু চাইনে, আমার শ্বশুর-বাড়িতে ফিরে গিয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়ে খাই, সেও ভাল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যে আমার কাজ নেই। এ কুমতি আমার যেন না হয়। সেদিন বুদ্ধি তোমার ছিল কোথায়? সেদিন এমনি করে বলতে পারনি?

গুণী স্থির হইয়া বসিয়া বলিল, হেম, দোষ হয়েছে, আমাকে মাপ কর। আমি পীড়িত—সে-কথাটা একবার ভাব।

ভেবেছি। মাপ তোমাকে আজ না হয় দু'দিন পরে করবই, কিন্তু তোমার

সংস্রব রাখব না। কাল আমি সেইখানেই ফিরে যাব যেখান থেকে দর্প করে চলে এসেছিলাম। যেমন করে পারি, সেখানেই পড়ে থাকব। মনে করব, সেই আমার কাশী, সেই আমার বৈকুণ্ঠ। তুমিও আমাকে মাপ কর গুণীদা, আমি চললাম।

হেম চলিয়া গেল, গুণী উঁচু হইয়া রহিল—বজ্রাহত তালবৃক্ষ যেমন করিয়া থাকে, তেমনি করিয়া। সমস্ত অভ্যন্তরে দগ্ধ রন্ধ্র লইয়া কবন্ধের মত যে খাড়া হইয়া থাকে, সেইভাবে। তাহার শুইয়া পড়িবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন আর নাই।

৭

আবার দুর্গাপূজা ফিরিয়া আসিয়াছে। অতি প্রত্যূষে জানালা খুলিয়া দিয়া হেম পূর্ব্বদিকের অরুণ রক্তচ্ছটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এ-পাড়ার কোথাকার রসুনচৌকির সানাইয়ের বিভাস শরতের সমস্ত করুণার সহিত মিলিয়া তাহার সর্ব্বদেহে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল। অজ্ঞাতসারে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কতদিন হইয়া গিয়াছে, সে গুণীর কোন সংবাদ পায় নাই—সে মনে মনে ভাবিল, কে জানে, গুণীদা আমার কোথায়, কেমন আছে। চলিয়া আসিবার সময় গুণী কাঁদিয়া বলিয়াছিল, হেম, আর দুটো দিন থাক—রাগ করে যেয়ো না। অভিমানীর চোখের জলের হেম সেদিন কোন মূল্য দেয় নাই। সেদিন পীড়িত রুগ্ন-দেহ সত্ত্বেও গুণী পথের ধার পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, হেম, তোমার মন কখনই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, যে কারণে হোক বিকৃত হয়ে উঠেছে—তাই অনুরোধ করছি, ফিরে এসে আর একটা দিনও থাক। হেম শোনে নাই, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছিল। গুণী জানালার ধারে আসিয়া শেষ মিনতি জানাইয়া বলিয়াছিল, হেম, হয়ত এই কাজটা তোমার চিরকাল শেলের মত বিঁধে থাকবে—আমার জন্য বলছিনে ভাই, তোমার নিজের জন্যই বলছি, আজকের মত গাড়ি থেকে নেমে এস। তাহার উত্তরে হেম কোচম্যানকে গাড়ি হাঁকাইয়া দিতে বলিয়াছিল।—হেম ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথার সমস্ত চুল ভিজাইয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। এ-দুঃখের একটা কারণও ঘটিয়াছিল। তীর্থে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া সে কাল দাসীকে দিয়া বাটীর সরকারের নিকট পঞ্চাশটি টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। সরকার ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিল, ছোটবাবুর হুকুম ব্যতীত দিতে পারিবে না। হেম দেবরের সহিত কথা কহিত না, আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, আমি চেয়ে পাঠালে কি পঞ্চাশটা টাকা সরকার দিতে পারে না?

দেবর উত্তর করিয়াছিল, না, আপনি শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী—টাকা পেতে পারেন না।

হেম বলিয়াছিল, কি পেতে পারি সে আমি জানি ঠাকুরপো। তোমার সঙ্গে টাকার জন্যে বিবাদ করতে, মামলা-মকদ্দমা করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আমাকে অত নিরুপায় তুমি মনে ক'রো না। এনে দিতে ইচ্ছে হয়, দাও, না হলে বলছি তোমাকে, টাকার যদি কোন জোর থাকে, শক্রতা করে আমি তোমার বাড়ির এক একটা ইট তুলে নিয়ে ঐ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসব।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই টাকা আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু হেম গ্রহণ করিল না, রাগ করিয়া উঠানের মাঝখানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরে দোর দিয়া শুইল; সমস্তদিন খাইল না, উঠিল না, মনে মনে কাহাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া স্নান সারিয়া আসিয়া হেম আহ্নিক করিতে বসিতেছিল, দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বৌমা, তোমার ভাইয়ের বাড়ি থেকে চার-পাঁচ জন তত্ত্ব নিয়ে এসেচে। বলিতে বলিতে মানদা আসিয়া প্রণাম করিল। হেম একবারমাত্র তাহার মুখপানে চাহিয়া সব ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতেই তাহার চোখের জল শুকায় নাই, আজ অকস্মাৎ মানদাকে পাইয়া তাহার প্রায় এক বৎসরের রুদ্ধ-অশ্রু বন্যার মত সব ভাসাইয়া দিল। মানদাকে নিজের ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, গুণীন কি চিঠি লিখে দিয়েচে আমাকে দে।

মানদা কহিল, তিনি ত চিঠি দেন নি!

হেম যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, দেননি?

মানদা বলিল, না দিদিমণি! তিনি কি উঠতে পারেন যে, চিঠি লিখবেন?

হেম পাংশু হইয়া বলিল, কি হয়েছে তঁর?

তুমি কিছু জান না?

না, বল্।

মানদা বলিল, আর কি বলব? বলিয়াই কাঁদিতে লাগিল।

হেম রুক্ষভাবে বলিল, কাঁদিস্ পরে—এখন বল্।

সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বলবার কিছু নেই দিদি। তুমি চলে আসবার পরের দিনই আবার জ্বরে পড়েন, ভাল হন, আবার জ্বরে পড়েন, আবার ভাল হন, আবার জ্বরে পড়েন—ফিরে গিয়ে যে দেখতে পাব, এমন ভরসাও করিনে।

হেম বলিল, তার পরে বল্।

মানদা বলিল, তার পরে কোথায় বর্দ্ধমান না কোথা থেকে খবর পেয়ে, কোথাকার মাসী আসে, তার পর মেসো আসে, তার পরে মাসতুত ভাই, বৌ, বোন, ভগিনী-

পতি, এখন আর কেউ বাকী নেই। বাড়িতে আর জায়গা নেই।

আমি সব বিদেয় করব—তার পর?

খাচ্চে, দাচ্চে বসে আছে। বাবু ওপরে পড়ে আছেন, না ডাক্তার, না বদ্যি, না ওষুধ, না পথ্যি! শুনি হাওয়া বদলালে ভাল হয়, তা নিয়ে যায় কে?

হেম বলিল, তোরা কি করছিস্? নন্দা নিয়ে যায়নি কেন?

মানদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, সে-ই বাবুর অনেকদিনের চাকর, তাকে মেসোবাবুর ছেলে অভয় মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে—ছোঁড়া আবার মদ খায়—এক একদিন বাড়িতে এসে এমন হাঙ্গামা করে যে, ভয়ে কেউ বেরুতে পারে না—তাকে আমাদের বাবু পর্য্যন্ত ভয় করেন।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, মানু, একটা কথা সত্যি বল্ দিদি, আমার গুণীদা কি তাহলে বাঁচবে না?

মানদা বলিল, কেন বাঁচবেন না দিদি, দেখালে শোনালে, চেষ্টা করলে, নিশ্চয় ভাল হবেন—কিন্তু অমন করে ফেলে রাখলে আর ক'দিন?

হেম মিনিট-খানেক চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মানদা, তোমাদের ফিরে যাবার টাকা আছে?

আছে বৈকি দিদি! জানোই ত, বাবু এক টাকার দরকার থাকলে সঙ্গে দশ টাকা দিয়ে পাঠান—আমাদের ভাড়া আমার কাছেই আছে। বলিয়া সে আঁচলে বাঁধা নোট দেখাইল।

হেম জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবি? কাল?

মানদা বলিল, হাঁ দিদি, কালই যেতে হবে—আমি যা একটা লোক আছি, না হলে সবাই নতুন—কেউ টিঁকতে পারে না। যেমন মাসী, তেমনি মেসো, তেমনি ছেলে, তেমনি ঝি-বৌ—বিধাতা-পুরুষ যেন ফরমাস দিয়ে এদের এক ছাঁচে ঢেলেছিলেন। আমার নাকি বড় শক্ত প্রাণ, তাই এখনও টিঁকে আছি—অভয় ছোঁড়া আমাকেই একদিন তেড়ে মারতে এসেছিল—বাবুকে বলে, ও মলেই বাঁচা যায়!

হেমের চোখের মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, বলিল, আজ ষ্টীমার কখন ফিরে যাবে জানিস্?

মানদা বলিল, আর ঘণ্টা-খানেক পরেই ফিরবে, আমি ঘাট থেকে জেনে এসেছি।

তবে এতেই যাব। তুই গাড়ি ডেকে আন্ গে।

তুমি যাবে দিদি? আজ ত সুদিন নয়!

বেশ দিন। দেরি করিসনে—গাড়ি ডেকে আন।

সেইদিন অপরাহ্ণবেলায় ছেলেকে খাবার দিয়া মা কাছে বসিয়া আর দুইখানা লুচি খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাহার পাশ দিয়াই তেতলায় উঠিবার সিঁড়ি। অপরিচিতা হেমকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মাসী প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে গো বাছা?

আমি বিদেশী, বলিয়া হেম উপরে উঠিয়া গেল। অভয় তাহার রূপের দিকে নেকড়ে বাঘের মত চাহিয়া রহিল।

হেম গুণীর ঘরে গিয়া দেখিল, সে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া আছে। জাগিয়া আছে কি ঘুমাইতেছে, বোঝা গেল না। শিয়রের কাছে চাবির গোছাটা পড়িয়াছিল, হেম সেটাকে সর্ব্বাগ্রে আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিল। একটা টেবিলের উপর গোটা-দুই খালি ঔষধের শিশি ছিল, তুলিয়া লইয়া দেখিল, লেবেলের গায়ে পনেরদিন পূর্ব্বের তারিখ দেওয়া আছে। সমস্ত ব্যাপারটা সে স্পষ্ট বুঝিল। তার পর লোহার সিন্দুক খুলিয়া চেক বই বাহির করিয়া যখন ব্যবহৃত অংশগুলি পরীক্ষা করিয়া গুণীর দস্তখত মিলাইয়া দেখিতেছিল, এমন সময় মাসী ঘরে ঢুকিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। চেঁচাইয়া বলিলেন, কে গা তুমি সিন্দুক খুলেছ?

হেম কহিল, চেঁচাও কেন, উনি উঠে পড়বেন যে!

মাসী আরও চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, চেঁচাই কেন?

গুণী জাগিয়াছিল, পাশ ফিরিল। হেম বলিল, আমি খুলব না ত কে খুলবে? তুমি?

গুণী চাহিয়া দেখিতেছিল, দুইজনের কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই; মাসী ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। গুণী আস্তে আস্তে কহিল, হেম, কখন এলে ভাই?

এই আসছি। ওঁকে বুঝিয়ে দাও—তোমার জিনিস খুললে বাইরের লোকের ঘরে ঢুকে চেঁচামেচি করতে নেই। এই সমস্তই আমার, এই কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে ওঁকে যেতে বল।

গুণী সমস্ত বুঝিল! তার পর হাসিয়া বলিল, সে সম্পর্কে এতদিন পরে বুঝি সিন্দুক খুলতে এসেছ?

হেম চেকের পাতা গুনিতে গুনিতে বলিল, হুঁ।

মাসী বলিলেন, ও কে গুণী?

আমার বোন। উত্তর শুনিয়া হেম শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর চোখ তুলিয়া একটিবার মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

মাসী বলিলেন, কৈ এতদিন ত এ-সব কথা শুনিনি? কি-রকম বোন হয়?

গুণী সে-কথার উত্তর এড়াইয়া সংক্ষেপে কহিল, ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল—ওরই সর্ব্বস্ব মাসী।

মাসী বিশ্বাস করিলেন না, বুঝিতেও পারিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, গুণী হেমের দিকে ভাল করিয়া না চাহিয়াই বলিল, মরণকালে হঠাৎ এ খেয়াল কেন? কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুখ দেখিয়া ভিত হইয়া উঠিল। হেমের মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে—সে যেন অকস্মাৎ কোন ক্রুদ্ধ তপস্বীর অভিসম্পাতে একনিমেষে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। গুণী সভয়ে ডাকিল, হেম!

হেম সাড়া দিল না, নড়িলও না—নির্নিমেষ-নেত্রে মেঝের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গুণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ডাকিল হেম, কথা শোন।

হেম তদুত্তরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিল। গুণী শয্যার উপর কোনমতে উঠিয়া বসিল, তাহার পর খাট হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে অতি ক্লেশে হেমের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বিনা অপরাধে আমাকে সবাই শাস্তি দেয় তুমিও দেবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি!

গুণী নির্বাক্ হইয়া রহিল। শ্রাবণের আকাশভরা মেঘের মত বিপর্য্যস্ত কালোচুলে তাহার দুই পা ঢাকিয়া গিয়াছে—তাহার প্রতি চাহিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া হেমের মাথার উপর ডান হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, তোমাকে শাস্তি দেব কি হেম, আমাকে ভালবেসে ছিলে বলে আমি তোমাকেও শাস্তি দিইনি। শাস্তি নয় বোন, চার বৎসরের কত দুঃখের পর মরণের আগে যে শান্তি পেয়েছি, শেষ দিনে আমি সে দুর্লভ বস্তুটি তোমাকে দিয়ে যাব—চল আমরা কাশী যাই।

হেম মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, চল, কিন্তু এই তোমার শেষ আদেশ। এ কি আমি সহ্য করতে পারব?

গুণী বলিল, পারবে। যখন বুঝবে সংসারের ভালবাসাকে মহামহিমান্বিত করবার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটীরে অবজ্ঞায় যায়নি—তখনই সহ্য করতে পারবে। যখন জানবে, অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন, নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবে সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর, তখন সইতে পারবে হেম। উঠে ব'স—চল, আজই আমরা কাশী যাই। যে ক'টা দিন আরো আছি, সে ক'টা দিনের শেষ সেবা তোমার, ভগবানের আশীর্ব্বাদে অক্ষয় হয়ে তোমাকে সারা-জীবন সুপথে শান্তিতে রাখবে।

আঁধারে আলো

আঁধারে আলো

১

সে অনেকদিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে ; বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—বাবা কথা শোন, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনমতেই পারব না। তা হলে পাস হতে পারব না।

কেন পারবিনে। বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায়, পাস হতে তোর কি বাধা হবে আমি ত ভেবে পাইনে সতু।

না মা, সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাসনে দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েছি বাবা, আমার মান রাখবিনে ?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা করে কথা দিলে কেন ?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন ; বলিলেন, সে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু তোকে ত মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া, বিধবার মেয়ে, বড় দুঃখী—কথা শোন্ সত্য, রাজি হ।

আচ্ছা, পরে বলব, বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত-আট বৎসর হইল স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারী শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাস করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্র-পুত্রবধূর হাতে জমিদারী এবং সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া, তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর এ-বাটীতে এতদিন পর্য্যন্ত কোন কাজ-কর্ম্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই

মেয়েটিকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুনবতী তাহাও তিনি দুই-চারিটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, আগে ত মেয়ে দেখাই, তারপর কেমন না পছন্দ হয় দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গার ঠিক সুমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-ঠাকরুণটি কে হীরামুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে ব'স্।

সত্যর চমক ভাঙিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছিসনে—ঐ এক ফোঁটা মেয়ের সামনে তোর লজ্জা কি!

আমি কারুকে লজ্জা করিনে, বলিয়া সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিছুতেই বসতে পারব না—আমার ভারী মাথা ধরেছে। বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক চেঁচামেচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আর এ-সব তাহার ভালই লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে?

শুতে নয়, পড়তে যাচ্ছি। এম. এ'র পড়া সোজা নয় ত। সময় নষ্ট করলে চলবে কেন? বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা; চেয়ারে হেলান দিয়া, উপরে দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙিয়া গেল। সে কান খাড়া করিয়া শুনিল—ঝুম্। আর এক মুহূর্ত্তে—ঝুম্

ঝুম্। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনা-পরা-লক্ষ্মী-ঠাকরুণটির মত মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞেসা করলেন।

সত্য মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তোমার নাম কি?

আমার নাম রাধারাণী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

একফোঁটা রাধারাণীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম. এ. পাশ করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি না হওয়া পর্য্যন্ত ত কোন মতেই না, খুব সম্ভব পরেও না। সে বিবাহই করিবে না। কারণ, সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন একরকম করিয়া ওঠে, কোথাও কোন নারীমূর্ত্তি দেখিলেই আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া দিয়া, একাকী বিরাজ করে; সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মী প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন, অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে, পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোনমতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠে; সে তৎক্ষণাৎ যে-কোন একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোরবাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূরে নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত, তাহারই উদ্দেশে আসিতে গিয়া একস্থানে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া

আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশি নয়। পরণে সাদাসিধা কালাপেড়ে শাড়ি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কার-বর্জ্জিত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা একমনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যের কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদ-মুখের খাতির ত্যাগ করিয়া হাতের ছাঁচ ফেরিয়া দিয়া 'বড়বাবু'র শুষ্ক বস্ত্রের জন্ম হাত বাড়াইল।

দু'জনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটা হইল না কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া যখন সে বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্ম উপরে উঠিল, তখন সেই রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয় আলনা হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গা যাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল, তখন পূর্ব্বদিনের মত আজ তিনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আজও চারি চক্ষু মিলল, আজিও তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; সে কোনমতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

রমণী প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু—পূর্ব্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবীতটে উপর্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু মুখের কথা হয় নাই; বোধ করি তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোন, তিনি যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন, এবং সে বিদ্যায় পারদর্শী, সত্যর অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া যে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনে ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিতলের কলস, দক্ষিণ

হস্তে সিক্ত বস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন; সত্য এদিকে-ওদিকে চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তিনি উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন ত বড়ো ভাল হয়।

অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যের মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া রমণী আবার কথা কহিলেন, ঝির অসুখ, সে আসতে পারলে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাকতে পারিনে, আপনারও দেখচি এ বদ্ অভ্যাস আছে।

সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন?

চোরবাগানে আমার বাসা।

আমাদের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।

তাই হবে।

বহুক্ষণ আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাছেই আমাদের বাড়ি—এবার যেতে পারব—নমস্কার।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড় গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে-কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনিই বুঝিবেন, সে দিন কি হইয়াছিল। সবাই বুঝিবেন না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন, চুম্বন-শলাকার মত শুধু এই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল; সে নিশ্চিত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক

ধমক দিয়া কহিল, হারামজাদা, এত বেলা হয়েচে তুলে দিতে পারিস্‌নি? যা, তোর এক টাকা জরিমানা।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই রুষ্ট-মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ি-ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম করিয়া, রাস্তার দুইদিকেই প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল। কিন্তু গঙ্গায় আসিয়া, ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইল।

গাড়ি হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত বলিলেন, এত দেরি যে। আমি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শীগ্‌গির নেয়ে নিন, আজও আমার ঝি আসেনি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল। সাঁতার কাটা তাহার কোথায় গেল! সে কোনমতে গোটা দুই-তিন ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমার গাড়ি গেল কোথায়?

রমণী কহিলেন, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করেচি।

আপনি ভাড়া দিলেন!

দিলামই বা! চলুন। বলিয়া আর একবার ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিরীহ যত অনভিজ্ঞই হোক, একবার সন্দেহ হইত—এ-সব কি!

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন; চোরবাগানে?

সত্য কহিল, হাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে?

সত্য আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

আপনি ত চোরের রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নির্ব্বাক মরাল-গমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল্‌ ছলাৎ-ছল্‌ শব্দে—অর্থাৎ, ওরে মুগ্ধ—ওরে অন্ধ যুবক! সাবধান! এ সব ছলনা—সব ফাঁকি, বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ, একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, গাড়ি-ভাড়াটা—

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত আপনারই দেওয়া হয়েচে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি করে?

আমার আর আছে কি যে দেব! যা ছিল সমস্তই তুমি ত চুরি-ডাকাতি করে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎ-রেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্ত্তে সাধ হইল, এই প্রকাণ্ড রাজপথেই ওই দুই রাঙা পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্ষের নিমিষে গভীর লজ্জায় তাহার মাথা এমনি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও-ফুটপাতে তাঁহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? বলি, কিছু আছে টাছে? দু'পয়সা টানতে পারবে ত?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানিনে, কিন্তু হাবা-গোবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি। কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখতে যেন রাজপুত্তুর! যেমন চোখ-মুখ, তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিকে দিব্যি মানায়—দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে, যেন একটি জোড়া গোলাপ ফুটে ছিল।

রমণী মুখ টিপিয়া বলিল, আচ্ছা চল্। পছন্দ হয়ে থাকে ত না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারবে না, তা বলে দিলুম।

৪

জ্ঞানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখলেও বলিবে না, কারণ, অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না এই অপরাধেই শ্রীমন্ত বেচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক, ইহা অতি সত্য কথা, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্ জুয়ানের বাঙলা তর্জ্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা সহরের পথে-ঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা, সে-বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না।

দিন-দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়—না ?

সত্য সরলা প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল ; আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ কি ভয়ানক কষ্ট ! আচ্ছা, সরলাই বা তার স্বামীকে এত ভালবাসলে কি করে, আর তার বড়জা-ই বা পারেনি কেন বলতে পার ?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই ! বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাসতে পারে ? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্য্যন্ত ভালবাসা কি, জানতেও পায় না। জানবার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গান-বাজনা হাজার ভাল হলেও মন দিয়ে শুনতে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগতেই পারে না ! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে করতে ইচ্ছে করে।

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন ?

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, তারা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশী। এই যেমন সরলার ভাশুর, স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হ'ল না।

সত্য চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি শয়তান মেয়েমানুষ ! আমি থাকতুম ত রাক্ষসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্যে কহিল, থাকতে কি করে ? প্রমদা বলে সত্যই ত কেউ ছিল না —কবির কল্পনা।

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন ? আচ্ছা, সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বলচি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকেরা বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয় না যে, সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড় ?

রমণী কহিল, ইংরেজী জানিনে ত, বাংলা বই যা বেরোয় সব পড়ি।.. এক একদিন সারারাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল আমাদের বাড়ি, বত বই আছে সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি ?

হাঁ, আমাদের বাড়ি—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, ছি ছি,—ছি ছি কিছু নেই—চল।

না না, আজ না—আজ থাক্, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে আজ তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

৫

সকালবেলায় স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চারদিন গত হইয়াছে,—সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই—আর তিনি গঙ্গাস্নানে আসেন না।

আকাশ-পাতাল কত কি যে কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই, হয় ত বা মৃত্যু-শয্যায়! কে জানে!

সে গলিটা জানে বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ি, কোথায় বাড়ি, কিছুই জানে না। মনে করিলে, অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই, কেন সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল ?

সে যথার্থ-ই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা-কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল—তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ।

বাবু!

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েচে তাঁর ? বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সামলাইতে পারিল না।

দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ হয় হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়া বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ, আপনাকে দেখতে চাইচেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েচে কি?

দাসী কহিল, না, তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ি, দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান ঝিমাইতেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত? তিনি ত আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল, দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল; পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, মনে হইল সেগুলি চমৎকার সাজান। কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল; দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া, বলিল, ঐ ঘর—চলুন! দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া সু-উচ্চকণ্ঠে বলিল, দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর।

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল, তাহাতে সত্যের সমস্ত মস্তিষ্ক ওলট-পালট হইয়া গেল; তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোনমতে দোর ধরিয়া, সে সেইখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মেঝেয় মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু-তিনজন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়াম, একজন বাঁয়া-তবলা লইয়া বসিয়া আছে,—আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি, এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন; দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা, নানা অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু করিতেছে; ত্বরিতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া, সত্যের একটা হাত ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মিরগি ব্যামো আছে নাকি?

ভাই, ইয়ারকি করিসনে, ওঠ্—ওসবে আমার ভারি ভয় করে।

প্রবল তড়িৎস্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, উহার করস্পর্শে সত্যর আপাদমস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, আমার নাম শ্রীমতী বিজলী—তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু?

সমস্ত লোকগুলো হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর গড়াইয়া শুইয়া পড়িল,—কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজ্‌লী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম্, বাড়াবাড়ি করিস্‌নে—আসুন, উঠে আসুন, বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া শুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরনন্দা।
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হুউ
মলয় পবন বহু মন্দা।
অব সো ন যবহু মরি পরিহোয়ত—
তবহু মানব নিজ দেহা—

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল; কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই, বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু—

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পড়িয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছামিছি সঙ্‌ সাজাচ্চ?

বিজ্‌লী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ, মিছামিছি কিসে? ও সত্যিকারের সঙ বলেই ত এমন আমোদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের তামাসা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস্ বাবু, সত্যি বল্ ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই, মোচলমান খ্রীষ্টানও নই। হিঁদু ঘরের এতবড় ধাড়ী মেয়ে, হয় সধবা, নয় বিধবা—কি মতলবে চুটিয়ে পীরিত করছিলি বল্ ত? বিয়ে করবি বলে, না, ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে?

ভারি একটা হাসি উঠিল। তার পর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল।

সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই বা কে? থাক্ সে।

বিজলী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, বেশ ত আমি! যা ক্যামা শীগ্‌গীর যা—বাবুর খাবার নিয়ে আর স্নান করে এসেচেন—বাঃ, আমি কেবল তামাসাই কচ্চি যে! বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্ব্বের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বহুল তপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থ-ই জুড়াইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজলী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন? জাত যাবে? আমি হাড়ি না মুচি?

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, তা হলে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজলী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবুও ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখচি! বলিয়া আবার হাসিল, কিন্তু তাহা শব্দমাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য, হাবু নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালতে কখন শিখিনি, কিন্তু নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেচি।

বিজলী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোঁয়া খাবে না?

না।

বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের সে স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল; জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বলচি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দু'দিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েচে। কি আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, কাল নয়, দু'দিন পরে নয়, এ-জন্মে নয়, আগামী জন্মে নয়— কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই—আপনার নিশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এমনি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, বিজলীবিবি, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। যেতে দাও—যেতে দাও—সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিল।

বিজলী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থই তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল। সে যে কল্পনাও করে নাই, এমনি মুখচোরা শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজলী মৃদুস্বরে কহিল, আর একটু বসো।

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, উঁহুঁ হুঁ, প্রথম চোটে একটু জোর খেলবে—যেতে দাও—যেতে দাও সুতো ছাড়ো—সুতো ছাড়ো—

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বিজলী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই—নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় অপরাধ হয়েচে—

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনর্ব্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমার পড়ার ঘর। একবার দেখবে না? একটিবার এসো, মাপ চাচ্ছি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজলী পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, আর দেখা হবে?

না।

আর কি কখনো দেখা হবে না?

না।

কান্নায় বিজলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; ঢোঁক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কিন্তু, তাও যদি না হয়, বল এই কথাটা আমায় বিশ্বাস করবে।

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনর-ষোলদিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছে ত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে-মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজলীর বুক ভাঙিয়া গেল। কিন্তু সে করিবে কি? হায় হায়! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জ্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!

সত্য প্রশ্ন করিল, কি বিশ্বাস করব?

বিজলীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্ত্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই! বিজলী মুখ না তুলিয়াও বুঝিল, সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতেই পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাঁজরাগুলো ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে!

সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসার একটা কথা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে! সে যে দাগী আসামী! অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে

যাথিয়া বিচারের সমুখে দাঁড়াইয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দ্দোষ! যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে?

সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে; সে বলিল, চললুম।

বিজ্‌লী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না; কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও, কিন্তু যে-কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে-কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস কর, সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না। একটু থামিয়া কহিল, সব মন্দিরে দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা-নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না। বিজ্‌লী নর্ত্তকী, তথাপি সে যে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা নারীদেহ! ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে এ-ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্দ্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা ঐ মাতালটা পর্য্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল —কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে! মাইরি, ছোড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে দিলে না। দাও দাও, থালাটা এগিয়ে দাও ত হ্যা, বলিয়া নিজেই টানিয়া লইয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটি কথাও বিজ্‌লীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু'পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলো খুলিয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুললে যে?

বিজলী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পারব না বলে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আর না। বাইজী মরেছে—

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্য্যি উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্ম মরে গেল বন্ধু।

৬

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়িতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন। খাওয়ানো-দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গানের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন-চারটি নর্ত্তকী—ইহারাই নাচ-গান করিবে। দ্বিতলের বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারাণী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, এত মন দিয়ে কি দেখচ বল ত?

রাধারাণী স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আসচে—বাইজীদের সাজ-সজ্জা—কিন্তু, হঠাৎ তুমি যে এখানে?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, একলাটি বসে আছ, তাই একটু গল্প করতে এলুম।

ইস্!

সত্যি। আচ্ছা, দেখচত, বল দেখি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ হয়?

ঐটিকে, বলিয়া রাধারাণী আঙুল তুলিয়া যে স্ত্রীলোকটি সকলের পিছনে নিতান্ত সাদাসিধা পোষাকে বসিয়াছিল তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, ও যে নেহাত রোগা।

তা হোক, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু বেচারী গরীব—গায়ে গয়না-টয়না এদের মত নেই!

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা হবে। কিন্তু, এদের মজুরি কত জান?

না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এদের দু'জনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরীব বলচ, তার দু'শ টাকা।

রাধারাণী চমকিয়া উঠিল—দু'শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে?

কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে, চার-পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত,—কিন্তু এখন পারবে কিনা বলা যায় না।

তবে অত টাকা দিয়ে আনলে কেন ?

তার কমে ও আসে না। এতেও আসতে রাজি ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েচে।

রাধারাণী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন ?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয় না, এই ওর ফন্দি ! দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।

কথাটা রাধারাণী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, তোমার গরজ ছাই ! কিন্তু, ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন ?

শুনবে ?

হাঁ বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, ওর নাম বিজ্‌লী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রাণী, ঘরে যাবে ?

যাব, চল, বলিয়া রাধারাণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারাণী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আজ ওকে অপমান করে শোধ নেবে ? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে ?

এদিকে সত্যেন্দ্রর নিজের চোখ শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও বসিয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। কেউ জানবেও না।

রাধারাণী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে এবং উপরে বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠের সলজ্জ চীৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্ত্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজ্‌লী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে—পা এমন করিয়া জুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

'আপনাকে ডাকছেন।' বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া দেখিল পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার-তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা

আপনাকে ডাকচেন।

বিজ্‌লী বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে ডাকচেন?

মা ডাকচেন।

তুমি কে?

আমি বাড়ির চাকর।

বিজ্‌লী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করে এসো।

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজ্‌লী ত? আপনাকেই ডাকচেন,—আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল, বলিয়া বিজ্‌লী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারাণী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত-পদে বিজ্‌লী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে সস্ত্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল; একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিনতে পার?

বিজ্‌লী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাধারাণী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোট বোনকে না হয় নাই চিনলে দিদি, সে দুঃখ করিনে; কিন্তু এটাকে না চিনতে পারলে সত্যিই ঝগড়া করব। বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজ্‌লী তথাপি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আঁধারে আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যবিকশিত গোলাপ-সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাধারাণী নিস্তব্ধ। বিজ্‌লী নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধারাণী কহিল, চিনেচ দিদি?

চিনেচি বোন।

রাধারাণী কহিল, দিদি, সমুদ্র মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোটবোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাকে পেয়েচি।

সত্যেন্দ্রর একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া বিজ্‌লী একদৃষ্টে দেখিতেছিল; মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিষের বিষই যে অমৃত বোন! আমি বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।

রাধারাণী সে-কথায় উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা করবে দিদি ?

বিজ্‌লী একমুহূর্ত্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অস্পৃশ্যটাকে চিনতে পেরে, বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সেদিন দর্প করে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু, সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙে দিলেন। তিনি ভেঙে দিয়ে যে কি গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে-কথা আমার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না বোন। বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, প্রাণের জ্বালায় ভগবানকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সবদিকে মাটি হয়ে যেতুম! তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম!

কান্নায় রাধারাণীর গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজ্‌লী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম, কখনও দেখা হলে তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখব। কিন্তু আর তার দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি—এর বেশী আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না—আমি চললুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারাণী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে দেখা হবে দিদি ?

দেখা আর হবে না বোন! আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইটে বিক্রী করে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন ? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাকতে যায়, তখন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল।

লজ্জায় রাধারাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিজ্‌লী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝেছি! আমাকে অপমান করবেন বলে। না ? তা ছাড়া ত এত চেষ্টা করে আমাকে আনবার কোন কারণ দেখিনে।

রাধারাণীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজ্‌লী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন ? তবে তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পায়ে আমার শত-কোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। অপমান করলে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি!

নমস্কার বোন! বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই—আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। চললুম।

কোরেল

কোরেল

১

লণ্ডন নগরের পঞ্চাশৎ মাইল উত্তরে কোরেল নামে একটি গ্রামে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী-তীরস্থ দুইখানি অট্টালিকা গ্রামের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া রাখিয়াছিল। উভয়ের সৌন্দর্য্যে একটা সাদৃশ্য থাকিলেও একটি অপরটি অপেক্ষা এত বৃহৎ, জমকাল এবং মূল্যবান যে, দেখিলে বোধ হয় যেন কোন রাজা তাঁহার যৌবনের প্রথমাবস্থায় একটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর যতদিন গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সুখসম্পদ পরিব্যাপ্ত আত্মসুখ যেদিন মরণের ছায়াটা সম্মুখে ঈষৎ হেলাইয়া ধরিয়াছিল, সেই দিন হইতে বোধ হয় অপরটির নির্ম্মাণকর্ম্ম আরম্ভ করাইয়াছিলেন। তাহাই যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে যেরূপ প্রভেদ, এই দুইটি অট্টালিকার মধ্যেও সেইরূপ একটা প্রভেদ লক্ষিত হইত। একটি তাঁহার বিলাসভবন, রাজসভা, অপরটি তাঁহার শান্তিনিকেতন কুঞ্জকানন। একটিতে কত মর্ম্মরপ্রস্তর, কারুকার্য্যশোভিত কত ঝরনা, রঞ্জিত পত্রপুষ্প গঠিত কুঞ্জবন,—তাহার পর তোষাখানা, অশ্বশালা, পশ্বালয় গ্রামের মত চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছে; আর ভিতরে কত আসবাব! কত টেবিল, চেয়ার, পিয়ানো প্রভৃতি বহুমূল্য কার্পেটের উপর দাঁড়াইয়া আছে—ভিত্তিসংলগ্ন বৃহৎ মুকুরে সে শোভা সহস্রবার প্রতিফলিত হইয়াছে,—তাহার উপর কতরকমের চিত্র, নানাবিধ ঝাড়-লণ্ঠন দেয়ালগিরির মধ্য দিয়া স্ব স্ব সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপরটিতে অত কিছু নাই। বাইরে শুধু শ্যামল তৃণদল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পতরু, লতাবিতান, একঝাড় পিয়ার বৃক্ষ, একদল আঙুরের কুঞ্জবন, মধ্যে দুই-একটি বসিবার বেঞ্চ; নদীর ধারে দুই ঝাড় বংশবাটিকা তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্র অট্টালিকাখানি নদীতীর হইতে ঈষৎ দেখা যায় মাত্র।

দুইজন প্রাচীন সৈনিক এই দুই ভবনের অধিকারী। একজনের নাম ক্যাপ্টান নোল, অপরের নাম কর্নেল হ্যারিংটন। যুদ্ধকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুই বন্ধু, নির্জ্জনে এই দুটি অট্টালিকা সামর্থ্য অনুসারে ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন। Captain Noll-এর একটি মাত্র কন্যা—নাম মেরি। Colonel Harrington-এরও একটি মাত্র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম লিওপোল্ড—জননী আদর করিয়া লিও বলিয়া ডাকিতেন।

একদিন লিওর জননী পুত্রকে শিয়রে বসাইয়া মেরিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বামীর

কর নিজ করে গ্রহণ করিয়া বসন্তপ্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সহিত হাসিমুখে চিরদিনের মত প্রস্থান করিলেন। লিওর তখন দশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম,—খুব কাঁদিতে লাগিল। মেরির জননী আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, ভয় কি বাবা, আমি চিরদিন তোমার মা হইয়া থাকিব। সপ্তবর্ষীয়া বালিকা মেরি লিওর হাত ধরিয়া বলিল, লিও, কাঁদিও না -চুপ কর। লিও চুপ করিল।

স্ত্রীবিয়োগের পর কর্নেল হ্যারিংটন, জুয়াক্রীড়ায় নিতান্ত মনঃসংযোগ করিলেন। সঞ্চিত অর্থ যত সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, প্রবাসী পুত্রমুখ স্মরণ করিয়া তত অধিক উৎসাহের সহিত নষ্ট ধন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় জুয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত নিঃশেষ হইয়া আসিল, ক্রীড়ার মত্ততায় তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া বন্ধু নোলের নিকট বাটী বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিলেন। তাহাও শেষ হইল—দারুণ নরাশা ও তাঁহার উন্মত্ততা আসিল। একদিন রাত্রে খাইবার সংস্থান পর্য্যন্ত নাই—আর সহ্য হইল না—বন্দুকে গুলি ভরিয়া আত্মহত্যা করিলেন। পুত্র লিও তখন লণ্ডনে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিল—সংবাদ পাইয়া বাটী আসিল। মেরির জননী তখন জীবিত নাই। ক্যাপ্টান নোল মৌখিক সান্ত্বনা মাত্র করিলেন। সপ্তদশ বর্ষীয় লিও অকূলসমুদ্র দেখিয়া যখন ছটফট করিতেছিল, নিরতিশয় মমতায় করুণ অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু দুটি লিওর মুখের পানে রাখিয়া, তাহার হাত ধরিয়া মেরি কহিল, লিও ভয় করিও না—তোমার মেরি এখনও মরে নাই।

এ কথার অর্থ সবাই বুঝে—লিও অন্তরে আশীর্ব্বাদ করিয়া মৃদু কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, তাই হউক—জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন।

কিন্তু সেবার দুইজনেরই বড় দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছিল;—অধিক দিন না যাইতেই ক্যাপ্টান নোল জ্বরবিকারে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতৃ-মাতৃহীন মেরি লিওর বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, লিও, শুধু তুমি রহিলে—বিপদে-সম্পদে আমাকে রক্ষা করিও।

লিও চক্ষু দুটি মুছাইয়া দিয়া বলিল, করিব।

প্রতিজ্ঞা কর কখন পরিত্যাগ করিবে না।

প্রতিজ্ঞা করিলাম।

মেরি মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তবে আর কাঁদিব না;—আমার সব আছে।

২

লিও একখানি পুস্তক লিখিয়াছিল। লণ্ডন নগরে তাহার একজন বন্ধু ছিলেন। সমালোচনার জন্য হস্তলিখিত পুস্তকখানি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিছুদিন পরে এইরূপ উত্তর আসিল, বন্ধু, তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি। তোমার লিখিত পুস্তকখানি একজন পুস্তক-প্রকাশকের নিকট কতকটা বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়াছি। পাঁচ শত পাউণ্ড পাঠাইলাম—রাগ করিও না, ভবিষ্যৎ উন্নতির বোধ হয় ইহাই সোপান।

এ কথা শুনিয়া মেরির চক্ষে জল আসিল,—আনন্দে সে লিওর মুখচুম্বন করিয়া বলিল, লিও, জগতে তুমি সর্ব্বপ্রধান কবি হইবে।

লিও হাসিয়া উঠিল, আর কিছু না হউক মেরি, পিতার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।

মেরি আজকাল স্বয়ং উত্তমর্ণ, তাই এ কথায় বড় লজ্জা পাইত। রাগ করিয়া বলিল, এ কথা পুনর্বার বলিলে তোমার কাছে আমি আর আসিব না।

লিও হাসিল, মনে মনে কহিল, তোমার পিতার নিকট আমার পিতা ঋণী; আমরা দুজনে তাঁহাদের সন্তান, তাই আমি জীবিত থাকিলে এ ঋণ তোমার নিকট পরিশোধ করিবই।

লিওর আজকাল বড় পরিশ্রম বাড়িয়াছে। নূতন পুস্তক লিখিতেছিল, আজ সমস্ত দিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই। মেরি প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। লিওর শয়নকক্ষ, পাঠাগার, বসিবার ঘর প্রভৃতি স্বহস্তে সাজাইয়া-গুছাইয়া দিতেছিল। দাস-দাসী সত্ত্বেও এ কাজটি মেরি নিজে করিয়া যাইত।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল; লিওর প্রতিবিম্ব তাহার উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। মেরি বহুক্ষণ ধরিয়া তাহা দেখিয়া বলিল, লিও, তুমি স্ত্রীলোক হইলে এতদিন ইংলণ্ডের রাণী হইতে।

লিও হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

অত রূপ দেখিয়া রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তোমার মত কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি আমি আর্ট গ্যালারিতে কোন রাণীর দেখি নাই; এমন শুভ্র কোমল মুখশ্রী কোন সম্রাজ্ঞীর ছিল? গোলাপ পুষ্পের মত এমন কোমল মধুময় দেহশোভা স্বর্গে তিনসেরেও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

লিও খুব হাসিয়া উঠিল। কলেজে অধ্যয়নকালেও এমন কথা অনেকে কহিয়াছিল;

বোধ হয় তাহাই মনে পড়িয়াছিল। হাসিয়া কহিল, রূপ যদি চুরি করা যাইত তা হইলে তুমি বোধ হয় এ রূপ চুরি করিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে ইংলণ্ডের রাণী হইয়া যাইতে—।

মেরি মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া সলজ্জ হাসিয়া বলিল, তুমি স্ত্রীলোকের মত দুর্ব্বল, তাহাদের মত কোমল, তাহাদের মতই সুন্দর—তোমার রূপের সীমা নাই।

এত রূপের নিকট মেরি আপনাকে বড় ক্ষুদ্র বিবেচনা করিত।

৩

কোরেল গ্রামে প্রতি বৎসর অতি সমারোহের সহিত ঘোড়দৌড় হইত। আজি সেই উপলক্ষে প্রান্তস্থিত মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মেরি ধীরে ধীরে লিওর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। লিও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পুস্তক লিখিতেছিল, তাই দেখিতে পাইল না। মেরি কহিল, আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ।

লিও ফিরিয়া দেখিয়া কহিল, ইস্—এত সাজিয়াছ কেন?

মেরিও হাসিয়া ফেলিল; কহিল, সাজিয়াছি কেন শুনিবে?

বল।

আজ ঘোড়দৌড় হইবে। যে জয়ী হইবে সে আজ আমাকেই ফুলের মালা দিবে।

তবে ত তোমার আজ বড় সম্মান! তাই এত সাজসজ্জা।

মেরি প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে কিছুক্ষণ লিওর মুখপানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর পরম স্নেহে দুই হস্তে তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, শুধু তাই নয়। তুমি আমার কাছে থাকিবে। তোমার পাশে দাঁড়াইয়া পাছে নিতান্ত কুৎসিত দেখিতে হই, সেই ভয়ে এত সাজিয়াছি;—মণিমুক্তায় রূপ বাড়ে ত?

সম্মুখস্থিত মুকুরে দুটি মুখ ততক্ষণ দুটি পরিস্ফুট গোলাপ ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, লিও তাহা দেখাইয়া বলিল—ঐ দেখ।

মেরি অতৃপ্ত নয়নে কিছুক্ষণ ঐ দুটি ছবির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বোধ হইল সেও বড় সুন্দরী। আজ তাহার প্রথম মনে হইল সৌন্দর্য্যের আশ্রয়ে দাঁড়াইলে কুৎসিত দেখিতে হয় না, বরং যাহা সৎ তাহাকে জড়াইয়া থাকিলে দোষটুকুও চাপা

পড়িয়া যায়। আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মেরি ধীরে ধীরে কহিল, আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক,—তবু আমার কত শোভা!

মেরি শিহরিয়া উঠিল। লিও তাহা অনুভব করিল, তাই তাহার মুখখানি আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিল. চাহিয়া দেখ,—তুমি আমার কলঙ্ক নহ—তুমি আমার শোভা! তুমি চাঁদের পূর্ণবিকশিত উজ্জ্বল কৌমুদী!

চক্ষু চাহিতে মেরির কিন্তু সাহস হইল না। কতক্ষণ হয়ত এইভাবে কাটিত, কিন্তু এই সময় অদূরস্থিত গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। মেরি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, সময় হইয়াছে—চল!

আমার যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

কেন?

এই পুস্তক পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ করিয়া পাঠাইব বলিয়া চুক্তি করিয়াছি—চুক্তিভঙ্গ হইলে বড় লজ্জায় পড়িব।

মেরি রাগ করিয়া বলিল, তা' বলিয়া আমি তোমাকে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে কিছুতেই দিব না।

লিওর মুখে ম্লান ছায়া পড়িল; পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া বলিল, আমার অদৃষ্ট! কি করিব মেরি, পরিশ্রম করিতেই হইবে।

মেরি তাহার মনের কথা বুঝিল তাই আরো রাগ হইল। বলিল, তোমার পুস্তক আমাকে বিক্রয় করিও আমি দ্বিগুণ মূল্য দিব।

লিওর তাহাতে সন্দেহ ছিল না; হাসিয়া বলিল, কিন্তু কি করিবে?

মেরি নিজ গলদেশের বহুমূল্য মুক্তামালা দেখাইয়া বলিল, এই মালা ছিন্ন করিয়া ফেলিব—যতগুলি মুক্তা, যে কয়খানি হীরক আছে সবগুলি দিয়া পুস্তকখানি বাঁধাইয়া সোনার কৌটায় করিয়া মাথার শিয়রে তুলিয়া রাখিব;—তারপর—তারপর—

লিও বলিল, তারপর কি?

মেরি সলজ্জ হাস্যে রক্তিমাভ মুখখানি ঈষৎ নত করিয়া বলিল, তারপর যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর তাহার কিরণগুলি তোমার নিদ্রিত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে, সেই দিন—

সেই দিন কি?

সেই দিন খুব উচ্চ কণ্ঠে পাপিয়া ডাকিতে থাকিবে, তোমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম ভাঙিবে না, আমি তখন তোমার কানের কাছে বসিয়া— মেরি হাসিয়া ফেলিল।

লিও বলিল, আমার কানের কাছে বসিয়া পুস্তকটিতে যতগুলি কথা আছে সবগুলি পড়িয়া ফেলিবে, না?

মেরি মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ।

আমি তাহা হইলে জাগিয়া এমনি করিয়া তোমার মুখচুম্বন করিব।

তাহার পর দুইজনেই হাসিয়া উঠিল।

ঘড়িতে দেড়টা বাজিয়াছে—লিও তাহা দেখিয়া বলিল, ঢের হইয়াছে—এইবার যাও—।

মেরি ঝাঁকিয়া বসিল; বলিল, আমার শরীর খারাপ হইয়াছে—আজ যাইব না।

তা কি হয়? কথা দিয়াছ, না যাইলে চলিবে কেন? কত লোক তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

মেরি নিতান্ত অবাধ্যের মত কহিল, চুক্তিভঙ্গ হইলে তোমার মত আমার বিশেষ লজ্জাবোধ হয় না—আমি যাইব না।

ছিঃ—যাও। অবাধ্য হইও না।

তবে তুমিও চল।

ক্ষমতায় থাকিলে নিশ্চয় যাইতাম।

ক্ষমতায় আছে—চল।

ক্ষমতায় নাই—যাওয়া অসম্ভব।

মেরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে আমি আর এখানে আসিব না।

লিও হাসিয়া বলিল, আমি জানি তুমি নিশ্চয় আসিবে।

মেরি রাগ করিয়া বলিল, আমি না আসিলে তোমার হয়ত খাইবার অযত্ন হইবে। পোড়াপ্রাণে যে এটা সহ্য করিতে পারি না, না হইলে নিশ্চয় দুই-একদিন চুপ করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতাম।

এ ক্ষমতাটুকু যদি নাই, তবে রাগ করিলে চলিবে কেন?

কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে মেরির অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তাই ক্ষুণ্ণ অন্তঃকরণে গাড়িতে বসিয়া ভাবিল সে ছেলেবেলায় পড়িয়াছিল যে, উদরের উপর নাকি একদিন হাতপাগুলা বড় চটিয়া গিয়াছিল—কিন্তু ফল বিশেষ তৃপ্তিজনক হয় নাই।

মেরি তাই রাগ করিতে পারিল না।

৪

দুইটার কিছু পূর্ব্বে যখন মেরির প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল। সে সুন্দরী, সে যুবতী, সে অবিবাহিতা এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী; মানবের যৌবনরাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে; এখানেও বহু মানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পরে যে তাহার শিরে জয়মাল্যটি প্রথম পরাইতে পারিবে জগতে সেই ভাগ্যবানের অদৃষ্ট আজ হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু। সওয়ারগণ রক্তবর্ণ পোষাকে সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে উৎসাহের বেগ ও চাঞ্চল্য কষ্টে সংযম করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিলে বোধ হয় তাহারা যেন পর্ব্বতও ভেদ করিতে সক্ষম;—মেরি উপস্থিত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ও আসিল,—পিস্তলের শব্দে সকলেই ব্যগ্র হইয়া দেখিল অশ্বশ্রেণী প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার পর মেরির নিকট আসিয়া তাহারা অশ্ব সংযম করিল, নিমেষের মধ্যে এক একটি পুষ্পমাল্য হাতে লইয়া আবার ঘোড়া দৌড়াইয়া দিল।—মরিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। প্রাণ তাহাদের নিকট আজি নিতান্ত তুচ্ছ,—শুধু এক কথা মনে জাগিতেছে। কে সর্ব্বপ্রথমে মেরির হস্তে মালা ফিরাইয়া দিতে পারিবে। প্রতি অঙ্গচালনায় শুধু ঐ এক ভাব;—মৃত্যু কিংবা সম্মান! মেরি মনে করিল সে-ই আজি তাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু তাহার নিকট অগ্রে আসিবার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পারে। বালিকা-সুলভ আনন্দে এবং যৌবনের চাপল্যে তাহার বুকখানি ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল।

ঘোড়া ছুটিয়াছে, সকলেই ব্যগ্রতার সহিত অপেক্ষা করিয়া আছে। কেহ কহিল, ডেভিড প্রথম হইবে; কেহ কহিল, চার্লস আগু হইয়াছে। বিদ্যুতের মত তাহারা অভীষ্ট স্থানে আসিতেছে। ঐ ডেভিড পিছাইয়া পড়িল, চার্লস অগ্রে আসিয়াছে—কেহ কহিল, এখনও কিছু বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহা মুহূর্ত্ত মাত্র—পরক্ষণেই স্পষ্ট দেখা গেল ডেভিড প্রভৃতি পিছাইয়া পড়িয়াছে। চার্লস বিদ্যুতের মত ছুটিতেছে—তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই সে সর্ব্বপ্রথম পুষ্পমাল্য মেরির পদতলে নিক্ষেপ করিল। খুব কোলাহল হইল, অসংখ্য করতালিশব্দ বহু দূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। চার্লস প্রথম হইয়াছে, মেরি সসম্মানে তাহার হস্তগ্রহণ করিল।

তাহার পর দ্বিতীয় রেস হইবে; সওয়ারগণ স্ব স্ব অশ্বে স্থান গ্রহণ করিল। পিস্তলের শব্দে সকলেই কশাঘাত করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিল—মেরির নিকট হইতে মাল্যগ্রহণ

করিবার জন্য সকলেই ছুটিয়া আসিল, সেবার কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ চার্লস নীচে পড়িয়া গেল, পশ্চাতের অশ্ব তাহার পদদ্বয়ের উপর দিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া গেল—যাহারা নিকটে থাকিয়া তাহা দেখিল তাহারা সকলেই চিৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু চিৎকার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই চার্লস লম্ফ দিয়া পুনর্বার অশ্বারূঢ় হইল। পদদ্বয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। অপরাপর অনেকেই চার্লসের জন্য শঙ্কিত হইল; দারুণ আঘাত-বশতঃ যদি অশ্বপৃষ্ঠে স্থান না রাখিতে পারে! অজ্ঞাতসারে মেরিও এ সন্দেহ এবং শঙ্কা হৃদয়ে স্থান দান করিল,—প্রথম কারণ তাহার হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল, পরদুঃখে শীঘ্রই আর্দ্র হইয়া যায়, দ্বিতীয় কারণটি তাহার বংশগত। বালিকাকাল হইতে সে বীরত্বের বড় পক্ষপাতী, তাহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন। এ-সকল গল্প সে বাল্যকালে পিতার নিকট শুনিতে পাইত; অশ্বচালনা যুদ্ধের একটি অংশ—ইহাতে কত দৃঢ়তা, সাহস এবং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। যাহা যুদ্ধের অংশ, তাহাই গৌরবের সামগ্রী। সম্মানের নিকট যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা প্রাণকেও নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে,—আজ শুধু সম্মানলাভের জন্যই চার্লস এ আঘাত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে—হয়ত বা সে প্রাণ হারাইবে। মেরি শিহরিয়া উঠিল। এই মাত্র যাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছে, সে হয়ত প্রাণত্যাগ করিবে; এরূপ চিন্তা হৃদয় প্রফুল্লকারী নহে, তাই অত্যন্ত আগ্রহ এবং ভীতির সহিত মেরি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল; চার্লসের নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিল। তাহার পর বড় কোলাহল হইতে লাগিল; দূরবীন লাগাইয়া অনেকেই দেখিল চার্লস পুনর্ব্বার অগ্রে আসিতেছে; কিন্তু ইতিমধ্যে মেরি মনে মনে আপনাকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই চার্লসের সহিত এরূপ জড়িত করিয়া লইয়াছিল যে, তাহার এই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য আপনাকে নিতান্ত গৌরবান্বিত এবং শ্লাঘ্য বলিয়া বোধ করিল। বাস্তবিক সেবারেও চার্লস জয়ী হইল,—আনন্দে মেরির সহসা বাক্য নিঃসৃত হইল না, পরে নিজের গলদেশ হইতে ঘড়ি ও চেন খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, তুমি এ গ্রামের রত্ন, তোমার মত সাহসী যুবা আর কেহ নাই। চার্লস স্মিতমুখে এ প্রশংসা গ্রহণ করিল।

সে রাত্রে মেরি সকলকেই নিমন্ত্রিত করিল, সন্ধ্যার পর তাহার বাটীতে খুব সমারোহে ভোজন ব্যাপার সমাধা হইতে চলিল; আহারে বসিয়া মেরি চার্লসের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, মৃদুকণ্ঠে কহিল, তোমার জন্য বড় ভয় পাইয়াছিলাম।

চার্লস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন?

বড় কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল,—তুমি ভিন্ন আর কেহ বোধ হয় অশ্বপৃষ্ঠে স্থান রাখিতে পারিত না।

চার্লস বিনয়নম্র-কণ্ঠে কহিল, আমার আঘাত আরোগ্য হইয়াছে; আমার জন্ত তুমি দুঃখিত হইয়াছিলে, এমন সৌভাগ্য পূর্ব্বে কখন হয় নাই—এত আনন্দও কখন অনুভব করি নাই। তোমার করুণা পাইবার জন্ত আমি একটা পা কাটিয়া দিতে পারিতাম; আঘাত ত তুচ্ছ কথা!

সে রাত্রে অনেক সেরি, সাম্পেনের শূন্তগর্ভ বোতল ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল; গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আপনার পাঠাগারের জানালায় বসিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে লিওপোল্ড বিকৃত জড়িত কণ্ঠের গীতধ্বনি শ্রবণ করিল; পিয়ানোর শব্দ ঝমঝম করিয়া আকাশে উঠিল; কর্কশ কণ্ঠের সহিত মধুর কণ্ঠও কয়েকবার মিশ্রিত হইল। জানালা বন্ধ করিয়া লিও শয্যাশ্রয় করিল, আজ হৃদয়ে একটু যাতনা বোধ হইতেছিল।

৫

পরদিন মেরি লিওকে বলিল, কাল আমাদের বাটীতে কেমন উৎসব হইয়া গেল, তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

লিও হস্তস্থিত কলম দোয়াতের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, ভালই করিয়াছিলে—কিন্তু আমারও কাল রাত্রে কিছুই কাজ হয় নাই, কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

মেরি মুখপানে চাহিয়া বলিল, কেন কাজ হয় নাই?

লিও কলম তুলিয়া লইল, পুস্তকে মনঃসংযোগ করিবার উপক্রম করিয়া বলিল, সে কথা তুলিয়া কাজ নাই, আমি বলিতে পারিব না।

এরূপ কথা জীবনে মেরি এই প্রথম শুনিল। বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন?

তা জানি না; বোধ হয় মন কিছু নীচ হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার পর মেরি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিল, কিন্তু লিও আর মুখ তুলিল না, কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না।

মেরি যাইবার সময় বলিল, যাইতেছি।

যাও।

যাইবার সময় তাহার বোধ হইল যেন সে লিওর মনের কথা কতক বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই—শুধু অনুমান করা যায় মাত্র। যাহা হউক ক্ষুদ্র পথটুকু সে বড় অন্তমনস্কভাবে অতিক্রম করিল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার সময় ভৃত্য একখানা টিকিট হাতে করিয়া কহিল, চার্লস বসিবার কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।

মেরি ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, কেন ?

তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই,—জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব কি ?

মেরি একটু ভাবিয়া বলিল, থাক, আমি নিজেই যাইতেছি।

চার্লসের বিশেষ কিছুই কাজ ছিল না। সে শুধু গত নিশির আমোদ উৎসবের জন্য ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। মেরি কক্ষে প্রবেশ করিলে সে অতিশয় ভদ্রতার সহিত অভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মেরি হাত ধরিয়া অতিথিকে বসাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল,—কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু কথায় কথায় তাহা একটু অন্যরকমে দাঁড়াইতে চলিল।

মেরির কত ঐশ্বর্য্য, কত বিষয় আশয়, কত মান-সম্ভ্রম! এই ত হইল প্রথম; তাহার পর মেরি কত উচ্চবংশীয়া, তাহার পিতা কত বড় বীর এবং সজ্জন ছিলেন—রাজদ্বারে তাঁহার যেপরিমাণ সম্ভ্রম ছিল সে পরিমাণের সম্ভ্রম অর্জ্জন করিতে বিশেষ বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, রাজনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন, মেরির পিতা Captain নোলের তাহা কিছুমাত্র কম ছিল না, এক কথায় আজকাল সেরূপ আর মিলে না। কিন্তু শেষের কথাগুলি আরও উচ্চ অঙ্গের, মেরির তাহা খুব ভাল লাগিতেছিল;—সেটা অন্য কিছু নয়, শুধু তাহার নিজের রূপ এবং যৌবনের ব্যাখ্যা এবং পক্ষপাত সমালোচনা। পুরুষের মুখে এ কথাগুলা স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিকর বোধ হয়, এ কথার কাছে কিছুই নয়, তাই কতক্ষণ দুইজনে নির্জ্জন কক্ষে গল্প করিয়া অতিবাহিত করিল তাহা মেরি বুঝিতে পারিল না। ঘড়িতে যখন দুইটা বাজিল তখন চার্লস বিদায় হইল এবং যাইবার সময় সেই দিন সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণও লইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে, এই রূপ এবং ঐশ্বর্য্যের কাহিনীর তরঙ্গগুলা যখন অল্পে অল্পে শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল, এবং তাহার প্রতিধ্বনিগুলা মেরির মস্তিষ্কের ভিতর ঠোকাঠুকি করিয়া ক্রমশঃ হীনবল হইয়া ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল এবং যে অবশিষ্ট স্পন্দনটুকু নাচিয়া বেড়াইতেছিল তাহাও যখন অন্য আর একটি অসীম সৌন্দর্য্যের পার্শ্বে কাতরভাবে ছুটিয়া পলাইবার প্রয়াস করিতে লাগিল, তখন তাহার বোধ হইল এই ঝোঁকের উপর আকস্মিক নিমন্ত্রণকার্য্যটা তেমনি যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সন্ধ্যার পর সে আসিবে, দুইজনে একত্র আহার করিতে হইবে, হয়ত বা আর কেহই থাকিবে না, কত গল্প কত কথা বলিবার ও শুনিবার উপায় থাকিবে, কিন্তু মেরির তাহাতে আর তেমন মন উঠিল না। যদি আর কেহ জানিতে পারে? যদি তাহার ক্লেশ বোধ হয়? চঞ্চল হস্তে মেরি এক খণ্ড কাগজ লইয়া লিখিল, তুমি সন্ধ্যার পর আসিও না, আমার শরীর মন্দ বোধ হইতেছে। কিন্তু এ পত্র চার্লসের নিকট পাঠাইতে লজ্জা বোধ হইল। অনেক চিন্তা করিয়া মেরি অবশেষে এইরূপ লিখিল যখন আসিবে তখন আর তিন চারিজন

বন্ধুকে আনিও। আনিতে পারিলে নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং সুখী হইব। ভৃত্য পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রাত্রে চার্লস আরও দুই তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে আনিল। আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই একবাক্যে মেরিকে গান গাহিবার জন্য ধরিয়া বসিল। ইচ্ছা না থাকিলেও অতিথির অনুরোধ রাখিতে হইল; পিয়ানো-এ ঝঙ্কার দিয়া মেরির সুকণ্ঠ দুই-তিনটি সপ্তকের মধ্যে খেলা করিয়া ছুটিতে লাগিল, উৎসাহ ও আনন্দে চার্লস প্রভৃতি কয়েকবার উচ্চ শব্দ করিয়া উঠিল, কেহ বা আবেগের সহিত দুই এক পদ সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ সেরি, হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি ও রমের শূন্যগর্ভ বোতলগুলির সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইয়া চলিল, উৎসাহ, আবেশ-উচ্চস্বর ততই পরিপূর্ণভাবে নৈশ আকাশে ঠেলিয়া-ফুঁড়িয়া উঠিতে লাগিল। জানালার ভিতর দিয়া এ শব্দ লিওর পাঠাগারে যে একদম প্রবেশ করে নাই তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছপূর্ব্বক আজ লিও জানালা-গুলা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। শব্দ-সাড়াগুলা সেখানে তেমন গোলযোগ করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে গাহিতে গাহিতে মেরির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, পার্শ্বেও চার্লস কিংবা আর কেহ সেরির গ্লাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমাগত সেরি-গ্লাসের মুখচুম্বন করিয়া মেরির গলাটা নিতান্ত সরস এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিল। উৎসাহের সহিত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ানোর ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল।

শেষ হইলে, শয্যায় শয়ন করিয়া সেদিনের মত আর নিদ্রা আসিল না; মেরি অনেক কথা ভাবিল। পুরুষের দল তাহার বড় প্রশংসা করিয়াছে—কেমন করিয়া তাহার শুভ্র পুষ্পকোরকতুল্য অঙ্গুলি কি বোর্ডের উপর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া যাইতেছিল এবং অঙ্গুলি সংলগ্ন বৃহৎ হীরক-অঙ্গুরীয় মধ্যে মধ্যে ঝকঝক করিয়া এক শোভা দশ গুণ করিয়াছিল, কিন্তু সহসা মনে পড়িল হয়ত আর একজনের আরও শুভ্র আরও সুন্দর, কিন্তু ক্লান্ত এবং অবসন্ন অঙ্গুলি দুইটি এখনও নিঃশব্দে কাগজের উপর দিয়া ধীরে ধীরে লিখিয়া চলিয়াছে। সে হয়ত সমস্ত শুনিয়াছে, হয়ত বা ক্লেশ অনুভব করিয়াছে কিন্তু প্রতিবিধানের উপায় কই? মধু থাকিলে মৌমাছি আসিবেই, ধন থাকিলে তাহার চতুষ্পার্শ্বে লোকসমূহ জড় হইবেই, নূতন সম্বন্ধের বন্ধন যৌবনের অঙ্গ জড়াইয়া উঠিবার স্বতঃ প্রয়াস করিবেই—ইচ্ছা থাকিলেও এ বাঁধন নিজ হস্তে খুলিয়া ফেলা যায় না। মেরি কাতরভাবে উদ্ধারের কামনা এবং প্রার্থনা করিতে করিতে সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সে লিওর কাছে গিয়া বসিল, লিও লিখিতেছে, কই একবারও চাহিয়া দেখিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া মেরি কথা খুঁজিয়া পাইল না—তারপর সাহসে ভর

করিয়া বলিল, তোমার আর কত বাকী আছে ?

অনেক !

আজ ছু' তিন দিন ধরিয়া কি লিখিলে ? আমাকে শুনাইবে না ?

এই সময় অনবধানতাবশতঃ কলমের মুখে অনেকখানি কালি উঠিয়াছিল, টপ করিয়া একটা বড় রকমের ফোঁটা শুভ্র কাগজের উপর পতিত হইল। লিও খাতাখানা ঈষৎ সরাইয়া কলমের মুখটা মুছিতে মুছিতে বলিল, মেরি, তোমার মুখ দিয়া বড় তীব্র সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে ; এ গন্ধ আমার সহ্য হয় না—সরিয়া বস। অত কাছে বসিয়া থাকিলে আমার সমস্ত ভুল হইয়া যাইবে।

এক দণ্ডে মেরির চক্ষু ছুটি চকচক করিয়া উঠিল ; বলিল, আমি তীব্র সুরা পান করি নাই।

হইতে পারে। কিন্তু আমার নিকট ও গন্ধ বড় উগ্র বোধ হইতেছে। তুমি হয় সরিয়া বস, না হয় গৃহে যাও।

মেরি উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চিরকাল আদর ও যত্নের মধ্যে লালিত-পালিত, এরূপ তাচ্ছিল্যের কথা শুনা তাহার অভ্যাস নহে। বড় অপমান বোধ হইল। তাহার সমস্ত হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ, তাই এ ক্ষুদ্র যুবার কোমল অথচ রীতিমত দৃঢ় ও নির্ভীক সত্য কথা তাহার সমস্ত শরীরে অকস্মাৎ খর বিষের জ্বালা জ্বালাইয়া দিল। দাঁড়াইবার সময় সে ভাবিয়াছিল, খুব ছুটো চড়া কথা শুনাইয়া দিবে ; মিথ্যাবাদী, অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি শব্দগুলা আরোপ করিয়া, তাহার বুকে ছুরির মত বিদ্ধ করিয়া দিবে—তার পর যথারীতি খুব একচোট কলহ করিয়া চিরদিনের মত বিচ্ছেদ করিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার শব্দ-শাস্ত্রের অভিধানটা একেবারে কোথায় হারাইয়া গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করিল, চক্ষু বিস্ফারিত করিল, দন্তে অধর দংশন করিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

সম্মুখের দর্পণে সে চিত্র লিও দেখিতে পাইল। কাছে আসিয়া মেরির উন্নত গ্রীবার এক পার্শ্বে হাত রাখিয়া বলিল, অপমান বোধ হইয়াছে ?

মেরির আত্মাভিমান এবার কথা খুঁজিয়া পাইল। তীব্রকণ্ঠে কহিল, তুমি নীচ এবং ঈর্ষাপরবশ, তাই অপমান করিলে !

লিও ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। কহিল, মেরি, জগতের মধ্যে ঐ ছুটি কথা আমার সহ্য হয় না। অমন কথা আর মুখে আনিও না। তুমি অধঃপথে যাইতেছ তাই সাবধান করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ওরূপ মর্ম্মান্তিক কথা শুনিবার বাসনা রাখি না।

মেরি আরও ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, অধঃপথে কি করিয়া গেলাম ?

আমার তাই মনে হয়। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, বিশেষত তুমি একাকী অত রাত্রি পর্য্যন্ত যে আমোদ-প্রমোদ করিবে আমার সেটা ভাল বোধ হয় না। লোকেই বা কি বলিবে?

আবার লোকের কথা! মেরি অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, লোকে কিছুই মনে করে না। তুমি দরিদ্র কিন্তু আমার ধন-ঐশ্বর্য্য আছে, তোমার মত অনবরত পরিশ্রম করিয়া আমার খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে না, তোমার মত নির্জ্জন গৃহে বসিয়া জনসমাজের নিকট অপরিচিত থাকিলেই বরং লোকে মন্দ বলিবে। তাহার পর একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, লিও, আপনার ভাগ্য দিয়া আমার ভাগ্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিও না—পিতা আমার জন্য অভিশাপ এবং মর্ম্মপীড়া রাখিয়া যান নাই—যাহা সুখের, যাহা বাঞ্ছিত, সমস্তই যথেষ্ট দিয়া গিয়াছেন। যাহার এত আছে তাহার পক্ষে দু-দশজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিলে কেহই দুষে না।

এত কথা মেরি কহিতে জানে, লিও তাহা জানিত না; এত স্নেহ, এত করুণা যে এত তীব্র বিষ ঢালিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্য ওলট-পালট করিয়া দিতে পারে, সে ধারণা লিও করিতেপারে নাই, তাই নিতান্ত নির্জ্জীব অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। কোন উত্তর বা কোনরূপ প্রতিবাদ খুঁজিয়া পাইল না। রাগের মাথায় মেরি চলিয়া গেল, তাহ সে দেখিল, কিন্তু ফিরাইতে পারিল না, ইচ্ছাও বড় বেশি ছিল না, কিন্তু দুটো কথা বলিতে পারিলে বোধ হয় ভাল হইত।

আপনার কক্ষে পৌছিয়া মেরি, এক খণ্ড রুমালে মুখ আবৃত করিয়া একটা সোফার। উপর বসিয়া পড়িল—সমস্ত শরীরে অগ্নির উত্তাপ বাহির হইতেছে।

এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, চার্লস অপেক্ষা করিতেছেন।

মেরি মুখ তুলিয়া তাহার পানে তীব্র কটাক্ষ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, তাড়াইয়া দাও।

ভৃত্য অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। চার্লসের নিকটে গিয়া কহিল, শরীর খারাপ, এখন দেখা হইবে না।

চার্লস উৎকণ্ঠিতভাবে নানারূপ প্রশ্ন করিল। কখন শরীর খারাপ হইয়াছে, কেমন করিয়া হইল, কতক্ষণে সারিবে—ইত্যাদি অনেক কথা এক নিশ্বাসে কহিয়া গেল। উত্তর পাইল না। সদ্য তিরস্কৃত হইয়া ভৃত্য মহাশয় কিছু চটিয়াছিলেন; কিন্তু তিরস্কার যে তাহাকে করা হয় নাই সে কথা সে বুঝিল না। বলিল, আমি অত জানি না।

হতাশ হইয়া চার্লস একটা ফুলের তোড়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমার নাম করিয়া এইটি দিও।

ভৃত্য পার্শ্বের টেবিলে তাহা রাখিয়া দিয়া বলিল, তিনি নীচে আসিলে দিব।

৬

প্রায় একমাস অতীত হইল কেহই কাহারো সহিত সাক্ষাত করিল না। মেরি মনে করে যে, তাহার বাল্যসখাটি তাহার শরীরের ও মনের চতুষ্পার্শ্বে যে মমতার আবরণে ঢাকিয়া দিয়াছিল তাহা অল্পে অল্পে সে কাটিয়া ফেলিয়াছে; আর তাহার উপর কোন স্নেহ নাই, মায়া নাই—এক বিন্দু সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নাই। এই এক মাসের মধ্যে সে এই কথাগুলি নিশিদিন ধরিয়া মনে মনে তোলাপাড়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু যত অধিক সে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছে, তত বেশি সে আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। নিজের হৃদয়ের তলায় সে একদিনও প্রবেশ করে নাই, করিলে দেখিতে পাইত যে, সেখানে শুধু লিও আর নিজে অষ্টপ্রহর মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছে। প্রেমালাপ করিতেছে না—কলহ করিতেছে। উঠিতে বসিতে সে সর্ব্বদাই চিন্তা করে, কি করিলে এ কলহটা আরও পাকাইয়া তুলিতে পারা যায়, কিরূপ নিত্য নব উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে লিওর বিরক্তি আরও একটু সজীব করিয়া তুলিতে পারা যায়। কিরূপ আচার-ব্যবহার করিলে তাহাকে আরও একটু ম্রিয়মাণ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে আরও দুই-একবার ভোজন উৎসবাদি সমাধা হইয়াছে, ব্যয়বাহুল্য এবং আয়োজনাদির পারিপাট্য দেখিয়া গ্রামের লোক কত সুখ্যাতি করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার মন নাই. মানসচক্ষে সে শুধু দেখিতে চাহে, এসকল কাহিনী শুনিয়া লিওর মুখ কিরূপ বিশুষ্ক এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, কর্ণে শুনিতে চাহে, লিও কিরূপ ফুলিয়া ফুলিয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। এত অর্থব্যয় বুঝি তাহা হইলে সার্থক হয়। অর্থব্যয়ের কারণ ঐ লিও এবং উদ্দেশ্য তাহার যাতনা বৃদ্ধি করা; —কিন্তু সফলতার কথা কেহ বলে না। এ-কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় না— কিন্তু এমন কি কেহ নাই, এমন কি কোন সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী পদার্থ নাই যাহা এ-কথা বলিয়া যাইতে পারে? মেরি অন্যমনস্কভাবে এই সব ভাবে। কিন্তু যখন মনে হয়, লিও তাহার পুষ্পের মত শুভ্র শান্ত দেহটি লইয়া হৃদয়ের মধ্যে জগতের শক্তি এক করিয়া পর্ব্বতের মত দৃঢ় হইয়া আছে, এত সমারোহ, হট্টগোল তাহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত খাইয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছে ভিতরে একটিবারও প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; হয়ত বা সে হৃদয়ে জ্বালার পরিবর্তে অবহেলা ও ঘৃণারস্থান হইয়াছে, তখন মেরির সমস্ত শিরা, অস্থি, মজ্জা—যাহা কিছু আছে সমস্ত এক সাথে ঝমঝম করিয়া সুরে বেসুরে নিতান্ত একটা অবসন্ন হতাশ ছবি চক্ষের উপর দাঁড় করাইয়া দেয়। উৎসব-রাত্রে যখন সকলে ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,

বাটীময় সাড়াশব্দে পূর্ণিত, শিখরে শিখরে উৎসবের সহস্র দীপ দৈত্যরাজার প্রমোদ-ভবনের মত শোভা পাইতেছে—হয়ত সে সময়ে মেরি একটু নির্জ্জনে বসিয়া একটা অপরূপ বিষাদচিত্র মনে মনে আঁকিতেছে। ভাবিতেছে, লিও হয়ত এতক্ষণে তাহার নৈশ কার্য্য শেষ করিয়া শীতল বায়ুর জন্য একটিবার মাত্র জানালা খুলিয়াছে; উৎসবের দীপমালা চক্ষে পড়িয়াছে—কিন্তু নিমেষের জন্য! নিতান্ত অবজ্ঞাভরে জানালা রুদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই সে নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে আপনার স্নিগ্ধ শয্যাতলটি আশ্রয় করিয়া শুইয়া আছে,—নিদ্রাদেবী পদ্মহস্তে তাহার পদ্মের মত দুটি চক্ষের উপর হাত বুলাইয়া তাহাকে নিদ্রিত করিতেছেন। মেরি ছটফট করিয়া উঠিয়া পড়িল,—ভাবিল, সে নিজে? নিজের কথা নিজেই বুঝে না—মনে হয় এত উৎসব সমারোহ মিথ্যা পণ্ডশ্রম মাত্র। লিওর গ্রাহ্যের মধ্যেও আসে না।

জ্বালার উপর জ্বালা, মেরি ধনবতী, কিন্তু লিও দরিদ্র, তাহার সহায় সম্পদ আছে লিওর কিছুই নাই, জনসাধারণ তাহাকে কত খাতির যত্ন করে, লিওকে কেহ চিনে না তবুও সে উচ্চে বসিয়া আছে যে, মেরি তাহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারিতেছে না। তাহার রূপ যৌবন ঐশ্বর্য্যের পদতলে কত লোক নিত্য আসিয়া মাথা নত করিতেছে, স্বেচ্ছায় অযাচিত আপনাকে বিক্রয় করিবার জন্য তাহার পানে ঈষৎ সঙ্কেতের অপেক্ষা মাত্র করিয়া দীন নয়নে চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দারিদ্র্যপীড়িত, পরিশ্রমক্লিষ্ট, অসহায় অলৌকিক জীবটি একবার ফিরিয়াও দেখে না। সে ধরিতে চাহে না, ধরা দিতেও চাহে না। রাগের মাথায় মেরি আকাশের গায়ে থুথু ফেলিত। লিওর স্থান বড় উচ্চে, সেখানে এসব পৌঁছিত না, শুধু মেরির মুখে-চোখেই তাহা ফিরিয়া আসিত। দ্বিগুণ জ্বালায় সে আপনি জ্বলিয়া মরিত।

৭

নিজের জন্মতিথি উপলক্ষে বাটীতে আজ মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইতেছে। প্রতি বৎসরেই ইহা হইত, কিন্তু এবার জাঁকজমক কিছু বেশি। সমস্ত বাটীময় ফল, ফুল ও রংদার পাতায় সাজান হইতেছে, সহস্র দীপ নানাবর্ণ বিচিত্র কাচপাত্রের ভিতর

সজ্জিত হইয়া শুধু রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে! গ্রামের সমস্ত সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; এই সময় লণ্ডন নগরে কে একজন প্রসিদ্ধ যাদুকর আসিয়াছিল, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সে রাত্রের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাজিকরের বাজি দেখিবার জন্য সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই অনেকে ধীরে ধীরে জমা হইতেছে। যাহার শরীর অসুস্থ সেও রীতিমত গরম কাপড়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই উপযুক্ত স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। কথা ছিল সাতটার গাড়িতে বাজিকর আসিবে এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার বিদ্যা হস্তকৌশল ইত্যাদি পরিদর্শন করাইবে; তাহার পর দশটার সময় ভোজনাদি হইবে। সাড়ে সাতটার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া ছিল, কিন্তু সাতটার সময় একটা অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। বাজিকরের পরিবর্ত্তে একখানা টেলিগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হইল। যাদুকর হঠাৎ বড় পীড়িত হইয়াছে—আসিতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে মেরির মাথাটা ঘুরিয়া গেল। এখন উপায়? দক্ষিণ হস্ত চার্লসের হস্তে কাগজখানা দিয়া বলিল, যাহা হয় কর। কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও সহসা পীড়িত হইয়া শয্যা আশ্রয় করিয়াছি।

টেলিগ্রাফ পড়িয়া চার্লসও বিষম অভিভূত হইল; সেও কহিল, উপায়? সাতটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত কাটে কিরূপে?

আপাততঃ এ কথা চাপা রহিল। ক্রমশঃ লোকে হল পূর্ণ হইয়া গেল। আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা সকলের মুখে; ক্রমে যত সময় যাইতে লাগিল তত সকলে ব্যস্ত হইতে লাগিল। যাহারা কিছু অসুস্থ ছিল তাহারা গৃহে প্রত্যাগমনের উপায় খুঁজিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই একটা অস্ফুট চাপা কলরব হইতে লাগিল, ভাবগতিক দেখিয়া মেরির নিজের কেশ উৎপাটন করিবার ইচ্ছা হইল। ক্রমশঃ কথাটা জানাজানি হইল—তখন হতাশ হইয়া কেহ বা সংগীতের কথা উত্থাপন করিল, কোন বৃদ্ধ বা তাহার সঙ্গিনীকে হুইস্ট টেবিলের দিকে টানিয়া লইয়া গেল, কোন যুবক তাহার বন্ধুর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বিলিয়ার্ড হলের দিকে চলিল,—এইরূপে সাতটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত কেমন করিয়া কাটান যাইতে পারে তাহা সবাই ভাবিতে বসিল। সকলকে অন্য কোন উপায়ে নিযুক্ত রাখিবার কোনরূপ আয়োজন করিয়া রাখা হয় নাই বলিয়া মেরি মৃদু-কণ্ঠে চার্লসকে অনুযোগ করিল, কিন্তু উপায় কেহই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইল না।

আপাদমস্তক আলষ্টরে আবৃত করিয়া আজ লিওপোল্ড আসিয়াছিল। হলের এক কোণে একটা সোফায় বসিয়া নিকটস্থ একজন যুবতীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, যাদুকর আসিল না কেন?

যুবতী কহিল, তাহার সহসা পীড়া হইয়াছে।

তাহা হইলে?

তাহা হইলে আর কি? দশটা পর্য্যন্ত যাহার যাহা খুশি করুক। বেচারির অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছে—সে অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে।

লিও একটু ভাবিয়া বলিল, আমি গাহিতে জানি। বোধ হয় নিতান্ত মন্দ শুনাইবে না,—কি বল?

রমণীটি অতিশয় সংগীতপ্রিয়। সে একেবারে লিওর হাত ধরিয়া পিয়ানোর দিক টানিয়া আনিয়া বসাইয়া দিল। স্বহস্তে ডালা খুলিয়া দিয়া বলিল, বাজাও।

পিয়ানো ডাকিয়া উঠিল—ঝম্ ঝম্ ঝম!

অনেকেই এখনো এদিকে চাহে নাই, পিয়ানোর শব্দে তাহারা ফিরিয়া চাহিল। ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তখন মর্ত্তের পিয়ানো স্বর্গের সংগীত বলিতেছিল। যাহারা বুঝিত, তাহারা বুঝিল এরূপ অলৌকিক ক্ষিপ্রহস্ত, এরূপ পারদর্শী অসামান্য শিক্ষিত অঙ্গুলি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কখন এ পিয়ানো স্পর্শ করে নাই। পার্শ্বের কামরায় যাহারা তাস লইয়া বসিয়াছিল তাহারা ক্রীড়া স্থগিত করিল, বিলিয়ার্ড হলের দিকে যাহারা পদচালনা করিয়াছিল, তাহারা আপাততঃ দাঁড়াইয়া পড়িল। সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

কেহই লিওকে ভাল করিয়া দেখে নাই, তাই কেহই চিনিতে পারিল না। যে চিনিত সে কথা কহিল না। তাহার পর, পিয়ানো যাহা অস্ফুট বলিতেছিল, কণ্ঠ তাহা স্পষ্টতম করিল। সে কণ্ঠের তুলনা হয় না। অশীতিপর বৃদ্ধও মনে করিল, তাহার জীবনে এরূপ কণ্ঠস্বর শুনে নাই। ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধা মনে করিল জগতের শেষ দিনটিতে বুঝি দেবতাগণ এইরূপ সংগীত করিবেন। লহরে লহরে সে স্বর কক্ষ ভরিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল; ঘূর্ণবায়ু যেমন রাস্তার ধূলা, কুটা, তৃণ, কঙ্কর সমস্তই এক সাথে ঘুরাইয়া লইয়া আকাশে উঠে, এ স্বরও তেমনি বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের মন একসাথে উপরে উড়াইয়া চলিল। এরূপ মুগ্ধ করিতে যাদুকর বোধ হয় পারিত না। নিস্পন্দ নীরব—কাহারো মুখে কথা নাই, অনেকের শরীরে চৈতন্যের লক্ষণটুকু পর্য্যন্ত নাই। ঠিক কোন সময়ে গীতটি শেষ হইল, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহার পর পিয়ানো যখন ঝম ঝম ঝম করিয়া তাহার শেষ ঝঙ্কারটুকু মুগ্ধ আকাশের তরঙ্গশ্রেণীর শেষ গতিটুকু বিতরণ করিয়া স্তব্ধ হইল, তখন সেই আহূত জনমণ্ডলী নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে একেবারে পিয়ানোর চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকে মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

কেহ উত্তর দিতে পারিল না। লিও নিজের মুখ নীচু করিয়া রাখিয়াছিল। আবার পিয়ানো ঝম্ ঝম্ করিয়া উঠিল, নিমিষে মুগ্ধ, বিস্মিত জনমণ্ডলী সরিয়া গেল, যে যেখানে পাইল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল, শুনিল নির্জ্জীব পিয়ানো সজীব হইয়া কত কি

কথা বলিয়া যাইতেছে, পুনর্বার কণ্ঠস্বর তাহা স্পষ্টতর করিয়া দিল। লিও বিরহের গান গাহিতেছিল—কোন সুদূর সমুদ্রকূলে বসিয়া পরিত্যক্ত রাজকন্যা তাহার প্রণয়ীর জন্য সমুদ্রকে ডাকিয়া বলিতেছে, ওগো সমুদ্র, আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দাও—ফিরাইয়া দাও; কোন অতলগর্ভে তাহাকে নিমজ্জিত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ, হায়, দয়া করিয়া ফিরাইয়া দাও, না হইলে আমাকেও তোমার একটি তরঙ্গ পাঠাইয়া টানিয়া লও। এ দুঃসহ জীবনের ভার আর বহিতে পারি না। গানের ভাবটা এইরূপ। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহার কিভাবে কাটিতেছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু মেরির কথা বলি নাই। সে এতক্ষণ একটা কোচের বাহুতে মাথা রাখিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—বুঝি তাহার সমস্ত হৃদয়খানা সঙ্গীত হইয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে,—সমুদ্র কি, তাহা সে জানে না, শুধু আকুল, মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে;—সে আমার হারাইয়া গিয়াছে—ওগো, ফিরাইয়া দাও! ফিরাইয়া দাও!

প্রবল জ্বরে যেমন রোগীর কিছুতেই পিপাসার শান্তি হয় না, তেমনি এই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গীতের তৃষ্ণা কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। একটির পর একটি করিয়া কতগুলি সংগীত হইল।

দশটা বাজিয়া গিয়াছে, আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া লিও পিয়ানোর ডালা বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তখন সকলে চিনিল, লিও।

মেরি যখন চিনিতে পারিল তখন সে টলিতে টলিতে একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য তাহার চৈতন্য রহিল না। সে শুধু ক্ষণকালের জন্য, তাহার পর মেরি উঠিয়া বসিল, আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইল; চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল সকলে একত্রিত হইয়াছে, কিন্তু লিও নাই। সেই কথাই সকলে বলাবলি করিতেছিল। মেরি আসিবা মাত্র সকলেই এ প্রশ্ন করিল, মেরি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি না। সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কেহই জানে না। অবশেষে দ্বারবান সংবাদ দিল—লিও চলিয়া গিয়াছে।

কেহই কারণ বুঝিল না। কিন্তু কথাটা সকলের মনেই খট করিয়া বাজিল। লজ্জায় ও অভিমানে মেরি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া রক্তাক্ত করিল।

সে অনিমন্ত্রিত অযাচিত আসিয়াছিল। মেরির জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বৎসরই আসিত, আজিও তাহাই আসিয়াছিল; নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করে নাই। আজিকার দিনে না আসিলে এত আনন্দ কতকটা নিরানন্দে পরিণত হইত। মেরির মান বজায় রাখিয়া সকলকে নিরতিশয় সুখী করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে, দুটো ধন্যবাদ, দুটো কৃতজ্ঞতার কথা, কিছুরই অবকাশ দেয় নাই; নীরবে, গৃহকর্ত্রীকে সহস্র অপরাধী করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাই মেরি গুপ্ত অবমাননায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রথম অক্ষরের সহিতও যে লিওর পরিচয় আছে—এতদিনের বনিষ্ঠ আলাপেও মেরি তাহা জানিতে পারে নাই, তাই তাহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল না। যখন চিনিল তখন তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল,—তাহার পর এই নীরব প্রচ্ছন্ন অবমাননা। যাতনার তাড়নায় সে রাত্রের জন্য মেরি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না।

৮

আরও তিন দিন নিঃশব্দে অতিবাহিত হইয়া গেল। এইবার, এতদিন পরে লিওর চক্ষে খুব বড় দু ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল। আজ মাসাধিক কাল হইল মেরি অন্যে অন্যে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সামর্থ্যানুযায়ী অবহেলা তাচ্ছিল্য করিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু এতদিন পরে অবমাননা করিয়াছে। সে যে আত্মসম্মান তুচ্ছ করিয়া অনাহুত অতিথি হইতে গিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে অবজ্ঞার মৌন জ্বালাটুকু লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এইটাই তাহাকে অধিক বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছে। তিন দিন অতিবাহিত হইল, সে একবার আসিল না, একবার ডাকিল না, আর চোখের জলের অপরাধ কি? কিন্তু শুধু কি তাই? লিওর অন্তরের ভিতর হইতে একটা ধিক্কার উঠিয়াছে। পরে দুঃখ দিলে চোখে জল আসে, কিন্তু সেজন্য আপনাকে কেহ ধিক্কার দেয় না বরং নিজেকে একটু উচ্চ স্থানে দাঁড় করাইয়া একটু সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করে। অদৃষ্টকে দোষ দিয়া, কর্মফলের নিন্দা করিয়া, পরের মন্দ চরিত্রকে গালি পাড়িয়া অনেকটা শান্ত হওয়া যায়; কিন্তু যাহার আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়—তাহার দুঃখ রাখিবার স্থান নাই, তাহার সান্ত্বনা এ জগতে আছে কিনা বলিতে পারি না। লিওর এক ফোঁটা অশ্রু মেরির জন্য পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষ ফোঁটাটি যখন চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বহিয়া বক্ষে আসিয়া পড়িল তখন তাহার হৃদয়ের গ্রন্থি গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া যাইবার মত হইল। এ অশ্রু তাহার নিজের জন্য পড়িয়াছে।—সকলের এমন দুর্ভাগ্য ঘটে না, ঘটিলেও হয়ত বুঝিতে পারে না, কিন্তু যদি কখন কেহ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে লিওর মত নিশ্চয়ই যুক্তকরে ঊর্ধ্বমুখে কহে, ভগবান, এমন অশ্রুপাত কাহাকেও করাইও না।

এক মাস হইতে লিওর অন্তরে সুখ নাই, কিন্তু সম্মান ছিল, আত্মগৌরব তাহাকে

পর্বতের মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ সে প্রথম দেখিয়াছে যে, তাহারই আত্মগৌরব তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, আত্মা বিদ্রোহী হইয়াছে, মন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। মেরিকে সে ভালবাসিত, কারণ মেরিও তাহাকে ভালবাসিত ;—এটা বেশ কথা ; তার পর সে রাগ করিল, কথা না শুনিয়া অবাধ্য হইয়া পড়িল, আর তাহার ভালবাসা নাই—লিও মনে স্থির করিল সেও আর বাসিবে না, তবে একটা পদার্থকে এতদিন পরে বিনাশ করিতে হইলে ক্লেশ বোধ হয়, লিওরও ক্লেশ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু সে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করিল যে, স্ত্রীচরিত্র সহজে বুঝা যায় না, মেরিকেও সে একজন্ত বুঝিতে না পারিয়া ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল যাহা হউক এখন সংশোধন করিলেই হইবে। সে আপনাকে শোধরাইয়া লইল, তবে মধ্যে মধ্যে দুঃখ হয়, মধ্যে মধ্যে হাসিও পায়, এমন হইয়াই থাকে, একজন্ত কোন ক্ষতি নাই। সে আপনাকে সংযত করিয়া, জগতের যাবতীয় দুর্ভাবনা, দুঃখ, ক্লেশ দূর করিয়া দিয়া, পরম আনন্দে সমস্ত অন্তরাত্মা এই পুস্তকখানির উপর ন্যস্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে 'ইভা'র চরিত্র গড়িতেছিল। লিখিয়া শেষ করিতে পারিতেছিল না - গুণের কথা লিখিতে বুঝি স্বর্গও ফুরাইয়া যাইবে, রূপের মাধুরী বর্ণনা করিতে বুঝি স্বয়ং সজীব প্রকৃতিদেবীকে টানিয়া আনিয়া ইভার চতুর্দিকে জড়াইয়া দিতে হইবে ; তাহার হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি আঁকিবার আনন্দে লিওর আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল, এই এক মাস ধরিয়া দারুণ পরিশ্রমেও এক তিল ক্লান্তি বোধ করে নাই, তথাপি এ চিত্র শেষ হইতেছে না, মনে হয় যদি অব্যক্ত, অজানিত দুটো কথা কেহ বলিয়া দিতে পারিত,—সে দেবী হৃদয়ের গোটা-দুই গুপ্ত কথা কিছুতেই বুঝিতে আসিতেছে না, তাহা যদি পরিস্ফুত হইত তাহা হইলে এ স্বর্গচিত্র কোন স্বর্গীয় দেবীর হস্তে পরমানন্দে সমর্পণ করিয়া, লিও তাহার এ জীবনের সমস্ত বাসনা, সমস্ত আশা কাগজ কলম যাহা কিছু আছে সমস্তই উৎসর্গ করিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে বাকী জীবনটা চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিত। আজ প্রাতঃকাল হইতে লিও এই লিখিত চিত্রখানি ভাল করিয়া দেখিতেছিল ; সহসা মনে হইল, লোকটিকে যেন সে কোথায় দেখিয়াছে, যেন এ দেবী-প্রতিমার সহিত কখন কোন স্বপ্নরাজ্যে দেখাশুনা হইয়াছিল, একটু বোধ হয় পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু সে আর নাই, দেখাশুনা হইলে হয়ত বা চিনিতে পারা যায়, কিন্তু মুখখানি মনে পড়িতেছে না। প্রাতঃকাল হইতেই সে এ-কথা ভাবিতেছিল।

এখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে ; আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, বাগান ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে—লিও তাহার মধ্যে বসিয়া। দুই ফোঁটা অশ্রুর শেষ বিন্দুটি এখনও গণ্ড ছাড়ায় নাই—বুকের উপর হয়ত এইবারে পড়িবে। লিও ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, ভগবান্! এত পরিশ্রম করিয়া কি শেষে মেরির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি ?

দিবানিশির এই গভীর একান্ত চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, আনন্দ, আশা, ভরসা কি সব মেরির পদতলে লুটাইয়া দিয়াছি? কি করিতে কি করিয়াছি, ভগবান! লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অবমানিত—আমাকে কি শেষে মেরির চিরদাস করিয়া দিয়াছ? হৃদয়, মন, চিন্তাশক্তি, কল্পনা—সমস্ত অযাচিত তাহাকে দিয়া আমি কি শূন্যগর্ভ জড় পুতুলের মত হইয়াছি? সে চাহে না, আমি চাই। সে পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, আমি ধূলায় মত পদতল জড়াইয়া আছি। ছুটিয়া আসিয়া লিও গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

৯

এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয় নাই, মেরি চার্লসকে হঠাৎ বলিল, তুমি আমার একটা উপকার করিতে পারিবে? আজ মেরির চক্ষু দুটা কতকটা উন্মাদের মত চক্‌চক্‌ করিতেছে।

চার্লস কহিল, কি রকম উপকার?

মেরি একটু থামিয়া বলিল, তবে শোন, তোমাকে বুঝাইয়া বলি;—আমার বুকের মাঝখানে একটা ছোট্ট অতি ক্ষুদ্র কাঁটা ফুটিয়াছে। বাহির হইতে দেখা যায় না, বড় ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদা খচ্‌খচ করিতেছে—এক বিন্দুও সুখ পাই না; তুমি তুলিয়া দিতে পারিবে?

চার্লস ভাবিল, কি রকম! বলিল, কেমন করিয়া কবে ফুটিল?

মেরি মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাও শুনিবে? শোন, কিন্তু বোধ হয় বুঝিতে পারিবে না। ছেলেবেলায় একটা গোলাপ ফুল লইয়া খেলা করিতাম, তাতে একটা কাঁটা ছিল—দেখিতে পাই নাই। তার পর মনে হয় কোনদিন বুঝি ঘুমের ঘোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম—কাঁটাটি ফুটিয়া গিয়াছে। ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে—এখন কাঁটাটি বাহির করিয়া ফেলিতে চাই,—তুমি পারিবে?

চার্লস কিছুই বুঝিল না। মন-রাখা গোছ কহিল, বোধ হয় পারিব; কিন্তু কাঁটা খুব ছোট ত?

হ্যাঁ, খুব ছোট, কিন্তু সাবধান, অনেকখানি বুকের রক্ত মাংস না কাটিলে আর বাহির হইবে না। হয়ত বা প্রাণে বাঁচিব না—সাবধানে তুলিবে ত?

চার্লস ভয় পাইল। কহিল, তবে ডাক্তার ডাকাও।

মেরি হাসিল। বলিল, ডাক্তার ডাকিতে লজ্জা বোধ হইবে—বুকের মাঝে কিনা—তাই।

চার্লস চিন্তা করিয়া কহিল, আমি বোধ হয় পারিব না।

মেরি ভ্রূকুঞ্চিত করিল—যদি পারিবে না, তবে মনে মনে লুকাইয়া আমাকে কামনা কর কেন?

চার্লস শুকাইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল ঘরে অপর কেহ নাই; একটু সাহস হইল, বলিল—তোমাকে দেবতাও কামনা করেন—আমি ত সামান্য মনুষ্য মাত্র!

মেরি অন্যমনস্কভাবে কহিল, কিন্তু একজন আমাকে কামনা করে না। সে বোধ হয় দেবতারও উচ্চে। তাহার পর তাহার অন্য ভাবোদয় হইল। অমনি কঠিন কটাক্ষে চার্লসের পানে চাহিয়া বলিল, দেখ, সে কাঁটাটি যদি একবার হাতে পাই, তা হলে এমনি করিয়া পদাঘাত করি—এক ফোঁটা কাঁটা নিমেষে পরমাণু হইয়া যায়, কিন্তু হাতে পাই না—বুকের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া আছে!

চার্লস বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। মনে হইতেছে—বুঝি ঠিক কাঁটার কথা নহে, কিন্তু ভাল পরিষ্কারও হইতেছে না। সাতপাঁচ ভাবিয়া কহিল, ডাক্তার দেখাইলে হানি কি?

মেরি প্রথমে হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু পরক্ষণেই মলিন হইয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, আমার যেমন পোড়াকপাল, তাই তোমাদের সঙ্গে কথা বলি—সোনার পাত্র ছাড়িয়া আমি মাটির পাত্র লইয়াছি; তৃপ্তি হইবে কেন?

চার্লসের রাগ হইল, কিন্তু ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

মেরি তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসিল, মনে মনে কহিল, এরা আমাকে কত ভয় করে।

সেদিন সমস্ত দুপুরবেলা সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রে শয্যার উপর জাগিয়া পড়িয়া রহিল। প্রভাতে কোচমানকে ডাকাইয়া বলিল, গাড়ি সাজাও—মিঃ বাথের বাড়ি যাইব।

মিঃ বাথ ক্যাপ্টান নোলের এটর্নি। মেরি দ্বারে গাড়ি দাঁড় করাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ বাথ একরাশি কাগজপত্র টেবিলে রাখিয়া কাজ করিতেছিল। মেরিকে সহসা অফিসে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া উপবেশন করাইয়া বলিল, এত সকালে?

কাজ আছে। কর্নেল হ্যারিংটন আমার পিতার নিকট কত টাকা কর্জ লইয়াছিল?

মিঃ বাথ খাতাপত্র দেখিয়া হিসাব করিয়া বলিল, আট হাজার পাউণ্ড।

বেশ! সুদে আসলে আজ পর্য্যন্ত তাহা কত হয়, শীঘ্র হিসাব করিয়া দাও।

সে হিসাব করিয়া বলিল, আজ পর্য্যন্ত প্রায় বারো হাজার দুই শত পাউণ্ড হয়।

মেরি হস্তে হস্ত টিপিয়া বলিল, খুব ভাল, জোঁক যেমন রক্ত শুষিয়া লয়, তেমনি করিয়া হিসাব করিয়াছ ত?

বৃদ্ধ ভয় পাইল বলিল, হাঁ, সেইমত।

আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে আমার এই টাকা চাই—বুঝিলে?

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। এ কি কথা? সাত দিনের মধ্যে এত টাকা কে দিবে?

মেরি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, তাহার পুত্র দিবে। না পারে—তাহার বাটী ঘর-দ্বার সমস্ত বিক্রী করিয়া লইব।

বৃদ্ধ ভাবিল ভিতরে কিছু ঘটিয়াছে; তথাপি বলিল, এই সেদিন পুস্তক বিক্রয় করিয়া আমার নিকট দু হাজার পাউণ্ড জমা দিয়া গিয়াছে। আর তাহার কিছু নাই। সেদিন বলিয়াছিল যে, সম্ভবতঃ আর দুই-তিন বৎসরের মধ্যে বাকী টাকা পরিশোধ করিবে। কিন্তু এত তাড়াহড়া করিলে তাহার বাড়ি বিক্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

মেরি আগ্রহের সহিত বলিল, বাটি বিক্রয় হইবে?

বোধ হয়।

হয় হউক উত্তম কথা। আমার টাকা চাই। সাত দিনের মধ্যে—না হয় নালিশ করিও।

বৃদ্ধ অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু এমনটি দেখে নাই। বলিল, অত অল্প বয়সে তাহাকে পথের ভিখারী করিবে? কাহাকেও দেশত্যাগী করা উচিত কি?

মেরি চক্ষু রাঙ্গাইল। টাকা তোমার নয়, আমার। আমি তাহাকে পদতলে টানিয়া লইতে চাই।

শেষ কথাটা বৃদ্ধ ভাল শুনিতে পাইল না, বলিল, কি করিতে চাও?

কিছু না। শুধু টাকা চাই। আজ নোটিশ দাও—ঠিক সাত দিনের দিন।

১০

নোটিশ পাইয়া লিওপোল্ডের সমস্ত সংসার অন্ধকার বোধ হইল। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়াও সে কূল দেখিতে পাইল না।

প্রাতঃকালে, মেরি আপনার কক্ষে বসিয়া রক্তবর্ণ চক্ষু নত করিয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া কহিল, নীচে লিও দাঁড়াইয়া আছে।

মেরি মুখ তুলিয়া বলিল, কে ?

লিও।

দূর করিয়া দাও। ভৃত্য ভাবিল, মন্দ নয়। সে চলিয়া যাইতেছিল—মেরি তাহাকে ডাকিয়া কহিল—দাঁড়াও—দূর করিয়া দিও না। সে বড় অভিমানী—অপমান সহিতে পারে না—মিষ্টি কথায় যাইতে বলিও। বলিও, আমি বাড়ি নাই ;—দেখিয়ো কিছুতে যেন সে বুঝিতে না পারে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখা করিলাম না। বুঝিলে ?

ভৃত্য ঘাড় নাড়িল। সে লিওকে খুব চিনিত ; বাটীর সকলেই চিরকাল তাহাকে সম্মান করিয়াছে ; মেরি আজ্ঞা করিলেও, কেহ তাহাকে অপমান করিতে পারিত না। সে নীচে চলিয়া গেল।

নিঃশব্দে পদক্ষেপে মেরি ভৃত্যের পশ্চাতে নামিয়া আসিল। ঈষৎ উন্মোচিত দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিল লিও দাঁড়াইয়া আছে। মুখ শীর্ণ, যেন কিছু পীড়িত। ভৃত্য কহিল, তিনি বাটী নাই।

কোথায় গিয়েছেন ?

ভৃত্য বুদ্ধি করিয়া বলিল, কাল রাত্রে লণ্ডন গিয়াছেন।

কবে আসিবেন ?

জানি না। বোধ হয় কাল।

নিকটস্থ একটা চেয়ারের উপরে লিও বসিয়া পড়িল। শরীর নিতান্ত পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছিল।

ভৃত্য তাহা অনুমান করিয়া বলিল, বসুন। আপনাকে বড় শ্রান্ত বোধ হইতেছে। এক গ্লাশ বিয়ার আনিয়া দিব কি ?

লিও বলিল, না।

ভৃত্য ছাড়িল না। বলিল, শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে। বিয়ারে উপকার হইবে।

লিও অল্প হাসিয়া ধন্যবাদ দিয়া কহিল, আমার দুই দিন হইতে জ্বর হইয়াছে, দুই দিন উপবাসী আছি—তাই এমন বোধ হইতেছে।

এই সময় কপাট-জোড়াটা খুব দুলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। লিও চাহিয়া দেখিল—ও কি !

ভৃত্যও চাহিল—বোধ হয় বাতাস।

মেরি পা টিপিয়া দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

এই গ্রামে টমাস হগ বলিয়া একজন মহাজন বাস করিত। লিওপোল্ড বরাবর তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিয়া বলিল, হগ, আমার বাটী বিক্রয় হইবে. তুমি কিনিবে ?

হগ বিস্মিত হইয়া বলিল, বাটী বিক্রয় করিবে ? কেন ?

সে কথা না শুনিলে কিনিবে না ?

নিশ্চয় নয়। কিন্তু কত টাকায় বিক্রয় করিবে ?

তের হাজার পাউণ্ড পাইলেই বিক্রয় করিব।

এত টাকা ? কি প্রয়োজন ?

বলিতেছি। পিতা Captain Noll-এর নিকট আট হাজার পাউণ্ড লইয়া বাটী বন্ধক রাখিয়াছিলেন। সুদে আসলে তাহা প্রায় চৌদ্দ হাজার হইয়াছে। দুই হাজার পাউণ্ড পরিশোধ করিয়াছি—আর বার হাজার বাকী আছে। তাহাই পরিশোধ করিতে চাই।

Thomas Hogg মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। উঃ—তাঁহারা দুজনে বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তবুও এত সুদ ! আমরাও যে এত লই না।

লিও উত্তর দিল না। বলিল, কিনিবে ?

কিনিতে পারি, কিন্তু তত টাকা দিতে পারি না। বার হাজারের বেশী কিছুতেই নয়।

লিও চিন্তা করিয়া বলিল, আমার অনেক আসবাব আছে—তা' ছাড়া এক ঘর পুস্তকও আছে, সমস্ত লইয়াও কি তের হাজার দেওয়া যায় না ?

হগ কহিল, যায়। কিন্তু বাটী বন্ধক আছে, তুমি যে টাকা পরিশোধ করিবে, তাহার প্রমাণ কি ?

লিও হাসিল। আমাদের বংশে কেহ চুরি করে নাই—আমিও চোর নহি। তোমার বিশ্বাস না হয়, আমার সহিত এস, বণ্ড তোমার হাতে দিব।

হগ বিশ্বাস করিল। সমস্ত টাকা গুনিয়া দিয়া বলিল, কাল রেজেষ্ট্রী করিয়া দিও, কিন্তু এক কথা বলি, যদি কখন তোমার টাকা সংগ্রহ হয় আমার নিকট আসিও, তোমার বাটী তোমাকেই ফিরাইয়া দিব।

সে রাত্রে লিওর পুরাতন ভৃত্য দুইটি বড় বেশী রকম কাঁদিতে লাগিল। আকস্মিক এরূপ সংবাদে তাহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। প্রত্যেকে ছয় মাসের করিয়া অধিক বেতন পুরস্কার পাইয়াছে, তথাপি কাঁদিতে ছাড়িল না। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া বাঁধা হইল, বাকী যাহা রহিল, হগের লোক তাহা বুঝিয়া লইল। কাল সপ্তদিন পূর্ণ হইবে, পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া লিও কাল জন্মের মত কোরেল গ্রাম ছাড়িয়া

যাইবে, চিরপুরাতন ভৃত্যেরা তাই কাঁদিয়া শেষ করিতে পারিতেছে না। লিও তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছে—যদি বাঁচিয়া থাকি তুই বৎসরের মধ্যে আবার আমার কাছে আসিতে পাইবে। লিওকে তাহারা বাল্যকাল হইতে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিত সেইজন্য কতক শান্ত হইয়াছে।

লিও ভাবিতেছে, জনক-জননীর মুখ, মেরি, তাহার জননী, পুস্তকের রাশি, ফুলের বাগান, তাহার চিরসহচর ঐ ক্ষুদ্র পাঠাগার—আর ভাবিতেছে মেরি তাহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছে।

দুশ্চিন্তা ও নানা কারণে সে রাত্রে তাহার প্রবল জ্বর বোধ হইল। সমস্ত রাত্রি একরূপ অচৈতন্য অবস্থায় কাটিল, দ্বিপ্রহরের পর জ্বরত্যাগ হইল, কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্বল। সামান্য জিনিসপত্র যাহা সাথে লইয়াছিল তাহা স্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া নোটের তাড়া সাথে লইয়া মেরির গৃহে উপস্থিত হইল।

মেরি উপরে বসিয়া ছিল, ভৃত্য সংবাদ দিল, লিও টাকা লইয়া আসিয়াছে। মেরি Bond লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু টাকার কথায় সে আদৌ বিশ্বাস করে নাই, এবং এজন্য আপনাকেও প্রস্তুত করে নাই। সমস্ত দিন ধরিয়া সে এইরূপ একটা কল্পনা করিতেছিল, সে ভাবিতেছিল আজ তাহার চিরবাঞ্ছিত ধরা দিবে, আজ তাহার উচ্ছৃঙ্খল অতৃপ্তি পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। তখন সে কি করিবে, কেমন করিয়া আপনার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া সে সময়ের প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু মাথায় পাতিয়া লইবে তাহাই স্থির করিয়াছিল। ঋণ পরিশোধ করিয়া লিও যে তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, এ দূরদৃষ্টের এক বিন্দুও তাহার মনে উদয় হয় নাই। লিও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে, কেননা সবাই করিয়াছে। এতদিন যে করিতেছিল না সে কেবল তাহার মূর্খতার ফল।

মেরি উপায়সিদ্ধির জাল বুনিতেছিল, কিন্তু এতদিন তাহা পারিয়া উঠে নাই—এক দিক বুনিতে অন্য দিকের সূতা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু এতদিনে দুই দিকে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া চমৎকার জাল তৈয়ার হইয়াছে, এবার শিকার ধরা পড়িবেই।

কতকটা হৃষ্টচিত্তে মেরি নামিয়া আসিল। বসিবার কক্ষে লিও দাঁড়াইয়াছিল। আসিয়াই দেখিল তাহার হাতে একতাড়া নোট রহিয়াছে, মেরি কাঠের মত হইয়া গেল। লিও হাসিয়া হস্তগ্রহণ করিল। মেরি মুখ অবনত করিল। মনে হইল হাত বুঝি বড় উষ্ণ, আর এ হাসি বুঝি উপহার দিবার জন্য কাহারো নিকট চাহিয়া আনিয়াছে।

লিও কহিল, টাকা নাও। আজ সাত দিনের শেষ দিন।

মেরি হাত পাতিল। লিও একে একে নোটের তাড়া গুনিয়া দিয়া বলিল হইয়াছে!

মেরি পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িয়া Bond ফিরাইয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে তাহার সমুদয় কৌশল, আশা, ভরসা সমস্ত কাটিয়া গিয়াছে—ভিতরের হৃৎপিণ্ডও কাটিবার উপক্রম করিতেছে; শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া এ সময়ে সে প্রাণপণে সচেতন রহিল; এ সময়ে অচেতন হইলে চলিবে না।

লিও কহিল, আজ বোধ হয় এই শেষ। শেষ সময়ে তোমাকে দুটো কথা বলিতে চাই শুনিবে কি?

মেরি মাথা নাড়িয়া বলিল, শুনিব।

তবে এ কথাটি রাখিও। কাহাকেও সৎ দেখিয়া শীঘ্র বিবাহ করিও; তোমার অর্থ আছে—অর্থের জন্য ভাবিও না; শুধু সৎ এবং উচ্চ দেখিয়া কাহাকেও বিবাহ করিয়া সুখী হইয়ো;—এরূপ ধনসম্পত্তি লইয়া অরক্ষিতা অবস্থায় বেশি দিন থাকিয়ো না।

মেরি একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়া লিওর মুখপানে চাহিয়া অবনত হইল।

লিও কহিল, আর একটি কথা! এই সময়ে দুজনেই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আর একটি কথা,—মনে রাখিও, লজ্জা যেমন স্ত্রীলোকের ভূষণ, অভিমানও তাই, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে বড় কুফল ঘটে।

এ কথা তাহাকে শিখাইতে হইবে না। জগতের মাঝে এ সত্য আজ মেরি অপেক্ষা বোধ হয় কেহই অধিক বুঝে না।

তার পর পাঁচটা বাজিল. ঘড়ির পানে চাহিয়া লিও বলিল, তবে যাই—আমার সময় হইয়াছে।

চলিয়া যায় দেখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বহু ক্লেশে মেরি কহিল—একটি কথা বলিয়া যাও—

লিও ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কি কথা?

এত টাকা কোথায় পাইলে?

লিও মৃদু হাসিল। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কোন্ কথা তুমি জান না?

কি জানি? অমন গান গাহিতে জান তাহা কি কখন বলিয়াছিলে?

লিও এবার যথার্থই হাসিয়া ফেলিল—কই, তুমি ত কখন জিজ্ঞাসা কর নাই? জিজ্ঞাসা করিলে কত গান শুনাইয়া দিতে পারিতাম, এতদিনে হয়ত তুমিও আমার মত শিখিতে পারিতে।

মেরি কহিল, সে কথা নয়, টাকা কোথায় পাইলে বল?

কোথায় আর পাইব? পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যে তাহাই ব্যয় করিলাম। বাড়ি, ঘর, ফুলবাগান, আমার একরাশি পুস্তক—যাহা কিছু ছিল প্রায় সমস্তই বিক্রয় করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছি।

মেরি কঠিন দৃষ্টিতে মুখপানে চাহিয়া বলিল—বেচিয়াছ?

সব।

থাকিবে কোথায়? খাইবে কি?

আপাততঃ লণ্ডনে যাইতেছি—সেখানে কোন কার্য্য খুঁজিয়া লইব। আশা আছে সমস্ত দিন উপবাস করিতে হইবে না।

লণ্ডনের কোথায় থাকিবে?

দিন-কতক বোধ হয় হস্‌পিটালে থাকিব, তাহার পর যাহা হয় করিব।

সেখানে কেন?

সেখানে কিছুদিন কাটাইতে হইবে বলিয়া অনুমান করিতেছি। আজ চার দিন হইতে জ্বর হইয়াছে, কিছুতেই সারিতেছে না,—সত্য লণ্ডনে গিয়া যে ভাল থাকিব এ আশাও করি না, টাকাকড়িও সঙ্গে অধিক নাই,—সে অবস্থায় কোথায় আর যাইব বল?

মেরি শিহরিয়া উঠিল। অ্যাঁ—আজ চার দিনের জ্বর গায়ে নাই?

কই আর সারিয়াছে।

এক দণ্ডে মেরির সমস্ত মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কাতরতা, বিষাদ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান সে মুখে আর কিছুই রহিল না। শুধু বিশ্বব্যাপী প্রবল স্নেহ ও দিগন্তবিস্তৃত বিপুল শঙ্কা! প্রথমে সে হাত দিয়া লিওর কপোল স্পর্শ করিয়া, শরীরের উত্তাপ দেখিল—ভাল বুঝিতে পারিল না। তাহার পর দুই হস্তে লিওর মুখ নীচু করিয়া নিজের কপোল তার কপোলে সংলগ্ন করিয়া উত্তাপের স্তর অনুভব করিল; তাহার পর বিনা বাক্যব্যয়ে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। দৃপ্ত চক্ষে অমানুষিক আভা।

লিও সভয়ে বলিল, কোথা যাও?

যেখানে ইচ্ছা; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

লিও ভাবিল, এ কি!

মেরি বরাবরই তাহাকে টানিয়া লইয়া একেবারে উপরে উঠিল, তাহার পর আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। অট্টালিকার মধ্যে এই কক্ষটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং সজ্জিত। এক পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড দুর্মূল্য পালঙ্ক সজ্জিত ছিল, মেরি তাহার উপর লিওকে টানিয়া লইয়া বসাইয়া দিল। বালিশগুলি একত্র করিয়া বলিল, চুপ করিয়া এখানে শুইয়া থাক—।

চক্ষু ও মুখের ভাব দেখিয়া লিও পূর্ব্বেই কিছু ভীত হইয়াছিল, এবার নিতান্ত ভয়ের সহিত বলিল—আমাকে যে আজ যাইতে হইবে। সময় উত্তীর্ণ হইতেছে।

মেরি সে কথা শুনিতে পাইল বলিয়া বোধ হয় না। আপনার মনে একটা বহুমূল্য উষ্ণ শাল আনিয়া তাহার বক্ষ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিয়া বলিল,—লিও, এ সময়ে আমার সহিত কলহ করিলে চলিবে না। তুমি মনে করিয়াছ, ঋণ পরিশোধ করিয়াছ? কিছুই কর নাই। আজ নয়, ভাল হও, তাহার পর এ কথা বুঝাইয়া দিব। তোমার যখন শরীর অসুস্থ তখন ও শরীরে আমারই সর্ব্বময় অধিকার, আবার যখন ভাল হইবে তখন যাহা ইচ্ছা করিও—

লিও স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি কথা! ক্লিষ্ট শরীর মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঢলিয়া আসিতেছিল, অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে লিও জোর করিয়া কহিল, ছাড়িয়া দাও—আমি লণ্ডনে যাইব।

মেরি তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, লণ্ডনের কথা ছাড়িয়া দাও, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া শয্যার নীচে নামিলে, আমি এই ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িব। আমার মন এখন পাগলের মত হইয়া আছে, অবাধ্য হইলেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

লিও ধীরে ধীরে বলিল, তবে আর কি করিয়া যাইব। তাহার পর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

১১

পনর দিনের মধ্যে লিওর রীতিমত সংজ্ঞা হইল না; পনর দিন মেরি তাহার শয্যা ত্যাগ করিল না।

ডাক্তার বলিল, মেরি অত পরিশ্রম করিলে তুমিও পীড়িত হইয়া পড়িবে।

মেরি ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল, ডাক্তার মহাশয়, এ সময়ে আমি পীড়ার ভয় করি না, এ স্থান ত্যাগ করিলেই আমার পীড়া হইবে।

ডাক্তার বলিল, আমি ধাত্রী আনাইয়া দিতেছি—দুইজনে পালা করিয়া শুশ্রূষা কর।

মেরি মুখখানি আরও মলিন করিয়া বলিল, তাহা হইবে না। এ সময়ে আমার কাহাকেও বিশ্বাস হয় না। গোলাপ ফুল বাসী হইয়াছে, রৌদ্রের তাপে বড় নিস্তেজ

হইয়া পড়িয়াছে—এতটুকু আঘাতেই হয়ত ঝরিয়া যাইবে—তখন তুমি কি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবে?

নিরুত্তরে ডাক্তার চলিয়া গেল।

রোগ বেশী নহে, তথাপি লণ্ডন হইতে তিন-চারজন ডাক্তার মেরির বাটীতে এই পনর দিন ধরিয়া বসিয়া আছে। একদিন তাহারা বলিল, অনর্থক আর কেন আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছ—রোগ সারিয়া গিয়াছে।

মেরি তাহাদের হাত ধরিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল, ওগো, তোমরা আমার লিওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া আমার হাতে দিয়া—আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাও—মানা করিব না, কিন্তু এখন যাইও না।

তিন সপ্তাহ পরে লিওপোল্ড উঠিয়া বসিল। ডাক্তার এবং ঔষধের উপদ্রব আর নাই। মেরি জানালা খুলিয়া দিল—আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িল। মেরি চাঁদের পানে চাহিয়া সহসা লিওর বুকের উপর আসিয়া পড়িল। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বুকের উপরে অশ্রুসিক্ত করিল, তাহার পর চাঁদের পানে চাহিয়া বলিল, ঐ দেখ এখনও চাঁদের ভিতর কলঙ্ক বসিয়া আছে,—তোমারও কলঙ্ক তোমার বুকের উপর স্থান পাতিয়া বসিয়াছে, তাড়াইবে কি করিয়া?

লিওর চক্ষেও জল আসিল, সংবরণ করিয়া কহিল, কলঙ্কই হউক, শোভাই হউক—বুকের উপর বড় দৃঢ় বসিয়াছে, পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

*　　*　　*　　*

তাহার পর একদিন বসন্তপ্রভাতে কোরেল গ্রামের গির্জায় বড় ধুমধামের সহিত ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সমস্ত গ্রামবাসী বড় জাঁকজমকের সহিত প্রফুল্ল মনে সেই দিক-পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সেখানে কি হইতেছে তোমরা কেহ জিজ্ঞাসা করিবে কি?

বিবিধ রচনাবলী

ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য

আমি বক্তা নই। কিছু বলতে আমি আদপেই পারিনে। ঘরে বসে কাগজ-কলম নিয়ে লেখা এক ব্যাপার, আর বাইরে দাঁড়িয়ে বলা আর এক ব্যাপার। আপনারা আমার বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, অথচ কিছুদিন থেকে লেখা আমি একদম ছেড়ে দিয়েচি। সাহিত্য-সেবাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে করতে পারচিনে। আমার নিজের কথা ছাড়াও সমস্ত দেশের সাহিত্যে কত অসত্য কত পঙ্গুতা এসে পড়েছে। সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায়, মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিস দেবার জো নেই। ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের church আছে, navy আছে, army আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাবার জো নেই, ওদিক যাবার জো নেই, কোনদিকে একটু নড়চড় হয়েচে কি সব গোলমাল হয়ে যাবে। তারই মধ্যে যে একটু-আধটু পারে, সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

সাহিত্য স্বাধীনতা মানে অরাজকতা, anarchy নয়। এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে কারুর মনে ভয়ে জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে। 'সিডিশন' (sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে, ধর্ম্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত বাঁধা, পা গুটানো আর থাকবে না, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেইদিন আবার সাহিত্য-সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।*

* ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বরিশাল শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

সাহিত্য ও নীতি

শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণনগর নামটি আমার কাছে পরিচিত, এবং সে পরিচয় ঘটেছিল আমার পিতামহীর মুখের নানা বিচিত্র গল্প ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে। সাহিত্য-রসের সেই মধুর আস্বাদ এই প্রাচীন বয়সেও আমি ভুলি নাই। এই জনপদই যে একদিন শিল্পকলা ও সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল, আমি নিশ্চয় জানি, এ-কথা বললে অতিশয়োক্তির অপরাধ হয় না। বাঙলার মস্ত বড় দু' জন কবি—একজনের কর্ম্মভূমি ও অন্য জনের জন্মভূমি এই কৃষ্ণনগর। বঙ্গদেশের নানা সুখ-দুঃখের ইতিহাসে এই প্রাচীন নগর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ইহাকে চোখে দেখবার লোভ মনে মনে আমার চিরদিন ছিল। আজ সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর আহ্বানে সে সাধ আমার পূর্ণ হ'লো। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সাহিত্য-সেবাই আমার পেশা, কিন্তু ইহার যাচাই-বাছাই ঘষা-মাজার ব্যাপারে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ, একথা আমার মুখে অদ্ভুত শোনালেও ইহা বাস্তবিক সত্য। কোন্ ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় করে সাহিত্য-পদ নিষ্পন্ন হয়েচে, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, রসবস্তুটি কি, কাকে বলে সত্যকার আর্ট, কাকে বলে মিথ্যাকার আর্ট, কি ইহার সংজ্ঞা, আমি কিছুই এ-সকলের জানি না। সুদূর প্রবাসে কেরানীগিরি করতাম, ঘটনাচক্রে বছর-দশেক হ'লো এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েচি। খানকয়েক বই লিখেচি, কারও ভাল লেগেচে, অনেকেরই লাগেনি—পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারি ভারি কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে সপ্রমাণ করেছেন যে বাঙলা ভাষার আমি একেবারে সর্ব্বনাশ করে দিয়েচি। এত সত্বর এত বড় দুষ্কার্য্য কি করে করলাম তাও আমি বিদিত নই, কি-ই বা এর কৈফিয়ত সেও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সুতরাং তথ্যপূর্ণ গভীর গবেষণার লেশমাত্র আমার কাছে আপনারা আশা করবেন না।

বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া আমার স্বভাব নয়, আত্মপক্ষ সমর্থন করবার মত শক্তি বা উদ্যম কোনটাই আমার নেই, আমি শুধু আমার স্বল্পপরিসর সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির গোটাকয়েক সাদা-মাটা কথাই আপনাদের কাছে বলতে পারি। হয়ত বলার একটু প্রয়োজনও আছে। জবাবদিহির স্বরূপে নয়, কারণ পূর্ব্বেই বলেছি এ আমি করিনে, করার আবশ্যকতাও মনে করিনে,—এ কেবল একজন আধুনিক সাহিত্য-সেবকের নিতান্তই নিজের কথাটাই বলতে চাই। পরলোকের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু ইহলোকের মানবের জীবন-যাত্রাপথের যতদূরে দৃষ্টি চলে, দেখা

থায়, বিশ্বমানব একটা বস্তু লক্ষ্য করে নিরন্তর চলেচে —তার তিনটে অংশ—art. morality এবং ধর্ম—religion সংসারের সমস্ত মারামারি কাটাকাটি, একের রাজ্য অপরের কেড়ে নেওয়া, একজনের দুঃখের উপার্জ্জন অন্যজনের ঠকিয়ে নেওয়া,—সর্ব্ববিধ কাম ক্রোধ লোভ মোহ—এরা পথের জঞ্জাল, চলার কাঁটা,—কিন্তু মানবের যে বৃহত্তর প্রাণ, তার লক্ষ্য শুধু ওইখানে। মাড়বারী তার কাপড়ের দোকানে বসে একথা শুনলে হাসবে, বার্ড কোম্পানীর বড় সাহেব তার অফিসের টেবিলে এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না, stock-exchange এর ভীড়ের মধ্যে এ-কথা একেবারে মিথ্যে বলে মনে হবে, তবুও আমি জানি তাদেরও শেষ গতি ওইখানেই এবং এর চেয়ে বড় সত্যও আর নেই। কিসের জন্যে এত লোভ, এত মোহ? কিসের জন্যে এই বাদ-বিসংবাদ? কিসের জন্যে এমন ঐশ্বর্য্যের কামনা? সত্যকার যা ঐশ্বর্য্য সে চিরদিনই মানুষের নিত্য-প্রয়োজনের অতিরিক্ত। মানুষ একাকী তাকে অর্জ্জন করে, সঞ্চয় করে, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সে ঐশ্বর্য্য হয়ে দাঁড়ায় সেই মুহূর্ত্তেই সে তার একমাত্র আপন ভোগের বাইরে গিয়ে পড়ে! ঐশ্বর্য্যকে একাকী ভোগ করবার চেষ্টা করলেই সে আপনাকে আপনি ব্যর্থ করে দেয়। যা সর্ব্বমানবের একার, লোভ সেখানে পরাভূত হবেই হবে। আর এই ঐশ্বর্য্যের চরম পরিণতি কোথায়? সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনায়,—art, morality এবং ধর্ম্মে। একলার নয়, এ ঐশ্বর্য্য বিশ্বমানবের জেনে এবং না জেনে, মানুষের চেষ্টা মানুষের উদ্যম এই ঐশ্বর্য্য আহরণের দিকেই অবিশ্রাম চলেচে,—অতএব, যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art নয়, ধর্ম্ম নয়। Art for art's sake কথাটা যদি সত্য হয়, তা হলে কিছুতেই তা immoral, এবং অকল্যাণকর হতে পারে না; এবং অকল্যাণকর এবং immoral হলে art for art's sake কথাটাও কিছুতেই সত্য নয়, শত-সহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়। মানবজাতির মধ্যে যে বড় প্রাণটা আছে, সে একে কোনমতেই গ্রহণ করে না। সুতরাং, সত্যকার কবি বলে, যথার্থ artist বলে, যাকে এক হাতে গ্রহণ করব তার সৃষ্টিকে অন্যায় বলে, কুৎসিত বলে অন্য হাতে বর্জ্জন করা হতেই পারে না। বরঞ্চ চালাবার চেষ্টা করলেই সবচেয়ে বড় ভুল এবং বড় অন্যায়ই করা হয়।

কিন্তু এ ত গেল theory র দিক দিয়ে, আদর্শবাদের দিক দিয়ে। এর মধ্যে হয়ত তত বিবাদ নেই। কি কবির মধ্যে, artistএর মধ্যে, অর্থাৎ তার নিজের মধ্যেই যেখানে একটা ছোট মানুষ থাকে, হাঙ্গামা বাধে তাকে নিয়ে। এখানে লোভ, মোহ, যশ, নিন্দে, prejudice, সংস্কার মাঝে মাঝে এমন কুহেলিকা গড়ে তোলে যে, তার অন্ধকার আশ্রয়েই অনেক fraud, অনেক উৎপাত ঢুকে গিয়ে দারুণ উপদ্রবের ভিত্তি স্থাপন করে। এইখানেই হ'ল অসত্য এবং অকল্যাণের দ্বার। এই আঁধারে অধিকারী এবং অনধিকারী, কবি এবং অকবি, সুন্দর এবং কুৎসিত, কাদা

এবং নোঙ্‌রামিতে মিলে যে মন্থন শুরু করে দেয়, তার কাদাই ছিটকে উঠে নির্ব্বিচারে সকালের মুখে পাঁক মাখিয়ে দেয়। এ কাদা ধুয়ে দিতে পারে শুধু কাল। এর হাতেই শুধু অনাগত ভবিষ্যতে শুদ্ধ ও স্নাত হয়ে সত্যবস্তু মানুষের চোখে পড়ে। এইজন্যই বোধ হয় কবির মধ্যে যে অংশটুকু তাঁর কবি, এই চরম বিচারের প্রতীক্ষা করতে তাঁর বাধে না, কিন্তু যেটুকু তাঁর ছোট্ট মানুষ তারই কেবল সবুর সয় না। সে কলহ করে, বিবাদ করে, দল পাকায়, হাতনাগাদ নগদ মূল্যে চুকিয়ে না নিলেই তার নয়। সাময়িক কাগজপত্রে এই স্থানটাই তার বার বার ঘুলিয়ে ওঠে।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি স্কুল-মাস্টার নন,—তিনি কবি। বেত-হাতে ছেলে মানুষ করা তাঁর পেশা নয়। এই নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কটুকথার বিরাম নেই। কটুকথার মালিক যাঁরা তাঁরা বোধ করি কবির উক্তির এইরূপ অর্থ করেন যে, যেহেতু তিনি বেত-হাতে ছেলে মানুষ করতে সম্মত নন, গল্পচ্ছলে ভুলিয়ে বুড়ো ছেলেদের নীতিশিক্ষা দিতে চান না, তখন নিশ্চয়ই তাঁর ছেলে বইয়ে দেওয়াই অভিসন্ধি। কিন্তু কাব্য—যা সত্যকার কাব্য, সে যে চির-সুন্দর, চির-কল্যাণকর, কবির এই অন্তরের কথাটা তাঁরা উপলব্ধি করতেই চান না। এবং ওই-সব ফন্দি-ফিকিরের মধ্যেই যে কবি এবং কাব্য আপনাদের আপনি নিষ্ফল করে তোলে এই সত্যটাই তাঁরা বিস্মৃত হয়।

এই কথাটাই আমি গোটা-দুই দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিস্ফুট করতে চাই। আমার নিজের পেশা উপন্যাস-সাহিত্য, সুতরাং এই সাহিত্যের দু-একটা কথা বলা বোধ করি নিতান্তই অনধিকার-চর্চ্চা বলে গণ্য হবে না। যাঁরা আমার নমস্য, আমার গুরুপদবাচ্য, তাঁদের লেখা থেকে এক-আধটা উদাহরণ দিলে যদি-বা একটু বিরুদ্ধ মত থাকে, আশা করি আপনাদের কেহই তাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা বলে ভুল করবেন না। আমার সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির প্রসঙ্গে এর প্রয়োজন আছে। গোটা-দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, idealistic and realistic. আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি করে যে এই দু'টোকে ভাগ করে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে—এবং অনেক নোঙ্‌রা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র-সৃষ্টি কি এতই সহজ? আমাকে অনেকেই দয়া করে বলেন, মশাই, আমি এমন ঘটনা জানি যে, সে যদি আপনাকে বলি, ত আপনার চমৎকার একটা বই হতে পারে।

আমি বলি, তা হলে আপনি নিজেই সেটা লিখুন।

তাঁরা বলেন, তা হলে আর ভাবনা কি? ওইটে যা পারিনে।

আমি বলি, আজ না পারলেও দু'দিন পরে পারতে পারেন। এমন জিনিসটে খামকা হাতছাড়া করবেন না।

এরা জানেন না, সংসারে অদ্ভুত কিছু একটা জানাই সাহিত্যিকের বড় উপকরণ নয়। আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে, কিন্তু, বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই, -এ-বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাধে, কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতি পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্য সৃষ্টি হবে না।

আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ, হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না। ভালই হ'ল। হিন্দু-সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে, মনে হয় তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেচে।

অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, রোহিণীর চরিত্র আরম্ভ করবার সময়ে এ কল্পনা তাঁর ছিল না, থাকলে এমন করে তাকে গড়তে পারতেন না। কেবল প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে, সংগোপনে বারুণীর জলতলে আপনাকে আপনি বিসর্জ্জন দিতে পাপিষ্ঠাকে কবি এমন করে নিয়োজিত করতেন না।

গোবিন্দলালকে রোহিণী অকৃত্রিম এবং অকপটেই ভালবেসেছিল,—সমস্ত হৃদয়-প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে প য়নি তাও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী তার হওয়া চাই এবং হ'লও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট-পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে।

হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে, আর তার সঙ্গে সত্য সুন্দর art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না।

ঠিক এই অজুহাতেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমার 'পল্লীসমাজে'র বিধবা রমাকে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে বিদ্রূপ করে বলেচেন, "তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কিনা তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ।" এ ধিক্কার art-এর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর সামাজিক ধিক্কার art-এর রাজ্যে কতখানি মহামারী উপস্থিত করতে পারে তার আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের একটি ছোট গল্প আছে, তার plotটা অত্যন্ত সংক্ষেপে এইরূপ —নায়ক একজন বড়লোক জমিদার। Hero, অতএব, হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণ উচ্চ, নৈতিক বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম। কলকাতায় তাঁর একটা মস্ত বড় বাড়ি আছে; ভাড়া খাটে, দাম প্রায় লাখো টাকা। এক তারিখে বাড়িটা মাসখানেকের জন্য একজন ভাড়া নিলে। বাড়িওয়ালা জমিদার ত পাশের বাড়িতেই থাকেন, হঠাৎ একদিন রাত্রে তিনি ওই বাড়িটার ভেতর থেকে একজন স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। দিন-দুই পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বাড়িটার মধ্যে ভ্রূণহত্যা হয়েচে। কিন্তু ভাড়াটেরা বাড়িভাড়া না দিয়েই পালিয়েচে। তাদের ঠিকানা জানা নেই; পাপের দণ্ড দেওয়া অসম্ভব, তাই তিনি হুকুম দিলেন, বাড়িটা ভেঙেচুরে মাঠ করে দাও। পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে অতবড় লাখো টাকার বাড়ি ভেঙে মাঠ হয়ে গেল।

গল্প এইখানেই সমাপ্ত হ'ল। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন English-এর প্রবীণ অধ্যাপক এই গল্প পাঠ করে সাশ্রুনেত্রে বার বার বলতে লাগলেন, জীবনে এমন শিক্ষাপ্রদ সুন্দর গল্প আর পড়েন নাই এবং এমন গল্প বাঙলা-সাহিত্যে যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

এমন গল্প আমিও বেশী পড়িনি, সে-কথা অস্বীকার করিনে, এবং বাড়ি যখন আমারও নয়, অধ্যাপকেরও নয়, গ্রন্থকারেরও নয়, তখন যত ইচ্ছে ভেঙেচুরে মাঠ করে দিলেও আপত্তি নেই; কিন্তু art ও সাহিত্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁর মনে যে কি ভাবের উদয় হয়েছে, শুধু তিনিই জানেন।

ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে,—ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলায় কোন

artই কোনদিন আপত্তি করে না। কিন্তু দুনিয়ায় যা-কিছু সত্যই ঘটে, নির্ব্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয় না।

অর্থাৎ, যা-কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলিনে, তেমনি যা ঘটে না, অথচ সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে!

আমার অবসর অল্প, বক্তব্য বস্তুকে আমি পরিস্ফুট করতে পারিনি এ আমি জানি, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য রচনায় সমাজের এক শ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের মধ্যে কোথায় অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধের উদয় হয়েচে, বিরোধের আরম্ভ যে কোন্‌খানে, সেদিকে আঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করাটুকু বোধ করি আমার সম্পূর্ণ হয়েচে। কিন্তু আলোচনা ঘোরতর করে তোলবার আমার প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই। শুধু অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পথে কোথায় বাধা পেয়ে আমরা যে অন্য পথে চলতে বাধ্য হয়ে পড়েচি, সেই আভাসটুকু মাত্র আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম।

পরিশেষে, যে গৌরব আজ আমাকে আপনারা দিলেন, তার জন্যে আর একবার অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে এই ক্ষুদ্র ও অক্ষম প্রবন্ধ আমি শেষ করলাম।*

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দ ১০ই আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি

আমি জানি, সাহিত্য-শাখার সভাপতি হবার যোগ্য আমি নই, এবং আমারই মত যাঁরা প্রাচীন, আমারই মত যাঁদের মাথার চুল এবং বুদ্ধি দুই-ই পেকে সাদা হয়ে উঠেছে তাঁদেরও এ-বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নেই। কারো মনে ব্যথা দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, তবুও যে এই পদ গ্রহণে সম্মত হয়েছিলাম, তার একটি মাত্র কারণ এই যে, নিজের অযোগ্যতা ও ভক্তিভাজনগণের মনঃপীড়া, এত বড় বড় দুটো ব্যাপারকে ছাপিয়েও তখন বারংবার এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল যে, এই অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা নবীনের দল আজ জয়যুক্ত হয়েচেন। তাঁদের সবুজ-পতাকার আহ্বান আমাকে মানতেই হবে, ফল তার যাই কেন না হউক। আর এ প্রার্থনাও সর্ব্বান্তঃকরণে করি, আজ থেকে যাত্রাপথ যেন তাঁদের উত্তরোত্তর সুগম এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ষোল বৎসর পূর্ব্বে বাঙলার সাহিত্যিকগণের বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন যখন প্রথম আরম্ভ হয়, আমি তখন বিদেশে। তারও বহুদিন পর পর্য্যন্তও আমি কল্পনাও করিনি যে, সাহিত্য-সেবাই একদিন আমার পেশা হয়ে উঠবে। প্রায় বছর-দশেক পূর্ব্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ওএকান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।

বাঙলার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই বছর-দশেকের ঘটনাই আমি জানি। সুতরাং এ-বিষয়ে বলতেই যদি কিছু হয় ত এই স্বল্প কয়েকটা বছরের কথাই শুধু বলতে পারি।

মাস কয়েক পূর্ব্বে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া হয় ত অভিভাষণের বদলে তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও। অভিভাষণের পরিবর্ত্তে গল্প! আমি একটু বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু উত্তর দিয়েছিলেন, সে ঢের ভাল।

এর অধিক আর কিছু তিনি বলেননি। এতদিন বৎসরের পর বৎসর যে সাহিত্য-সম্মিলন হয়ে আসচে, হয় তার অভিভাষণগুলির প্রতি তাঁর আগ্রহ নাই, না হয় আমার যা কাজ সেই আমার পক্ষে ভাল, এই কথাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। একবার ভেবেছিলাম, লক্ষ্ণৌ যখন যাওয়াই হ'ল না, তখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই তাঁর আদেশ পালন করব। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে পারলাম না। কিন্তু আজ এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর লেখা পড়তে উঠে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, সেই আমার ঢের ভাল ছিল। একজন সাধারণ সাহিত্য-সেবকের

পক্ষে এত বড় সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

বঙ্গসাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। সেই সেই বিভাগীয় সভাপতিদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ. বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং মার্জ্জিত; তাঁদের কাছে আপনারা অনেক নব নব রহস্যের সন্ধান পাবেন, কিন্তু আমি সামান্য একজন গল্প-লেখক। গল্প-লেখার সম্বন্ধেই দু'একটা কথা বলতে পারি, কিন্তু সাহিত্যের দরবারে তার কতটুকুই বা মূল্য? কিন্তু সেটুকু মূল্যও আমি আপনাদের নির্ব্বিচারে দিতে বলিনে, কোনদিন বলিনি, আজও বলব না। এ শুধু আমার নিতান্তই নিজের কথা, যে-কথা সাহিত্য-সাধনার দশ বৎসরকাল আমি নিঃসংশয় অকুণ্ঠিত চিত্তে ধরে আছি।

এই দশ বৎসরে একটা জিনিষ আমি আনন্দ ও গর্ব্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠকসংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেচে। আর তেমনি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নাই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেচে। প্রথমটা সত্য, এবং দ্বিতীয়টা সত্য হলে ইহা দুঃখের কথা, ভয়ের কথা; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের আর যা উপায়ই থাক্, সাহিত্যিকদের কেবল কটু কথার চাবুক মেরে মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দ-মত ভাল ভাল বই লিখিয়ে নেওয়া যাবে না। মানুষ ত গরু ঘোড়া নয়! আঘাতের ভয় তার আছে একথা সত্য, কিন্তু অপমান-বোধ বলেও যে তার আর একটা বস্তু আছে এ-কথাও তেমনই সত্য। তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ফরমায়েসী বই আদায় করা যায় না। মন্দ বই ভাল নয়, কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্যে সাহিত্য সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করে ফেলা সহস্র গুণ অধিক অকল্যাণকর।

কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেচে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়, তাই এই কথাটাই আজ আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। এ কেবল আলোচনার জন্যেই আলোচনা নয়, এই শেষ কয় বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস-মুখ ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটুক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দিরপথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কাজ শেষ করে তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি প্রায় সকল

বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কি না, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।

আর্টএর জন্যই আর্ট, এ-কথা আমি পূর্ব্বেও কখনও বলিনি আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন।

সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা বুঝান যায়। আমি এই দিকটাই আজ বিশেষ করে আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত করতে চাই। বিষ্ণুশর্ম্মার দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত আমরা গল্পের মধ্য থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে কোন ত্রুটি হলে আর আমরা সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এই দিককার বাঁধ ভেঙেই তা হুঙ্কার দিয়ে ছোটে। প্রশ্ন হয়, কি পেলাম কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হ'ল? এই লাভালাভের দিকটাতেই আমি সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দিতে চাই।

মানুষ তার সংস্কার ও ভাব নিয়েই ত মানুষ, এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য-সেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়ে কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই, নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করবার। পড়বা-মাত্রই মন তাঁর তিক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্নমেণ্টের সাহায্যে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হ'ল বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনে কোন সাহিত্যসেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না। হয়ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না, হয়ত, তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তায় অত্যন্ত ভয় ছিল; যেজন্যই হউক, সেদিনের সে ভাবধারা সেখানেই রুদ্ধ হয়ে রইল সমাজদেহের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হ'ত এমন উদাসীন হয়ে যদি তারা না থাকতেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন—সকলই তাঁহাদিগকে সইতে হ'ত, সত্য, কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সেদিনের হিন্দুর চক্ষে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কার্য্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হ'ত আজ

অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়ে যেত। এমনই ত হয়, সাহিত্য-সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। সে জানে, আজকাল লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে, হউক সে শত বর্ষ পরে, কিন্তু সেদিনের ব্যাকুল ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে; শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের সমালোচনা করবার জন্যও আমি দাঁড়াইনি। আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়া দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলচে, মানব মানবার যাত্রা পথের সীমা আজও তেমনিই সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্ত্তি তেমনিই অনিশ্চিত, তেমনই অজানা। শুধুই কি কেবল তার কর্ত্তব্য ও চিন্তার ধারাই চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে? বিচিত্র ও নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশ যেতে হবে,—তার কত রকমের সুখ, কত রকমের আশা-আকাঙ্খা, থামবার জো নেই, চলতেই হবে,—শুধু কি তার নিজের চলার উপরেই কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না? কোন্ সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হয়ে গেছে! যাঁরা বিগত যাঁরা সুখ-দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তর গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, চিন্তা, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জ্জরিত, তাঁদের আশা তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ করে থাকবে? তরুণ-সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বলতে চায়! তাঁদের চিন্তা, ভাব আজ অসঙ্গত, এমন কি, অন্যায় বলেও ঠেকতে পারে, কিন্তু তাঁরা না বললে বলবে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নরনারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি করে?

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্ত্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সংবর্দ্ধনার আসন পাতা আছে।

কিন্তু তাই বলে আমরা সমাজ-সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি, অবিনয় মনে করে আপনারা অপরাধ নেবেন না। 'পল্লীসমাজ' বলে আমার একখানা বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে

হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এতবড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও ত আছে! ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোনকালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এতবড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ-জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হয়ে যেত।

আগেকার দিনে বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক্ দুর্নীতির নালিশ ছিল না; ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয়নি। এটা এসেচে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানাদিক দিয়ে এই জিনিসটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হয়ে উঠেচে।

নেহাত মিথ্যে বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোটখাট কারণ থাকলেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নর-নারীর বহু মিথ্যা, কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয় কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেচে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই propaganda চালানর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনায় সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও

যে তার যথার্থ চিন্তার বহু বস্তু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে-ই তাদের সমস্ত জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধ সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মত পাপ অল্পই আছে। আপাত-প্রয়োজন যাই থাক্, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে একে মুক্তি দিতেই হবে। সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্ত্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না, একথা কোনমতেই ভোলা উচিত নয়।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেচি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেচে। এ সত্য নীতি-পুস্তকে স্বীকার করবার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পচ্ছলে এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয় ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ট প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ-কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

সাহিত্যেও সুশিক্ষা, নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত করে এলাম। যেটা তার চেয়েও বড়,—এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য্য, নানা কারণে তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না। শুধু একটা কথা বলে রাখতে চাই যে, আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই, এ-কথা কোনমতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হতে পারে; কিন্তু ইহাই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক সাহিত্য-সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

আর একটিমাত্র কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরেজীতে idealistic ও realistic বলে দুটো বাক্য আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেচেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেচে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না; অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে

কতটা কোন্ ধার ঘেঁষে চলবে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্ব্বের মত রাজরাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।

কিন্তু আর না। আপনাদের অনেক সময় নিয়েচি, আর নিতে পারব না। কিন্তু বসবার আগে আর একটা কথা জানাবার আছে। বাঙলার ইতিহাসে এই বিক্রমপুর বিরাট গৌরবের অধিকারী। বিক্রমপুর পণ্ডিতের স্থান, বীরের লীলাক্ষেত্র, সজ্জনের জন্মভূমি। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্তরঞ্জন এই দেশেরই মানুষ। মুন্সীগঞ্জে যে মর্য্যাদা আপনারা আমাকে দিয়েচেন, সে আমি কোনদিন বিস্মৃত হব না। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন। *

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ

শিবপুরের এই ক্ষুদ্র সমিতির সাহিত্য শাখার পক্ষ হইতে আপনাদিগের সংবর্দ্ধনার ভার একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়াছে। আমি আপনাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতেছি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটি সাহিত্যিক জমায়েত হইয়া গিয়াছে; তাদের আয়োজন ও আয়তনের বিপুলতার কাছে এই ক্ষুদ্র অধিবেশনটি আরও ক্ষুদ্র, কিন্তু আপনাদের পদার্পণে এই ক্ষুদ্র বস্তুটি আজ যে গৌরব লাভ করিবে, তাহাকে কিছুতেই যে আর ছোট বলা চলিবে না, এই লোভই আমরা কোনমতে সংবরণ করিতে পারি নাই।

সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছি; শুধু কেবল তাঁহাকে মাঝখানে পাইবার লোভেই নয়,—এই সভাপতি লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই মর্ম্মপীড়ার কারণ ঘটে। আমরা তাই স্থির করিয়াছিলাম যে, এমন এক ব্যক্তিকে আনিয়া হাজির করিব যাঁহার সর্ব্বোচ্চ স্থানটি লইয়া তর্ক না থাকে,—এই আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে মর্ম্মদাহের যেন আর লেশমাত্র অবকাশ না ঘটে।

সর্ব্বপ্রকার সভা-সমিতিতেই গতিবিধি আমার অল্প। কখনো বা খবর পাই না বলিয়া, এবং কখনো বা পারিয়া উঠি না বলিয়াই যাওয়া হয় না। অতএব সাহিত্যের নাম দিয়া দেশের মধ্যে সচরাচর যে-সকল দরবার বসে, সেখানে ঠিক যে কি-সব হয়, আমি জানি না। তবে ঘরে বসিয়া সংবাদপত্রাদির মারফতে যে সকল তথ্য পাই তাহা হইতে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিয়াছে। আজিকার এই সমবেত সাহিত্যিক-গণের সম্মুখে আমি সবিনয়ে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

বহু ধনীর সমাগমে আড়ম্বর-বহুল দেশের এই সকল সাহিত্যিক জনতায় দরিদ্র সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হন কিনা আমি নিশ্চয় জানি না, এবং হইলেও কিছু তাঁহারা তথায় বলিবার প্রয়াস করেন কি না, তাহাও অবগত নই। হয়ত কিছু বলেন, কিন্তু সভার একান্ত হইতে নিরন্ন, নিছক সাহিত্যসেবীর ক্ষীণ কণ্ঠ প্রবল পক্ষের উদ্দাম কোলাহলে খুব সম্ভব ঢাকা পড়িয়া যায়—তাঁহাদের কথা আমাদের কানে পৌঁছে না। কিন্তু কণ্ঠ যাঁহাদের চাপা পড়ে না—কথা যাঁহাদের সাধারণের কানে ঢাকের মত পিটিতে থাকে,—গলায় তাঁহাদের জোর আছে বলিয়া আমি খেদ করি না কিংবা সাহিত্য-সাধনায় বৎসরের তিনশ' চৌষট্টি দিনই সাহিত্যিকগণকে অকাতরে ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র একটি দিন যাঁহারা নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন, এইরূপ বিনীত ও উদার ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষা হওয়াও সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই একটামাত্র দিনের

উদ্যম যখন তাঁহাদের সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন দুই-একটা কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এইখানে আমি একটা কথা ভাল করিয়া বলিয়া রাখিতে চাই যে, কোন ব্যক্তি বা সমিতিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আমি একটা কথাও বলিতেছি না। কারণ, ইহা বিশেষ কোন লোক বা বিশেষ কোন সমিতির খেয়ালের ব্যাপার হইলে বলার কোন প্রয়োজনই হইত না। আমি সাধারণভাবেই আবার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাহিত্য-রচনার কাজটাকে বাহুল্য মনে করিয়া যাঁহারা ইহার সমালোচনার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছেন, বক্তব্য তাঁহাদের প্রধানতঃ দুইটি। অন্য শাখা-প্রশাখা অনেক আছে, সে কথা পরে হইবে।

প্রথমে তাঁহারা বলেন যে, বাঙলা-ভাষার মত ভাষা আর কাহার আছে? আমাদের সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, আমাদের সাহিত্য 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছে; এমন কি আমাদের সাহিত্য যে খুব ভালো, এ কথা বিলাতের সাহেবরা পর্য্যন্ত বলিতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এত বড় উন্নতি কোন দেশ আর কবে করিয়াছে?

তাঁহাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বাঙলা সাহিত্য রসাতলে গেল,—আর বাঁচে না। আবর্জ্জনায় বাঙলা-সাহিত্য বোঝাই হইয়া উঠিল, আমাদের কথা কেহ শুনে না। হায়! হায়! বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া নাই, মুগুর মারিবে কে? ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক নভেল ও কবিতা বাহির হইতেছে, তাহাতে সুশিক্ষা নাই—ভাষা নিছক দুর্নীতিপূর্ণ। ইহার কুফলও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কারণ, প্রত্নতত্ত্বের যে-সকল বই এখনও লেখা হয় নাই, তাহার প্রতি পাঠকদিগের আগ্রহ দেখা যাইতেছে না, এবং ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাল ভাল বই পাঠকদিগের উৎসাহের অভাবে লেখাই হইতেছে না।

অবশ্য আমি স্বীকার করি, সে-সকল বই লেখা হয় নাই, তাহা না পড়িবার প্রায়শ্চিত্ত কি আমি জানি না, এবং পাঠকের আগ্রহের অভাবে যে-সকল পণ্ডিত ব্যক্তিদের বই লেখা বন্ধ হইয়া আছে ইহারই যে কি উপায় আছে তাহাও আমার গোচর নয়; কিন্তু ঝুড়ি ঝুড়ি বই লেখা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবারও আছে এবং বোধ হয় বলিবার সামান্য দাবীও আছে।

যাঁহারা এই অভিযোগ আনেন তাঁহারা কখনো কি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, বাস্তবিক কয়টা বই মাসে মাসে বাহির হয়? ভাল ও মন্দ মিলাইয়া আজ পর্য্যন্ত কয়খানা নাটক নভেল ও কবিতার বই বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা কত? বঙ্গ-সাহিত্য আমাদের বিশ্ব-সাহিত্যে জায়গা লইয়াছে জানি, কিন্তু শুধু কেবল আমরাই ত নয়, আরও ত কেহ কেহ আছেন, বিশ্ব-সাহিত্যে যাঁহারা

আমাদেরই মত স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের নাটক নভেলের তুলনায় কয়খানা নাটক নভেল বাঙলায় আছে? কবিতার বই বা কয়টা বাহির হইয়াছে? নাটক নভেলে বাঙলাদেশ প্লাবিত হইয়া গেল, এ বুলি কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন আমি জানি না, কিন্তু এখন যে-কেহ দেখি আপনাকে বঙ্গ-সাহিত্যের বিচারক বলিয়া স্থির করেন, তিনি এই বুলি নির্ব্বিচারে আবৃত্তি করিয়া যান, মনে করেন, সমঝদার বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিবার ইহার চেয়ে বড় পথ আর নাই। কথায় কথায় তাঁহারা বিশ্ব-সাহিত্যের উল্লেখ করেন, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সত্যকার পরিচয় যদি তাঁহাদের থাকিত ত জানিতেন, যাহাকে তাঁহারা আবর্জ্জনা বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন, সেই আবর্জ্জনাই সকল সাহিত্যের বনিয়াদ, তাহারাই সাহিত্যের অস্থি-মজ্জা। মেঘদূত, চণ্ডীদাস, গীতাঞ্জলি কোন সাহিত্যেই ঝুড়িঝুড়ি সৃষ্টি হয় না। এবং আবর্জ্জনা থাকে বলিয়াই ইহাদের জন্মলাভ সম্ভবপর হইয়াছে, না হইলে হইত না। আবর্জ্জনার বালাই যেদিন দূর হইবে, সেদিন যাহাকে তাঁহারা সার বস্তু বলিতেছেন, সেও সেই পথেই অন্তর্হিত হইবে। আবর্জ্জনা চিরজীবী হইয়া থাকে না, নিজের কাজ করিয়া সে মরে, সেই তাহার প্রয়োজন, সেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু সেই আবর্জ্জনার ভার বহিতে যেদিন দেশ অস্বীকার করিবে সেদিন আনন্দ করিবার দিন নহে, সেদিন দেশের দুর্দ্দিন।

আর এই যে একটা কথা,—ভাল ভাল বই, অর্থাৎ ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বাহির হইতেছে না, কেবল কবিতা, কেবল উপন্যাস,—এ কথার উত্তর কি কথা-সাহিত্য-লেখকদের দিবার। তাহারা বড় জোর এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে পারে যে, বাঙলাদেশের 'গীতাঞ্জলি', বাঙলাদেশের 'ঘরে বাইরে'—অর্থাৎ কথা-সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি একটি কলরব উঠিয়াছে যে, আধুনিক উপন্যাস-লেখকেরা বঙ্কিম সাহিত্যকে ডুবাইয়া দিল। বঙ্কিম-সাহিত্য ডুবিবার নয়। সুতরাং আশঙ্কা তাহাদের বৃথা। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই যে নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জ্জনীয়; ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন। আমি বয়সে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্য-ব্যবসায় আজও আমার বছর দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায় হইবে না। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয় এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া

পড়িয়া থাকিতাম ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙলা-সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্ত্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি ত সে তাঁহার মর্য্যাদা-হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি, প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছুই নাই। কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছি, আশা করি এ কথা কাহারও মনে কল্পনায়ও উদয় হইবে না। ধরা যাক তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' বই। শৈবলিনীর সম্বন্ধে লেখা আছে—"এমনি করিয়া প্রেম জন্মিল"। এই 'এমনি'টা হইতেছে—নক্ষত্র দেখা, নৌকার পাল গণনা করা, মালা গাঁথিয়া গাভীর শৃঙ্গে পরাইয়া দেওয়া, আরও দুই-একটা কি আছে, আমার ঠিক মনে নাই। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা অতিশয় জটিল। গঙ্গায় ডুবিতে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবের নৌকা চড়িয়া পরপুরুষ কামনা করিয়া স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি, সে সমস্তই নির্ভর করিয়াছে শৈবলিনীর বাল্যকালে 'এমনি করিয়া' যে প্রেম জন্মিয়াছিল, তাহারই উপর। তখনকার দিনে পাঠকেরা লোক ভাল ছিল। এবং বোধ করি তখনকার দিনে সাহিত্যের শৈশবে ইহার অধিক গ্রন্থকারের কাছে তাহারা চাহে নাই, এবং এই দুষ্কৃতির জন্য শেষকালে শৈবলিনীর যে-সকল শাস্তিভোগ হইয়াছিল তাহাতেই তাহারা খুশী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক, তাহারা গ্রন্থকারের মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না, নিজে তাহারা বিচার করিয়া দেখিতে চায় শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মান সম্ভবপর কি না এবং এতবড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কি না। প্রতাপ অতবড় একটা কাজ করিল, কিন্তু এখনকার দিনের পাঠক হয়ত অবলীলাক্রমে বলিয়া বসিবে—কি এমন আর সে করিয়াছে। শৈবলিনী পরস্ত্রী, গুরুপত্নী,—নিজের ঘরে পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে নাই, এমন অনেকেই করে না, এবং করিলে গভীর অন্যায় করা হয়। আর তার যুদ্ধের অজুহাতে আত্মহত্যা? তাহাতে পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু কাজ ভাল নয়। সংসারের উপরে, নিজের স্ত্রীর উপরে এই যে একটা অবিচার করা হইয়াছে, আমরা তাহা পছন্দ করি না। আর তাহার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত? তা আত্মহত্যার আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের? অথচ, সেকালে আমি লোককে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে শুনিয়াছি, "তুমি প্রতাপের ন্যায় আদর্শ-পুরুষ হও।" মানুষের মতি-গতি কি বদলাইয়াই গেছে!

আর একটা চরিত্রের উল্লেখ করিয়া আমি এ-প্রসঙ্গ শেষ করিব। সে 'কৃষ্ণকান্তের

উইলের' রোহিণীর চরিত্র। এ-কথা কেন তুলিলাম হয়ত তাহা অনেকেই বুঝিবেন। সেদিনের সঙ্গে এদিনের এইখানেই একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহার জীবনের অবসান হইয়াছে পিস্তলের গুলিতে। এইরূপে তাহার পাপের শাস্তি না হইলে কানা ও খোঁড়া হইয়া তাহাকে নিশ্চয়ই কাশীর পথে পথে 'একটি পয়সা দাও' বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত। তার চেয়ে এ ভালই হইয়াছে, সে মরিয়াছে। তাহার মরার সম্বন্ধে আধুনিক লেখক ও পাঠকগণের যে আপত্তি আছে তাহা নয়। কিন্তু আগ্রহও নাই। বস্তুতঃ এ-সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন। পাপের শাস্তি না হইলে গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ হইবে না, অতএব শাস্তি চাই-ই। এই চাই-ই'র জন্য গ্রন্থকারকে যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, সেইখানেই আমাদের বড় বাধা। তাহার গোবিন্দলালকে ভালবাসিবার যে শক্তি, সাধারণ নারীতে তাহা অসম্ভব,—উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল—গোবিন্দলালের ভাল করিতে, 'বারুণী'র জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনই প্রিয়তমের জন্য, আবার সেই রোহিণীই যখন কেবলমাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধেই অকারণে এবং একমুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া, আর একজন অপরিচিত পুরুষকে গোবিন্দলালের অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল, তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। রোহিণী পাপিষ্ঠা, এবং যে পাপিষ্ঠার প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, তাহারও প্রতি কিন্তু এত বড় অবিচার করিতে আমাদের হাত উঠে না। সেকাল ও একালে এখানেই মস্ত বড় ব্যবধান। বিধবা রোহিণীর দুর্ভাগ্য যে, সে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার দুর্বুদ্ধি, তাহার দুর্ব্বলতা,—কিন্তু পাপের সঙ্গে এক করিয়া, ইহাদের একত্রে ছাপ মারিয়া দিবার যখন অনুরোধ আসে, তখন সে অনুরোধ রক্ষা করাকেই আমরা অকল্যাণ বলিয়া মনে করি।

প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির বাটখারায় ওজন করিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে গেলে কি হয় তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। একটুখানি ব্যক্তিগত হইলেও আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। 'পল্লীসমাজ' বলিয়া একটা গ্রন্থ আছে। তাহাতে বিধবা রমা রমেশকে ভালবাসিয়াছে দেখিয়া সেদিন একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' গ্রন্থে এইরূপে রমাকে তিরস্কার করিয়াছেন—"তুমি না বুদ্ধিমতী? তুমি বুদ্ধিবলে পিতার জমিদারী শাসন করিয়া থাক, কিন্তু নিজের চিত্ত দমন করিতে পারিলে না? তুমি এতদূর সতর্ক যে, রমেশের চাকরের নামে পুলিসে ডায়েরী করাইয়া রাখিলে, অথচ তুমি শিবপূজা কর, তাহার সার্থকতা কোথায়? তোমার এই পতন নিতান্তই ইচ্ছাকৃত।" এই অভিযোগের কি কোন উত্তর আছে,

বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক হইয়া সাহিত্যিককে মানুষে যখন এমনি করিয়া জবাবদিহি করিতে চায়?

সেই ভাল-মন্দ, সেই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন; শুধু এই উচিত-অনুচিতই রোহিণীকে গোবিন্দলালের লক্ষ্য করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। সেখানে ভালবাসা উচিত নয়, সেখানে ভালবাসার অপরাধ যতই হউক,—বিশ্বাসহন্ত্রীর ঢের বড় অপরাধ মৃত্যুকালে হতভাগিনীর কপালে বঙ্কিমচন্দ্রকে দাগিয়া দিতেই হইল। এই অসঙ্গত জবরদস্তিই আধুনিক সাহিত্যিক স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। ভাল-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে; মন্দের ওকালতি করিতে কোন সাহিত্যিকই কোনদিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।*

* ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে, সাহিত্য-সভায় পঠিত সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্যের রীতি ও নীতি

শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তি-গুলিকে সবিনয়ে রস-রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মতভেদ ঘটিয়াছে প্রধানতঃ আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

ইতিমধ্যে বিনাদোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রর বিরুদ্ধ-দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠিতে' আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়েছেন যে, ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই, একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই-চারিজন ভক্ত জুটিয়াছেন, তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন কম? দাওনা তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা ছাড়া, ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকীল। তাঁর যে-জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তি তর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে-জেরার প্যাঁচে পড়িলে আমি ত একদণ্ডও বাঁচিব না। কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির কোঠায় পৌঁছিয়াছেন, আমি হয়ত ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তি কোন-টারই নাগাল পাইব না, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব। তখন?

ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু'

আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার! 'রস-সৃষ্টি', 'রসোবোধন' প্রভৃতির রস-বস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে না কি? এ কেবল রস-রচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়;—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।

এ ত গেল আমার দিকের কথা। ও-দিকের কথাটা ঠিক জানি না, কিন্তু অনুমান করিতে পারি।

প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই, আমরা ত আর পারিয়া উঠি না,

একবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না, না, ধনুর্ব্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হোক, শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?

কিন্তু এ-প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কিন্তু জানেন তিনি, কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্ম্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশী-ধারী অশুচি-ধর্ম্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালি-কলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি, কবে কোন মহীয়সী জননী অতি আধুনিক সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তান-বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ-সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুকরা-টাকরা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আক্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। শুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এতবড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আধুনিক সাহিত্য কেবল সত্যের নাম দিয়া নরনারীর যৌন মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস। অথচ, যে কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন, তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে, সত্যমাত্রই সাহিত্য হয় না; জগতে এমন অনেক নোঙরা সত্য ঘটনা আছে যে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন মতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।

কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপজাম ফুলও না, যদিচ যে শিরীষফুলের সর্ব্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে।

তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর মকরের কাছে। অথচ, হাতের কাছে বাগ্দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষে উজাড় করিয়া দিল, সে তাঁহার চোখে পড়িল না! কুমুদফুলের বীজ হইতে ভেটের খৈ হয়, এমন যে পদ্ম তাহারও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে না। তিলফুলের সহিত নাসিকার, কদলী-বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই। আজ নরেশচন্দ্র বৃথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিম্বফল অনেকে তরকারি রাঁধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না কিন্তু তাঁহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়া অন্যায়। যে খায় সে সৎ-সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশতই এরূপ করে।

কিন্তু এই লইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিরর্থক। এগুলি যুক্তিও নয়, তর্কও নয়, কোন কাজেও লাগে না। অথচ এই ধরণের গোটা-কয়েক এলো-মেলো দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া কবি চিরদিনই জোর করিয়া বলেন, এর পরে আর সন্দেহ-ই থাকিতে পারে না যে, আমি যা বলচি তাই এবং তুমি যা বলচ সেটা ভুল।

কিন্তু একথাও আমি বলি না যে, আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে দুঃখ করিবার আদৌ কারণ ঘটে নাই, কিংবা রবীন্দ্রনাথের এবংবিধ মনোভাব একেবারেই আকস্মিক। তাঁহার হয়ত মনে নাই, কিন্তু বছর-কয়েক পূর্ব্বে আমাকে একবার বলিয়াছেন যে, সেদিন তাঁহার বিদ্যালয়ের একটি বারো-তেরো বছরের ছাত্র 'পতিতা'র সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছে।

আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের ছোড়দা হঠাৎ কবি-যশোলুব্ধ হইয়া কাব্য-কলায় মনোনিবেশ করিলেন। এবং বাঙলা-ভাষায় গভীর ভাব-প্রকাশের যথেষ্ট সুবিধা হয় না বলিয়া ইংরাজী ভাষাতেই কবিতা রচনা করিলেন। রচনা করিলেন কি চুরি করিলেন জানি না, কিন্তু কবিতাটি আমার মনে আছে—

> A lion killed a mouse
> And carried it into his house ;
> Then cried his mother,
> And therefore cried his sister !

ছন্দ ও ভাবের দিক দিয়া কবিতাটি অনবদ্য। কিন্তু তুমুল তর্ক উঠিল, 'মাদার' কার? সিঙ্গীর, না ইঁদুরের? বড় বৌ-ঠাকরুণ ক্ষণকাল কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন, না না ওদের নয়। ও কবির 'মাদার'। 'পতিতা' গল্প রচনার বিবরণ শুনিলে বৌ-ঠাকরুণ হয়ত বলিবেন, এক্ষেত্রে কাঁদা উচিত ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের। আর কাহারও নয়। এ তো গেল অসাধু সাহিত্যের দিক। আবার

সাধু সাহিত্যের দিকেও তরুণ কবির অভাব নাই। এদিকে যিনিই কবিতা বা গান লেখেন, তিনিই লেখেন, তোমার বীণা আমার তারে বাজিতেছে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার ঝিলিক্-মারা অরূপ মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইতেছি, বুকের মাঝে তোমার নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, খেয়ার ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল কাণ্ডারি! এখন পার কর। ইত্যাদি।

একটা উদাহরণ দিই। ভাদ্র মাসের 'কেতকী' পত্রিকায় গান ছাপা হইয়াছে—

তোমার ভাঙার গানে তোমায় নেব চিনি
পরাণ পাতি শুনবো পায়ের রিনি ঝিনি।
(তোমার) কাল বোশেখীর ঝড়ে তোমায় নেব দেখে।
(তোমার) শ্রাবণধারা অঙ্গে আমার নেব মেখে।
(আমার) বুকের মাঝে তোমার আঘাত চিহ্নখানি—
আমার রোদনের মাঝে তোমার দৈববাণী!
ভুল করে যে ভুলবো তোমায় হবে না তা'
(তোমার) আঘাত এলে কোথায় বা তার
লুকাবো ব্যথা ?
আমার ছড়িয়ে প'ল সকলখানে—
সারা বুকে
আমার জড়িয়ে গেল সকল হিয়া
দুঃখে সুখে!
সেথায় আমি তোমায় খুঁজে নেব চিনি—
(আমার) পরাণ পাতি শুনব নূপুর রিনি ঝিনি।

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী কবিতাটির ন্যায় এ গানখানিও অনবদ্য, কি ঝঙ্কারে, কি ভাবের গভীরতায়, কি বৈরাগ্যের বেদনায়। 'কেতকীর' তরুণ সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিলাম, রচয়িতার বয়স কত? সে বন্ধু-গৌরবে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, আজ্ঞে পনের-ষোলর বেশী নয়।

মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, দেশসুদ্ধ সাহিত্যিক বালক-বালিকার দল যখন প্রহ্লাদ হইয়াই উঠিল, এবং 'ক' লিখিতে কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল, তখন ওরে অতিবৃদ্ধ! এক মাথা পাকা চুল লইয়া আর বাঁচিয়া আছিস কিসের জন্য?

সাহিত্যসৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালরও না, মন্দেরও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি, আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ,

তাঁহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও ঠিক তত বড়ই কাব্য-সৃষ্টি। লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাঁহার শিরে বর্ষিত হোক না। অথচ, অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হোক ব্যর্থ। পণ্ডিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্য-সম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্দ্ধিত হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রস-বস্তু লইয়া আমি আলোচনা করিতে পারিব না। কারণ, ও আমি জানি না। রসিক-অরসিকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেও আমি অপারগ। কবির বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা ঠিক যে কি এবং কিসে মেটে সে আমার অনধিগম্য। কিন্তু একটা কথা জানি যে, কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য ত নয়ই। 'সোনার তরী'র যা লইয়া চলে, 'চোখের বালি'র তাহাতে কুলায় না। সজিনাফুলে, বকফুলে, 'সোনার তরী'র প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়। তেপান্তর মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের চলে না। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না।

কবি 'সাহিত্য ধর্ম্ম' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"মধ্যযুগে একসময়ে য়ুরোপে শাস্ত্র-শাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্ম্মের রাজত্ব-সীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হ'ল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পিয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা পরে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তি-স্বভাববর্জ্জিত—তার ধর্ম্মই হচ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেচে।"

কবির এই উক্তির মধ্যে বহু অভিযোগ নিহিত আছে, সুতরাং কথাগুলিকে একটুখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে যে কি বুঝায় আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে যদি শুধু sex-psychology, anatomy অথবা gynaecology বুঝাইত, তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করিতাম। পৃথিবী সূর্য্যের চারিপাশে ঘোরে, ইহা যত বড় কথাই হউক, সাহিত্যের

মন্দিরে ইহার প্রয়োজন গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত সংযত চিন্তা-ধারার ফল এই জিনিসটি, সে চিন্তা নইলে কাব্যের চলে চলুক, উপন্যাসের চলে না। বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্য্য-কারণের সত্যকার সম্বন্ধ বিচার। চার এবং চারে আট হয়, এবং আট হইতে চার বাদ দিলে চার থাকে ইহাই বিজ্ঞান। এ মনোভাবকে ভয় কিসের? কিন্তু তাই বলিয়া নোঙরামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয়, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়; সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রী-বিদ্যা শিখানকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধ হয় বাঙলাদেশের একজনও অতি আধুনিক সাহিত্যসেবী একথা বলে না।

বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মপুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করা যায়, রূপকথা-সাহিত্যও রচনা করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। রাজার পুত্র গেলেন চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তর মাঠের দুর্গম পথ পার হইয়া রাজকন্যার সন্ধানে। কোটালপুত্রের ডিটেকটিভ-বুদ্ধি তাঁহার নাই, সওদাগর পুত্রের বেনেবুদ্ধি তাঁহার নাই, আছে শুধু রস। গিয়া বলিলেন, তুমি যে তুমি এই আমার যথেষ্ট। এই রস উপভোগ করিবার মত রসজ্ঞ ব্যক্তির সংসারে অভাব নাই তাহা মানি, ভিন্ন-রুচির লোকও ত সংসারে আছে? তাহারা গিয়া যদি বলে রাজপুত্র, তোমার মনের মধ্যে রাজকন্যার রূপ-যৌবন স্থান পায় নাই, যৌতুকস্বরূপ অর্দ্ধেক রাজত্বের প্রতিও তোমার কিছুমাত্র খেয়াল নাই, তুমি মহৎ,—কন্যাটি যে ঘুঁটে-কুড়োনির কন্যা নয়, রাজার কন্যা, ইহাই তোমার যথেষ্ট, মনস্তত্ত্বের অবতারণার প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজপুত্র! তোমার মনের কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া না বলিলে ত এই উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্যের সমস্ত রসটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, তখন ইহাদের মুখেই বা হাত চাপা দিবে কে?

এই ধরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সাহিত্য-রচনায়। পরলোকগত সাহিত্যিকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য ইহার উল্লেখ করিতেছি না, করিতেছি হাতের কাছে একটা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অসম্ভব কল্পনার উদাহরণ পাইতেছি বলিয়া, বাঙলাদেশে তাঁহার পাঠক-সংখ্যা বিরল নয়। আমি নিজে দেখিয়াছি, মুদির দোকানে একজন গ্রন্থ পাঠ করিতেছে এবং বহুলোক গলদশ্রু-লোচনে সেই সাহিত্য-সুধা পান করিতেছে। নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র দরিদ্র নায়ক মা-কালীর কাছে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া সাত ঘড়া সোনার মোহর গাছতলা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বড়লোক হইল। ছেলে মরিল, কিন্তু ভয় নাই। শ্মশানে জটাজুটধারী তেজোপুঞ্জ কলেবর এক সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাবে ছেলে চিতায়

উপরে 'বাবা' বলিয়া উঠিয়া বসিল। রসজ্ঞ শ্রোতার দল কাঁদিয়া আকুল। তাহাদের আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেখানে কেহই ঠেলা দিয়া প্রশ্ন করে না, কেন? কিসের জন্যে? তাহারা বলে, দরিদ্র নায়ক বড়লোক হইয়াছে ইহাই ঢের। মরা-ছেলে প্রাণ পাইয়াছে ইহাই আমাদের যথেষ্ট,—ইহাতেই আমাদের বোধের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধা মেটে। ইহা অনির্ব্বচনীয়,—এইপ্রকার সাহিত্য-রসেই আমাদের হৃদয়ের বসন্তলোকে কল্পলতায় ফুল ফুটে।

কলহ করিবার কি আছে? কিন্তু আমি যদি এ-কাজ না পারি, নিজের গ্রন্থের দরিদ্র নায়ককে মা-কালীর অনুগ্রহ যোগাড় করিয়া দিতে সক্ষম না হই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া না পাইয়া মরা-ছেলেকে দাহ করিতে বাধ্য হই, ত নিশ্চয় জানি, আমার বই তাহারা পুড়াইয়া ছাই করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু উপায় কি? বরঞ্চ, হাত জোড় করিয়া চতুরাননের কাছে গিয়া বলিব, তাহারা আরও খানকয়েক বই আমার পুড়াক, সে আমার সহিবে, কিন্তু এই রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মার ক্ষুধা, বোধের ক্ষুধা মিটাইবার সৌভাগ্য "শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ"।

কিন্তু কেন? কেন এইজন্য যে, কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। ইহাদের ধর্ম্মও এক নয়, ধর্ম্মের সীমানাও এক নয়। এবং মানুষের বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধার জাতি-ভেদ এতই গভীর ও বিস্তৃত যে, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-নিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে বিসর্জ্জন দিলে ইহাদের অর্থ-ই প্রায় থাকে না।

কবির কাঁকর-পদ্মের উদাহরণে নরেশচন্দ্র বলিতেছেন ইহা যুক্তিও নয়, নৈয়ায়িকের দৃষ্টান্তও নয়। অতএব, ইহা রস-রচনা। আমার বোধ হয় উপাখ্যান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অতিশয় দুরূহ। আমি ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ, কাঁকর বরণীয় কি পদ্ম বরণীয়, চড়াই পাখী ভালো কি মোটর গাড়ি ভালো, বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কবি তাঁহার 'সাহিত্য-ধর্ম্মে' নর-নারীর যৌন মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে, ও ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দুটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর, অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ-সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই

সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত। নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি, এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটি বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়; ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হোক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্য্যও যায়, প্রাণও শুকায়। এ সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না। অবশ্য ঠিক এ জিনিসটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে অনেকগুলি নজির তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন—

> 'শারীর ব্যাপারমাত্রেই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য-সম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে।"

কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমরা বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি। নর-নারীর মধ্যে ইহা আছেও জানি, চলেও জানি, দোষেরও বলিতেছি না, তবুও কেমন যেন পারিয়া উঠি না। আমাদের সমাজে এ বস্তুটিকে লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধ হয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য demonstration এ লজ্জা করে। খুব সম্ভব আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাবি, এই দুর্ব্বলতা লইয়াই তো অনেক প্রণয়-চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, মুস্কিলে তো পড়ি নাই। কাব্য-সাহিত্য এক, কথা-সাহিত্য আর। 'হৃদয়-যমুনা' 'স্তন' 'বিজয়িনী', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে যাহাই ঘটুক, কথা-সাহিত্যে মনে হয় আমারই মত কবি এ-দৌর্ব্বল্য কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ করি এইসকল এবং এমনি আরও দুই-একটি ছোট-খাটো ক্রটির কথা লোকের মুখে শুনিয়া কবি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। 'বিদেশের আমদানি' কথাটা তাঁহার ক্ষোভেরই কথা। দেশ-ভেদে সাহিত্যের ভাষা আলাদা হয়, কিন্তু সত্যকার সাহিত্যের যে দেশ-বিদেশ নাই এ সত্য কবি জানেন, এবং সকলের চেয়ে বেশী করিয়াই জানেন। তা না হইলে আজ বিশ্বসুদ্ধ লোকে তাঁহাকে বিশ্বের কবি বলিয়া মর্য্যাদা দিত না। কবির সৃষ্টি সমুদ্রের ন্যায় অপরিসীম। নজির আছে জানি, তথাপি সেই সমুদ্র হইতেই স্ব-মতের অনুকূলে নজির তুলিয়া তাঁহাকে খোঁটা দেওয়া শুধু অবিনয় নয়, অন্যায়।

কবি বলিয়াছেন—

"ভারতসাগরের ওপারে (অর্থাৎ য়ুরোপে) যদি প্রশ্ন করা যায়, তোমাদের সাহিত্যে এ হট্টগোল কেন? উত্তর পাই, হট্টগোল কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে। ভারতসাগরের এ-পারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, হাট ত্রি-সীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী।

এ জবাব কবিকে কে দিয়াছে জানি না, কিন্তু যেই দিয়া থাক, আমি তাহার প্রশংসা করিতে পারি না। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন—

"...হাট জমিবার একটু চেষ্টা না হইতেছে এমন নয়। তা ছাড়া হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকবার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভল্‌টেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ফরাসী-বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল। এবং আজ বিশ্বব্যাপী ভাব-বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।"

আধুনিক সাহিত্য-সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট কথা এমনি নির্ভয়ে আর কেহ বলিয়াছেন কি না জানি না।

সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহা বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণ-কর কি না। 'বিদেশের আমদানি' কথাটা মুর্গী খাওয়ার অপবাদ নয় যে, শুনিবামাত্রই লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হইবে। অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানি প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে, এমন কেহই নাই যে তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে। যত মত-ভেদই থাক্‌, গায়ের জোরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হয়। কিন্তু এইসকল অত্যন্ত মামুলি কথা কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে আমার নিজেরই লজ্জা করিতেছে। ইহা যে প্রায় অনধিকারচর্চ্চার কোঠায় গিয়া পড়িতেছে তাহাও সম্পূর্ণ বুঝিতেছি, কিন্তু না বলিয়াও কোন উপায় পাইতেছি না।

এ প্রবন্ধের কলেবর আর বাড়াইব না। কিন্তু উপসংহারে আরও দুই-একটা সত্য কথা সোজা করিয়াই কবিকে জানাইব। তাঁহার 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ, শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর। তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে, একথা কেহ-ই অস্বীকার করে না, কিন্তু সত্যই

কি আধুনিক বাংলা-সাহিত্য রাস্তার ধূলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে? হয়ত, কখনো কোথাও ভুল হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এতবড় দণ্ডই কি সুবিচার হইয়াছে? কবি বলিয়াছেন—

"সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে, বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি * * *।"

এই যদি সত্য হইয়া থাকে ত ভারতের দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়ত এ-বস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোন একটা জিনিস শুধু কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? ইহাই কি তাঁহার আদেশ?

পরের লাইনে কবি বলিয়াছেন—

"সেদেশের (অর্থাৎ বাঙলাদেশের) সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দিবে?"

দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার করা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না?

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্ম্ম'র জবাব দিয়াছেন নরেশচন্দ্র। হয়ত তাঁহার ধারণা, অনেকের মতে তিনিও একজন কবির লক্ষ্য। এ-ধারণার হেতু কি আছে আমি জানি না। তাঁহার সকল বই আমি পড়ি নাই, মাসিকের পৃষ্ঠায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই শুধু দেখিয়াছি। মতের একতা অনেক জায়গায় অনুভব করি নাই। কখনো মনে হইয়াছে, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত সুনির্দ্দিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও নিজের মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করি নাই। নরেশচন্দ্রের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন নহেন জানি। কিন্তু মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্য্যহীন রূঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ মনে করিয়া পালোয়ানীর মাতামাতি করিতেই তিনি বই লেখেন এমন অপবাদ আমি দিতে পারি না। তাঁহার সহিত পরিচয় আমার নাই, কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক অল্পই আছেন। বাঙলা-সাহিত্যের অবিসংবাদী বিচারক হিসাবে কবির কর্ত্তব্য ইহার সমগ্র পুস্তক পাঠ করা, কোথায় বা শ্লীলতার অভাব, কোথায় বা কাব্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে ইনি নিযুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। তবে এমনও

হইতে পারে, কবির লক্ষ্য নরেশচন্দ্র নহেন, আর কেহ। কিন্তু সেই 'আর কেহ'রও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি। নিজের সাহিত্যিক জীবনের কথা মনে পড়ে। এই ত সেদিনের কথা। গালিগালাজের আর অন্ত ছিল না। অনেক লিখিয়াছি, সকলকে খুশী করিতে পারি নাই, ভুল করিয়াছিও বিস্তর। কিন্তু একটা ভুল করি নাই। স্বভাবতঃ নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক বলিয়াই হোক, অক্ষমতাবশতঃই হোক, আক্রমণের উত্তরও দিই নাই। কাহাকে আক্রমণও করি নাই। বহুকাল হইয়া গেলেও, কবির নিজের কথাও হয়ত মনে পড়িবে। সংসারে চিরদিনই কিছু কিছু লোক থাকে যাহারা সাহিত্যের এই দিকটাই পছন্দ করে। এখন বুড়া হইয়াছি, মরিবার দিন আসন্ন হইয়া উঠিল, গাল-মন্দ আর বড় খাই না। শুধু 'পথের দাবী' লিখিয়া সেদিন 'মানসী' পত্রিকার মারফতে এক রায়সাহেব সাবডেপুটির ধমক খাইয়াছি। বইয়ের মধ্যে কোথায় নাকি সোনাগাছির ইয়ারকি ছিল, অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে যাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যাই হোক, আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্য-সেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করি। এবং যে-কয়টি দিন বাঁচিব শুধু এই কাজটুকুই নিজের হাতে রাখিব।

কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি, ইহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান শুরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই, ধৈর্য্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি, আছে শুধু সুতীব্র বাক্যশেলে ইহাদের বিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প। আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে ইহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার নির্দ্দয় বাসনা। মতের অনৈক্যমাত্রেই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্মঘাতী কলহে না আছে গৌরব, না আছে কল্যাণ।

বিশ্বকবির এই 'সাহিত্য-ধর্ম্মে'র শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙলা সাহিত্যসেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে, তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাহার কানের কাছে 'গুরুদেব' বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে, তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।*

* 'বঙ্গবাণী' ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

সাহিত্যের মাত্রা

কল্যাণীয়েষু,—শ্রাবণের [১৩৪০] 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি ['পরিচারক'-সম্পাদক শ্রীঅতুলানন্দ রায়] আমার অভিমত জানতে চেয়েছ। এ চিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চারপাতা-জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবার' মত এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইউরোপ তার যন্ত্রপাতি, ধন-দৌলত, কামান-বন্দুক, মান-ইজ্জত-সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করব যে, বয়েস ত অনেক হ'ল, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাব!

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ, তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ-প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হ'ল ওরা 'মত্ত হস্তী', 'ওরা বুলি আওড়ালে', 'পালোয়ানি করলে', 'কসরৎ কেরামৎ দেখালে', 'প্রব্লেম্ সল্ভ করলে', অতএব ওদের, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ-বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ ক্ষোভপ্রকাশ যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমন বিফল। কার তৈরী-করা বুলি পাখীর মত আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হ'ল অমুক গু মাড়িয়েচে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ি এলে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েচে! এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, একথা অস্বীকার করিনে যে, কবির এই ধরনের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মত বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার হাতীঘোড়া জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ জাগসই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুদিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো-মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না! খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হ'ল কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ-কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি নিকৃষ্ট জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেচে, তুমি আপত্তি করোনি, অতএব অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসব, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ-সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় না। এ সব উপমা শুনতে ভাল, দেখতেও চক্‌চক্ করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরীর প্রভূত বস্ত্র-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিককালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেচেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ ওইটেই হয়েচে ফ্যাশন। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েচে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েচে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোস করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না। তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে, না কটুকথা দিয়ে? কবি বলেচেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে, আর কিছুতেই নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলেচেন, "উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েচে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস-সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, "তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে?" এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়; তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েচেন এই বলে যে, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেচে এবং বয়েসও বেড়েচে, সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-

ব্যাজমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করিনে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না, কিংবা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন, 'বুলি'র খাতিরে ও-দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করব না, কারণ ও-দু'টো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্ম্মপুস্তক ত বটেই, হয়ত বা ইতিহাসও বটে। ও-দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানান চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটায় ইন্‌টালেক্‌ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমার-সম্ভবের প্রব্লেম, উত্তরকাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম, অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন 'বিচিত্রা'য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না, ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবলপরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ-অব-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানত সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডী ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন একমুহূর্ত্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায়নি, কিন্তু এখনি কি তার রং ফিকে হয়ে আসেনি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে, ইব্‌সেনের পুরানো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।

ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়

সেদিন শুনে দেখলাম—সত্যিকার সাধনা যাঁরা করেন, সাহিত্য যাঁদের শুধু বিলাস নয়, সাহিত্য যাঁদের জীবনে একমাত্র ব্রত, বাংলাদেশে তাঁরা ক'জনই বা, সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

এই-সব সাহিত্যসেবী অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনাহারে অনিদ্রায় দেশের জন্য দশের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টি করেন, সে সাহিত্য শুনেচি না কি জন-সমাজের কল্যাণ করে, কিন্তু তার কি মূল্য আমরা দিয়ে থাকি?

এই যে সব সাহিত্যিক দেশের জন্য প্রাণপণ করেচেন, তাঁদের পুরস্কার হয়েচে শুধু লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য। প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জ্জন করে বিত্তশালী ধনবান হতে তাঁরা চান না, তাঁরা চান শুধু একটুখানি স্বচ্ছন্দ জীবন, সর্ব্বনাশা দারিদ্র্যের নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্তি, তাঁরা চান শুধু নিশ্চিত নির্ভাবনায় লিখবার মত একটুখানি অনুকূল আবহাওয়া, অথচ তাঁরা তাও পান না। আজীবন শুধু ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়েই তাঁদের কাটাতে হয়, যাদের কল্যাণ-কামনায় তাঁরা জীবন উৎসর্গ করলে তারা একবার সেদিকে ফিরেও তাকায় না।

দেশের লোক তাদের দেয় না কিছু, অথচ, তাদের কাছে থেকে চায় অনেক। কোথাও কেউ যদি এতটুকু খারাপ লেখা লিখেচে, অমনি তীব্র সমালোচনার বিষে আর নিন্দার তীক্ষ্ণ শরে তাকে জর্জ্জরিত হতে হয়।

এই অতিনিন্দিত গল্প-লেখকদের দৈন্যের সীমা নেই। এদের লেখা পড়ে জনসাধারণ আনন্দ লাভ করে সত্য, কিন্তু তাঁদের ঘরের খবর নিতে গেলে দেখতে পাবেন—এইসব লেখক-সম্প্রদায় কত নিঃস্ব, কত অসহায়। অনেকেরই উপন্যাসের হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না।

কিন্তু কেন?

এর একমাত্র কারণ, আমাদের দেশের লোক বই পড়েন বটে, কিন্তু পয়সা খরচ করে কিনে পড়েন না। এমন কথা হয়ত উঠতে পারে যে, আমাদের দেশের জন-সাধারণ দরিদ্র, বই কেনবার সামর্থ্য তাঁদের নেই। কিন্তু সামর্থ্য যাঁদের আছে, এমন অনেক বড়লোকের বাড়িতে আমি নিজে গেছি। গিয়ে দেখেচি, তাঁদের আছে সবই, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বিলাস-ব্যসনের সহস্র উপকরণ আছে, নেই কেবল বই। পয়সা খরচ করে বই কেনা তাঁদের অনেকের কাছেই অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়।

অথচ গল্প-লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আর অন্ত নেই। সম্প্রতি একটা কথা

শুনচি, ভাল লেখা তাঁরা লিখচেন না। কেন লিখচেন না আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন ত আমি বলব—শক্তি যাঁদের আছে অর্থের অভাবে দারিদ্র্যের তাড়নায় আজ তাঁরা এমনি নিষ্পেষিত যে, ভাল কিছু লেখবার ইচ্ছা থাকলেও অবসর বা স্পৃহা তাঁদের নেই।

এর প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের অভাব-মোচনের ব্যবস্থা করতে হবে, ভাল লেখা যাতে তাঁরা লিখতে পারেন তার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে। তবেই বাঙলা-সাহিত্য বাঁচবে, নইলে অচির ভবিষ্যতে কি যে তার অবস্থা হবে, ভগবানই জানেন!

আমাদের দেশের বড়লোকেরা অন্ততঃ কর্ত্তব্যের খাতিরেও যদি একখানা করে বই কেনেন তা হলেও বা এর প্রতিকারের কিছু ব্যবস্থা হয়। বই না কিনেও অনেক রকমে তাঁরা সাহায্য করে বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। কিন্তু তা তাঁরা করবেন কি?

আগেকার দিনে বড় বড় রাজরাজড়ারা সভা-কবি রেখে কবি সাহিত্যিকের বৃত্তির ব্যবস্থা করে অনেক রকমে দেশের সাহিত্যকে বড় হবার সুযোগ দিতেন। আজকাল তাও নেই।

সখের সাহিত্যিকদের কথা আমি বলচি না। ভগবানের কৃপায় অন্নের সংস্থান যাঁদের আছে, সাহিত্য যাঁদের বিলাসের সামগ্রী, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা হয়ত বলবেন—অন্নচিন্তাটা ভালগার, সুতরাং সাহিত্যের শ্রী ওতে নষ্ট হবে, সে চিন্তা পরে করলেও চলবে।

পরে চিন্তা করলে যাঁদের চলে তাঁরা তাই করুন, তাঁদের কথা তুলব না। আমি শুধু সেই-সব দুর্ভাগাদের কথাই বলচি—যাদের অস্থিতে মজ্জায় সাহিত্যের অত্যুগ্র বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েচে, সাহিত্যসৃষ্টি যাদের জন্মগত-অধিকার, যাদের রক্তের মধ্যে সৃষ্টির উন্মাদনা। এই-সব উন্মাদেরা সহস্র দারিদ্র্য-লাঞ্ছনার মধ্যে বসেও লিখবে আমি জানি। না লিখলে তারা বাঁচবে না। তাই যতদিন তারা বেঁচে থাকে তাদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে চাই। এই-সব পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনের শিখা অন্নাভাবে অকালে যদি নির্ব্বাপিত হয়ে যায়—দেশের কল্যাণ তাতে হবে না, এইটুকুই আপনারা জেনে রাখুন।*

—'বাতায়ন', ২৭এ ফাল্গুন, ১৩৪৪, শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা*

* প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটির প্রথম প্রকাশকাল—১৩৪২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র কি আশ্বিন (দ্রঃ 'শনিবারের চিঠি' কার্ত্তিক, ১৩৪২, পৃঃ ১০৮-১০)। ইহা 'মোয়াজ্জিন' নামে মাসিক পত্রে স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বাংলা বইয়ের দুঃখ

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েছি। ইউরোপের নানা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন হয়ত তার অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবে না। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে জেগেচে একটা আকুলতা। ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে-রকম উন্নত, সে-রকম অবস্থা যে আমাদের দেশে কবে হবে—তা কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। চারিদিক থেকে অভিযোগ ওঠে, আমাদের গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই,—আছে কেবল বাজে নভেল। আমাদের লেখকেরা জ্ঞানগর্ভ বই লেখেন না। তাঁরা কেবল গল্প লেখেন। কিন্তু তাঁরা লিখবেন কোথা থেকে? এই অতিনিন্দিত গল্পলেখকদের দৈন্যের সীমা নেই। অনেকেরই উপন্যাসের হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। যা বা লাভ হয় সে যে কার গর্ভে গিয়ে ঢোকে তা না বলাই ভাল। অনেকের হয়ত ধারণাই নেই যে, এই-সব লেখক-সম্প্রদায় কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়।

বিলাতে কিন্তু গল্পলেখকদের অবস্থা অন্যরকম। তারা ধনী। তাদের এক একজনের আয় আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পুস্তকের সংস্করণের পর সংস্করণ হয়। কারণ ও-দেশে অন্ততঃ সামাজিকতার দিক থেকেও লোক বই কেনে। কিন্তু আমাদের দেশে সে বালাই নেই। ও-দেশে বাড়িতে গ্রন্থাগার রাখা একটা আভিজাত্যের পরিচয়। শিক্ষিত সকলেরই বই কেনার অভ্যাস আছে। না কিনলে নিন্দে হয়,—হয়ত বা কর্ত্তব্যেরও ত্রুটি ঘটে। আর অবস্থাপন্ন লোকদের ত কথাই নেই। তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে এক একটা বড় গ্রন্থাগার আছে। পড়ার লোক থাকুক বা না-থাকুক—গ্রন্থাগার রাখাই যেন একটা সামাজিক কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগা জাত আমরা। আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যেও পুস্তকের প্রচলন নেই। অনেকে হয়ত মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সমালোচনার ছলে শুধু গালিগালাজের উপকরণ সংগ্রহ করে নেন। যদি খোঁজ নেন ত দেখতে পাবেন তাঁদের অনেকেই মূল বইখানা পর্য্যন্ত পড়েননি। আমি নিজেও একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ী। নানা জায়গা থেকে আমার ডাক আসে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে আমি গেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তাঁদের আছে সবই—নেই কেবল গ্রন্থাগার। বই কেনা তাঁদের অনেকের কাছেই অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁদের বা একান্তই আছে, তাঁরা কয়েকখানা চক্‌চকে বই বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু বাঙলা বই মোটেই কেনেন না।

তাই বাঙলায়—যাকে আপনারা জ্ঞানগর্ভ বই বলচেন—সে হয় না, কারণ বিক্রী নেই। বিক্রী হয় না বলেই প্রকাশকেরা ছাপাতে চান না। তাঁরা বলেন, ও-সবের কোন চাহিদা নেই—নিয়ে এস গল্প। লোকে ভাবে, গল্প লেখাটা বড়ই সোজা। শুভানুধ্যায়ী পাড়ার লোক যেমন অক্ষম আত্মীয়কে পরামর্শ দেয়—তোকে দিয়ে আর কিছু হবে না, যা তুই হোমিওপ্যাথি করগে যা। অথচ হোমিওপ্যাথির মত শক্ত কাজ খুব কমই আছে। এর কারণ হচ্ছে, যে জিনিসটা সকলের চেয়ে শক্ত তাকেই অনেকে সবচেয়ে সহজ ধরে নেয়। ভগবান সম্বন্ধে কথা বলা যেমন দেখি, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে কারও কখনো বিদ্যে-বুদ্ধির অভাব ঘটে না।

গল্পলেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি হবে? টাকার অভাবে কত ভাল ভাল কল্পনা—কত বড় বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়, তার খবর কে রাখে? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল,—একটা উচ্চাশা ছিল যে 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়ে আমি একটা volume তৈরী করব। যেমন সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখের মূল্য, নরের মূল্য, নারীর মূল্য—এই-রকম মূল্য-বিচার। তারই ভূমিকা হিসাবে তখনকার কালে 'নারীর মূল্য' লিখি। সেটা বহুদিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে। পরে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই 'দ্বাদশ মূল্য' আর শেষ করতে পারিনি, তার কারণ—অভাব। আমার জমিদারী নেই, টাকা নেই, তখন এমন কি দু-বেলা ভাত জোটাবার পয়সা পর্য্যন্ত ছিল না, প্রকাশকেরা উপদেশ দিলেন, ও-সব চলবে না। তুমি যা তা করে তার চেয়ে দুটো গল্প লিখে দাও,—তবু হাজারখানেক কাটবে। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যই বলুন, কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন, বই কিনে আমরা লেখকদের সাহায্য করি না। এমন কি যাঁদের সঙ্গতি আছে তাঁরাও করেন না। বরং অভিযোগ করেন, গল্প লিখে হবে কি? অথচ আজ অন্তঃপুরে যেটুকু স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েচে, তা এই গল্পের ভেতর দিয়েই।

কত বড় বড় কবি উৎসাহের অভাবে নাম করতে পারেননি। পরলোকগত সত্যেন দত্তর শোক-বাসরে গিয়ে দেখেছিলুম, অনেকে সত্যিই কাঁদচেন। তখন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম,—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এ-রকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি—সেদিনও বলেছিলুম, এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্চেন। কিন্তু জানেন কি যে, বারো বছরে তাঁর পাঁচ শ'খানা বই বিক্রী হয়নি। অনেকে বোধ করি তাঁর পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। অথচ আজ এসেচেন অশ্রুপাত করতে।

আমাদের বড়লোকরা যদি অন্ততঃ সামাজিক কর্ত্তব্য হিসাবেও বই কেনেন, অর্থাৎ যাতে দেশের লেখকদের সাহায্য হয়—এমন চেষ্টা করেন, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই হবে। লেখকেরা উৎসাহ পাবেন, পেটে খেতে পাবেন, নিজেরা নানা বই

পড়বার অবসর পাবেন না। এর ফলে তাঁদের জ্ঞানবৃদ্ধি হবে, তবে ত তাঁরা 'জ্ঞানগর্ভ' বইতে লিখতে পারবেন।

রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর একটা কথা বেশী করে আমাদের নজরে পড়ে যে, ও-দেশের যা কিছু হয়েচে, তা করেচে ও-দেশের জনসাধারণ। তারা মস্ত লোক। তাদেরই মোটা মোটা দানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেচে। আমরা প্রায়ই সরকারকে গালাগালি দিই। কিন্তু এই আমাদেরই দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডার ভরল কতটুকু! তিনি দেশের জন্যে কত করেচেন। তাঁর স্মৃতি-রক্ষার জন্যে কত আবেদনই না বেরুল। কিন্তু সে ভিক্ষাপাত্র আজও আশানুরূপ পূর্ণ হ'ল না; অথচ ইংলণ্ডে 'ওয়েস্টমিনস্টার এবি'র এক কোণে ফাটল ধরে, সেখানকার ডীন কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের জন্যে এক আবেদন করেন। কয়েক মাসের মধ্যে এত টাকা এল যে, শেষে তিনি সেই ফাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ দাতারা নাম বাজাবার জন্যে যে দান করেননি তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কারণ কাগজে কারোরই নাম বেরোয়নি। এতটা সম্ভব হয় তখনই যখন লোকের মধ্যে স্বদেশ সম্বন্ধে একটা প্রবুদ্ধ মন গড়ে ওঠে।

আমার প্রার্থনা, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় দীর্ঘজীবী হউন। তাঁর এই প্রারব্ধ কাজে উত্তরোত্তর সাফল্যলাভ করুন। ওঁর কথা শুনে আমাদের মনে জাগে আকুলতা। যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরী-আন্দোলনের জন্যে তাই দেন ত দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের দেখার হয়ত অবসর ঘটবে না। কিন্তু আশা হয় আজকের দিনে যাঁরা তরুণ—যাঁরা বয়সে ছোট, তাঁরা নিশ্চয়ই একাজের কিছু ফল দেখতে পাবেন।

'কোন্নগর পাঠচক্রে'র চেষ্টায় এই যে মূল্যবান কথা শুনা গেল, তার জন্যে বক্তা এবং সভ্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আজ বড় আনন্দ পেলাম,—শিক্ষা পেলাম, মনের মধ্যে ব্যথাও পেলাম। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমাদের দুর্ভাগা দেশ! যুগযুগান্তের পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে। একমাত্র ভগবানের বিশেষ করুণা ছাড়া পরিত্রাণের আর ত কোন আশা দেখি না।*

—'বিচিত্রা' আশ্বিন, ১৩৪২

* কোন্নগর পাঠচক্রে সভাপতির অভিভাষণ

সাহিত্যের আর একটা দিক

কল্যাণীয়া জাহান-আরা,

তোমার বার্ষিক পত্রিকায় সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেচ। আমার বর্ত্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয়ত সামান্যই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম সাহিত্যের ধর্ম্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেননি। সে এর প্রয়োজনের দিক,— এর কল্যাণ করার শক্তি সম্বন্ধে। এ-কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্য-রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান্ হয়ে ওঠে।

বাঙলাদেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠেচে বলেই মনে হয়। আমি তোমাদের মুসলমান-সমাজের কথাই বলচি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত করে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন, এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে একদিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশীও সে নয়। যে-কারণেই হোক, এতদিন শুধু বাঙালাদেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য-চর্চ্চা করে এসেচেন। মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই বাণী-দেবতা বর দিয়ে এসেচেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু কোনদিনই সে বিস্তৃত হতে পারেনি। তাই, ক্রোধের বশে তোমাদের কেউ কেউ নাম দিয়েচেন। এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়;

যদিও বলা চলে, সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান-চরিত্র এঁকেচেন, ক'টা জায়গায় এত বড় বিরাট সমাজের সুখ-দুঃখের বিবরণ বিবৃত করে-চেন। কেমন করে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে!— স্পর্শ করেনি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েচে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য

তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আজও আবিল করেনি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান দুই বৃহৎ জাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মত বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার-জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েচে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম. এ-কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেচ?

তিনি বললেন, উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম, এ-কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ ত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে, সেই ত নিরাপদ।

তার পরে দু-জনেই ক্ষণকাল চুপ করে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবেন আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও তাও চূড়ান্ত। এও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি, এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায় তখন দেখবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েচ সবচেয়ে বেশী।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন, non-co-operation-ই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম, না, চিরদিন চলবে না, কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে,—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করব।

বললাম, ক'রো। তোমার চেষ্টার 'পরে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে। ইতি, ১১ই মাঘ, ১৩৪২।*

*—"বর্ষবাণী" ৩য় বর্ষ, ১৩৪২

বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

কোন একটা কথা বহু লোকে মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গম গম করিতে থাকে —এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে যাহা নিরন্তর প্রবেশ করে, মানুষ অভিভূতের মত তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তু ত এই-ই। বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল, সে ত কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে, সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না।

বছর কয়েক পূর্ব্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এদেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন চাই-ই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই এইজন্যে যে, এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি এ-কথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগল ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তার পরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার ত হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ-আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এতবড় ছুটো ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়, কারণ, কল্যাণের হউক, অকল্যাণের হউক, সময়-মত একটা ছাড়রফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাংলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ-আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর

গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই—এ কোন কথা? যে দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, সে দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্ব্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কীরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ-আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে লোক ভর্ত্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ-বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ-বা বাম হস্ত, কেহ-বা চক্ষু কর্ণ, কেহ-বা আর কিছু,—হায়রে! এত বড় তামাশার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে—দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্ম্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না! সে-যাত্রা কোনমতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল। ভ্রাতার অধিক, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশী। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল,—অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি। ইহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কলমা পড়াইয়া

কাফের-ধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী দ্বিধা হও।

বস্তুতঃ মুসলমান যদি কখনও বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া, কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভূষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘর-দোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুট করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্য্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।

কিন্তু, কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশী তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কালচার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না। হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।

মিলন হয় সমানে সমানে। শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক

আমি ত করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না। এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় ত সে এখন থাক। মানুষের অন্য কাজ আছে। খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া, ডান ও বাঁ—দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজ-যুদ্ধে নামান যাইতে পারিবে, এ দুরাশা দুই-একজনার হয়ত ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না। তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন—দুঃখ-দুর্দ্দশার মত শিক্ষক ত আর নাই, বিদেশী ব্যুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়ত তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়ত হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজরথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে, লাঞ্ছনাবোধও শিক্ষাসাপেক্ষ। যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহাতে আঁচটুকুও লাগে না। এবং তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং, এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মবঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান-মিলন একটা গাল-ভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গাল-ভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল-ভরানর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাঙলার মুসলমানকে এ-কথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে, সাতপুরুষ পূর্ব্বে তোমরা হিন্দু ছিলে; সুতরাং রক্ত-সম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি। জ্ঞাতিবধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়া-ভিক্ষা ও মিলন-প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি ত আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে বিদেশে ক্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন। কাহারও বা পিতামহ, কেহ-বা স্বয়ং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার জো নাই যে, সর্ব্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাইবোন নেই। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এতবড় শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি। আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্ম্মত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোষাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্য্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাঁহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে,—এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে—তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে এমনিই ঘটে! উগ্রতায় পর্য্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত

হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা—হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না—আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজ-গাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্ত্তব্য। হিন্দু মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে এ দেশে চিত্ত তাহার নাই, যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জল বায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে? আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে যাহা এক দুই তিন করিয়া মাথা গণনার হিসাবটাকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করে না।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কাছেই হয়ত তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাততঃ চোখে না পড়ে ত এ লইয়া অহরহ আর্ত্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, এ মনোভাবেরও কোনও সার্থকতা নাই। অথচ, উপরে, নীচে, ডাইনে, বামে, চারিদিক হইতে একই কথা বারংবার শুনিয়া ইহাকে এমনই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে-জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোন গতি আছে, তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই করিতেছি কি? না, অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি—তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙ্গিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে—এবং এ সকল তোমার ভারি অন্যায় ও ইহাতে আমরা যারপরনাই

ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি। এ-সকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হউক মিলন করিবার ভার আমাদের এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের কিন্তু বস্তুতঃ হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেদের এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে ত সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের 'পরে।

কিন্তু দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি কি হয় গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জ্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটা-কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্ম্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে কোন ধর্ম্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্ব্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব। এবং, জগৎশুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ। আর, দেশের মুক্তিসংগ্রামে কি দেশশুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না ইহা সম্ভব, না তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোকে ত ইংরাজের পক্ষেই ছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে ত এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ ত গরু-ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের 'পরে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে-সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান-মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয় এ আশা নির্ব্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়ত একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে। —'হিন্দু-সঙ্ঘ', ১৯এ আশ্বিন, ১৩৩৩

গ্রন্থ-পরিচয়

শুভদা

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ (৫ই জুন, ১৯৩৮)। ইহা শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনাবলীর অন্যতম। 'শুভদা'র রচনাকাল—১৮৯৮ খ্রীঃ ২০এ জুন হইতে ২৬এ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং রচনাকালের মোট সময় ৩৩ দিন। এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ২২ বৎসর মাত্র। পরবর্ত্তীকালে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত করিয়া দুই-একটি কথা বদলান ব্যতীত আর কিছুই তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই।

পণ্ডিত মশাই

প্রথম প্রকাশ—১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—১৩২১ বঙ্গাব্দ (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)।

মেজদিদি

প্রথম প্রকাশ—১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'দর্পচূর্ণ' ও 'আঁধারে আলো' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত একত্র পুস্তকাকারে সর্বপ্রথম প্রকাশ ১৩২২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৫)।

পথ-নির্দ্দেশ

প্রথম প্রকাশ—১৩২০ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ সংখ্যা 'যমুনা' মাসিক পত্রিকায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত একত্র পুস্তকাকারে সর্বপ্রথম প্রকাশ—১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (৩রা জুলাই, ১৯১৪)। অতঃপর সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

আঁধারে আলো

প্রথম প্রকাশ—১৩২১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'মেজদিদি' ও 'দর্পচূর্ণ' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত পুস্তকাকারে একত্র সর্বপ্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ (১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৫)।

কোরেল

প্রথম প্রকাশ—'দেশ' পত্রিকার ১৩৮২ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায়। এটি শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনা। ১৮৯৩ সালে এই রচনা তিনি আরম্ভ করেন, শেষ করেন ১৯০০ সালে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী'র "আত্মকথা" শীর্ষক লেখা থেকে এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের ভাষ্য পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

> "পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল। আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা —এককথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু

কোনোটাই তিনি শেষ করতে পারেননি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সেকথা আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত রার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি, এই বলে কত দুঃখই-না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কী হতে পারে ভাবতে-ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণে বোধহয় সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি।"
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর "শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্ত" গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, শরৎচন্দ্রের একটি খাতা ছিল, তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বাগান'। এই খাতায় তিনি কয়েকটি গল্প লেখেন। তার মধ্যের অন্যতম রচনা হচ্ছে 'কোরেল'। ১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্র বর্মায় যান। বর্মায় যাবার পর 'বাগান' খাতার অন্তর্গত অন্যান্য গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু 'কোরেল' থেকে যায় অপ্রকাশিত।
'কোরেল' কাহিনীর পটভূমি ইংলণ্ড। এর পাত্রপাত্রীও ইংরেজ। বাল্য-জীবনে শরৎচন্দ্র ইংরেজি উপন্যাসের অনুরাগী ছিলেন। শরৎসুহৃদ্ বিভূতিভূষণ ভট্টের 'আমার শরৎদা' (ভারতবর্ষে ১৩৪৪ চৈত্র) রচনার থেকে এ খবর জানা যায়। সেই অনুরাগের পরিণাম সম্ভবতঃ 'কোরেল'এর এই বিদেশী পটভূমি।
এর পর তিনি 'কোরেল' কাহিনীর অনেক পরিবর্ত্তন করেন। পটভূমি বদলে যায়, পাত্রপাত্রীর নূতন নামকরণ হয়। এর ফলে গল্পেরও একটা নূতন নাম দেন তিনি, সে নাম 'ছবি'। ১৩২৬ সালের পূজাবার্ষিকী 'আগমনী' পত্রিকায় (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত) প্রথম প্রকাশিত হয় 'ছবি।'
'কোরেল' রচনার গ্রন্থভুক্তি এই প্রথম।

বিবিধ রচনাবলী

(১) 'ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য' (২) 'সাহিত্য ও নীতি', (৩) 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' এবং (৪) 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ'—বর্ত্তমান সম্ভারে প্রকাশিত এই কয়টি রচনাই 'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে (প্রকাশ-কাল—ভাদ্র, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

(১) 'সাহিত্যের মাত্রা' (২) 'সাহিত্যের আর একটা দিক,' (৩) 'বাঙলা বইয়ের দুঃখ', (৪) 'ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায় এবং (৫) বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা'—এই কয়টি রচনাই পূর্ব্বে কোন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই ; শ্রাবণ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের পুস্তাকাকারে 'অপ্রকাশিত রচনাবলী' নামক গ্রন্থে উক্ত রচনাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অষ্টম সম্ভার সমাপ্ত